বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৭৫

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

আঠারো টাকা

নিবেদন

এক যুগ পূর্বে লেখালিখি শুরু করেছিলাম কবিতা ও কাব্যভাষা নিয়ে। তারপর গদ্যভাষার রহস্য আমার মনকে টানে। দশ বছর আগে গদ্যরীতি নিয়ে একটি পুস্তকও প্রকাশ করেছিলাম। তারপর কবিতা, কাব্যভাষা ও কবি-ব্যক্তিত্বের রহস্য সন্ধানে নিরত ছিলাম। কথাসাহিত্য ও নাটকের শিল্প-সমৃদ্ধির প্রতিও মন আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর সমালোচনার ইতিহাস অন্বেষণ করেছি। কিন্তু গদ্যভাষা ও গদ্যরীতির প্রতি আকর্ষণ বিনষ্ট হয় নি। গদ্যের প্রতি কৌতূহল, স্টাইল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, গদ্যশিল্পীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময় আমাকে বারবার গদ্যের প্রতি টেনেছে, জানতে চেয়েছি গদ্য কীভাবে আজ কবিতার চেয়েও আমাদের রক্তের নিকটতম পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রন্থ সেই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের ফল। গদ্যের প্রতি পাঠকের অনুরাগ ও জিজ্ঞাসা যদি এই গ্রন্থ পাঠে বর্ধিত হয় তবে শ্রম সফল জ্ঞান করব।

আমার তিন তরুণ সহমর্মী শ্রীরঞ্জিত সিংহ, শ্রীদেবতোষ বসু, অধ্যাপক শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ ও স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রী রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ এই গ্রন্থ রচনাকালে নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বারা আমাকে নিত্যসচেতন থাকতে বাধ্য করেছেন। শ্রীমান রমেন্দ্রনারায়ণ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন। গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব বহন করেছেন ক্লাসিক প্রেসের যুগল-কর্ণধার শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীঅমল সেনগুপ্ত। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২০ নভেম্বর, ১৯৬৭

কলকাতা ২৬

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

BĀNGLĀ GADYA-RITIR ITIHAS

(History of Bengali Prose Style)

By

Dr. ARUN KUMAR MUKHOPADHYAY

Price Rupees Eighteen Only.

উৎসর্গ

আমার অধ্যাপক

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম এ., সাহিত্যবিশারদ, পুরাণরত্ন

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের :—

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস

বাংলা সমালোচনার ইতিহাস

রবীন্দ্র-মনীষা

রবীন্দ্র-সমীক্ষা

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা

লেখকের মুখোমুখি

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

স্মৃতি-বিস্মৃতি

সম্পাদনা :

রবীন্দ্রবিতান

যুগ্ম-সম্পাদনা :

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সূচীপত্র

১ স্টাইলের কথা

ফরাসি আকাদামিতে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে বুফোঁ যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেটি স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনায় বহু-উচ্চারিত : 'স্টাইল হচ্ছে লেখক-মানুষটি'।[১] এই সংজ্ঞা বহু বিতর্ক ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছে, নানা জন নানা অর্থ করেছেন।

এইসব সংশয় ও বিতর্ক প্রমাণ করে স্টাইলের স্বরূপ-বিচার কঠিন কর্ম। 'লেখকই স্টাইল'—এ কথা বললে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না। 'লেখক-ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী ধারণার অপ্রাচুর্য নেই। 'লেখক' সম্পর্কেও দ্বিমতের অবকাশ আছে। বিভিন্ন অর্থে 'স্টাইল' শব্দটির এত প্রচুর ব্যবহার আছে যে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আশা দুরাশা মাত্র।

স্টাইলের বিভিন্ন সংজ্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে রচনার সামগ্রিক সংহতির উপর। ফরাসি লেখক ফ্লোবোর একটি অনুচ্ছেদকে ত্রুটিহীন করার প্রয়াসে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। তাঁর মতে স্টাইল হচ্ছে, লেখকের বিভিন্ন বস্তুকে দেখার বা চিন্তা করার একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি।[২] অনুরূপ কথা বলেছেন বুফোঁ।[২ক]

এ ধরনের কথাই রুশ লেখক চেখভ বলেছিলেন গোর্কিকে—'তুমি একজন আর্টিস্ট। তোমার অনুভব-ক্ষমতা অসাধারণ; তোমার কাছে অনুভূতি সাকার হয়ে ওঠে। যখন তুমি একটি বস্তুর বর্ণনা দেবে, তখন তুমি যেন চোখ দিয়ে তা দেখতে পারো আর হাত দিয়ে ছুঁতে পারো। এই হ'বে যথার্থ লেখা।'[৩]

লেখকের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে বর্ণনার একাত্মতা সাধন, স্টাইলের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভাষা হবে লেখকের ক্রীতদাস, আদেশ মাত্রেই তা কার্য সমাধা করবে, লেখকের অনুভূতি বা চিন্তাকে সাকার রূপ দেবে। এখানেই স্টাইলের চরম সার্থকতা। এরই জন্যে লেখক দিনের পর দিন সাধনা করেন।

রূপকের) উপস্থিতি বিরল ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের উপরি-ধৃত কবিতায় অর্থালংকার অনায়াস লক্ষণীয়। এখানে অলংকার বাইরের জিনিষ নয়, তা স্টাইলের অন্তর্ভুক্ত। স্টাইলের অর্থ যাথার্থ্য,—ইমোশনের যাথার্থ্য, ব্যঞ্জনার যাথার্থ্য। এই যাথার্থ্য লাভের অন্যতম সোপান উপমা ও রূপকের ব্যবহার। যথার্থ অভিধা বা এপিথেট্-এর সন্ধান করলে উপমা-রূপকের আশ্রয় নিতেই হয়। এই কবিতায় এই দুই অর্থালংকার শোভাবর্ধক বহিরঙ্গ অলংকার নয়, তা স্টাইলের অঙ্গীভূত।

বিশ্বপ্রকৃতিকে আজ মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখছে, এই কবিতার চিত্রকল্প সেই দৃষ্টি-প্রসূত। এ যুগের মানুষের মনে বিশ্বপ্রকৃতির একটি বিশেষ রূপকল্পনা আছে, এই কবিতা তারই আলেখ্য। 'গতি' ও 'বেগ', এ যুগের লোকের মনে যে 'ভাব'-এর আবেগের সৃষ্টি করেছে, তাকে স্পষ্টতর করতে গিয়ে কবি যে যথার্থ এপিথেট ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তা এইজাতীয় অর্থালংকার ছাড়া আর কিছু নয়—

মনে হলো এ পাখার বাণী
দিল আনি,
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

এখানে যে রীতি ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে আলংকারিক (মেটাফরিক্যাল) রীতি বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

অন্য-একটি উদাহরণ দেখা যাক—

দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে।

এখানে যে অলংকার, তাকে কেবল নিরঙ্গ রূপক বলে বিদায় করে দিতে পারি না। অব্যর্থ যথার্থ এপিথেট্-এর সন্ধানে বেরিয়ে তৃষাতুর-হৃদয় কবি "অগ্নিবাণ"-কে গ্রহণ করেছেন। এখানে অগ্নিবাণ বাইরের অলংকার নয়, স্টাইলেরই অঙ্গীভূত।

আর একটি উদাহরণ দেখা যাক—

আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।

এখানে যে কল্পচিত্র, তা এত সম্পূর্ণ, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই ছবিটির ব্যঞ্জনা মুহূর্তেই আভাসিত হয়। প্রবীণ কবির জীবন-তরীর আরোহীরূপে কতো পলাতক মুহূর্তের ছবি এখানে অব্যর্থ রেখায় আঁকা হয়েছে। এই অলংকারকে সাঙ্গরূপক বলে বিদায় দিতে পারি না, পরন্তু অব্যর্থ ও যথার্থ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত এই কল্পচিত্রকে স্টাইলের অঙ্গীভূত বলেই স্বীকার করে নিতে হয়।

মৃত্যুপথযাত্রী হ্যামলেটের মুখে শেকসপীঅর একটি অবিস্মরণীয় উক্তি দিয়েছেন—এই উক্তির যাথার্থ্য আমাদের অভিভূত করে—

Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain
To tell my story. ('Hamlet', v. ii, 361)

অব্যর্থ এই উক্তি। প্রথম চরণের তারল্য ও অনায়াস উচ্চারণভঙ্গি সরে-গিয়ে দ্বিতীয় চরণের শ্বাসরুদ্ধ যন্ত্রণাদায়ী উচ্চারণ মুহূর্তের মধ্যে পাঠকচিত্তকে বিদ্ধ করে। মৃত্যুপথযাত্রী হ্যামলেটের কণ্ঠে এই যন্ত্রণাদায়ী উচ্চারণ এখানে রূপ পেয়েছে; ডানিয়েল ওয়েবের ভাষায় বলা যায়, যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ না হয়ে এই দ্বিতীয় চরণটি উচ্চারণ করা অসম্ভব। নাট্যকারের কাব্যপ্রতিভা ও নাট্য-প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচায়ক এই সংলাপ শেকসপীঅরের স্টাইলের অঙ্গীভূত। একমাত্র শেকসপীঅর এটি রচনা করতে পারেন। স্টাইলের অব্যর্থতাই এখানে প্রমাণিত হয়।

স্টাইল ভাষার এমন একটি গুণ যা লেখকের বিশিষ্ট চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতিকে অব্যর্থভাবে যাথার্থ্যের সঙ্গে পাঠকমনে পৌঁছে দেয়: এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গে উপনীত হতে পারি।

গদ্য পদ্যের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য খুব বেশি নেই। যেখানে লেখকের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে কখনো গদ্য কখনো-বা পদ্য তার প্রকাশবাহন হয়। যেখানে একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতির প্রাধান্য সেখানে পদ্য একমাত্র বাহন। আর যেখানে লেখকের চিন্তা প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে গদ্য প্রকাশবাহন রূপে দেখা দেয়। স্টাইল তখনই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে যখন তা অনুভূতি বা চিন্তাকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে।

পদ্য বলতে ছন্দোবদ্ধ নিয়মিত পর্বে বিন্যস্ত চরণকে বুঝি। কাব্যধর্মী গদ্যকে এখানে পদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গদ্যে নিয়মিত পর্ব নেই, তার

লক্ষ্য যাথার্থ্য, তার আবেদন পাঠকের বুদ্ধির কাছে। অপরপক্ষে পদ্য পাঠককে অনুভূতির উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, ছন্দ মিল ধ্বনির নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যা পাঠকের শ্রুতিকে ও চিত্তকে মুগ্ধ করে, পাঠককে অন্য জগতে নিয়ে যায়। গদ্য পাঠককে এই পরিচিত পৃথিবীতেই বিচরণ করতে বলে; যুক্তি, পরিমিতি, যাথার্থ্য ও চিন্তার স্বচ্ছতায় পাঠককে দীক্ষিত করে। পদ্যের লক্ষ্য পাঠকের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া, ছন্দের মন্ত্রে পাঠক-চিত্তের উপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার, কাব্যধর্মী গদ্যেরও তা'ই উদ্দিষ্ট। কিন্তু যুক্তিধর্মী গদ্য পাঠকের অব্যবহিত পরাজয়ে আগ্রহী নয়, পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তি-প্রবণতাকে জাগ্রত করে তাকে ধীরে ধীরে বশ করা তার অভিলাষ।

গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়, বরং সূক্ষ্ম। দুয়েরই কাজ মানসিক ক্রিয়ার প্রকাশ; পার্থক্য তার রূপে। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ, গদ্য পদ্যের ব্যবধান সেই প্রভেদের উপর নির্ভরশীল। দুয়েরই কারবার শব্দ নিয়ে; কিন্তু গদ্য নির্ভর করে স্মৃতির উপর, অভিধানের উপর; আর পদ্য নির্ভর করে শব্দ থেকে সৃষ্ট ব্যঞ্জনার উপর। চিন্তা ও শব্দের সমবায়ে ভাষা গড়ে ওঠে—গদ্য পদ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কিন্তু পদ্যের লক্ষ্য ভাব ও অনুভূতির ঘনীকরণ, গদ্যের লক্ষ্য প্রক্ষেপণ। যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া ভাব ও চিন্তাকে সংহত ও ঘন করে, আর যে-সব মানসিক ক্রিয়া চিন্তাকে বিকীর্ণ করে, তাদের মধ্যে মূলত পার্থক্য আছে। ভাব ও অনুভূতির ঘনীকরণ প্রক্রিয়ায় কবিতার জন্ম হয়, আর প্রক্ষেপণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়ার ফলে গদ্য দেখা দেয়।[৫] সুতরাং গদ্য পদ্যের মধ্যে পার্থক্য মূলত মানসিক ক্রিয়ার পার্থক্য। ঘনীকরণ প্রক্রিয়া থেকে ভাবের রূপান্তর হয়, সেখানে শব্দ হয়ে ওঠে নবতর ভাবের বাহন। কবিতার জন্মলগ্নে তাই শব্দের নবজন্ম ঘটে। কিন্তু যেখানে চিন্তার প্রক্ষেপণ ও বিকিরণ, সেখানে শব্দের নবজন্ম হয় না, সেখানে শব্দ নির্দিষ্ট অভিধানিক অর্থকে ব্যক্ত করে; এই হল গদ্যের ক্রিয়া।

উৎকৃষ্ট গদ্যভাষা আমাদের চিন্তা ও ভাবনা প্রকাশের সার্থকতম বাহন, আর পদ্যভাষা অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের প্রকাশবাহন। মননপ্রধান দার্শনিক কবিতার অভাব নেই, কাব্যগুণসমৃদ্ধ ভাবোচ্ছ্বসিত গদ্যরচনাও অবিরল। কিন্তু আমরা যখন গদ্যভাষার আশ্রয় নিই, তখন চিন্তাকে স্পষ্ট ভাষারূপ দিই। আর যখন কবিতার আশ্রয় কামনা করি, তখন হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে মুক্তি দিই। সুতরাং একথা অবশ্যস্বীকার্য, গদ্যভাষা চিন্তা ও মননক্রিয়ার ভাষারূপ,

আর পদ্যভাষা হৃদয়াবেগ ও আনন্দবেদনা-অনুভূতির ভাষারূপ। গদ্যভাষা আধুনিকতার প্রধান বাহন। বিশ্লেষণ, বিচার, সংশয় ও জিজ্ঞাসা আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির প্রধান লক্ষণ। আবেগহীন নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি আধুনিক জীবনের ভিত্তিভূমি। গদ্যভাষাই এই দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসার বাহন। দ্ব্যর্থহীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, যাথার্থ্য ও পরিমিতি গদ্যের মূল উপাদান।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা মূলত গুণগত ব্যবধান, আর সে ব্যবধান ধরা পড়ে ব্যক্ত ভাষারূপের প্রতিক্রিয়ায় এবং তার উদ্দেশ্যে।

গদ্যভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জ্ঞানের ভাষা, আর পদ্যভাষাকে ভাবের ভাষা। দুয়ের প্রকৃতিগত ব্যবধান দেখিয়ে তিনি বলেছেন,

"মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর পরিষ্কার হওয়া চাই ; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্ত মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।"[৬]

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যের লক্ষণ কি কি ?

মারজোরি বোল্‌টন 'দি অ্যানাটমি অফ প্রোজ' (১৯৫৪) গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন।

প্রথমত, পদ্যের ছন্দ (রীদম্) নির্ভর করে পর্ব ও মাত্রাগত ছাঁচের (প্যাটার্নের) নিয়মিত পুনরাবৃত্তির উপর। অন্ত্যমিল, অন্তর্মিল, স্বরধ্বনির মিল, অনুপ্রাস, ধ্রুবপদের ছাঁচও পদ্যে ব্যবহৃত হয়। গদ্যের ছন্দ নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপর। গদ্যে চরণ ও মিলের ব্যবহার দোষ বলেই গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, গদ্যে ও পদ্যে শব্দের কাজ এক নয়। পদ্যে শব্দের স্পষ্ট অর্থ সব সময় দাবি করা হয় না। দ্ব্যর্থবোধক ও অনুকার শব্দ পদ্যে ব্যবহৃত হয়, কখনো বা অর্থ ছেড়ে ছন্দের খাতিরেই শব্দের ব্যবহার ঘটে কিন্তু গদ্যে শব্দের ব্যবহার হয় প্রয়োজনের খাতিরে, নির্দিষ্ট অর্থের প্রকাশে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে শব্দের যে একটিমাত্র অপরিবর্তনীয় অর্থ, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই গদ্যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়। স্বচ্ছতা বা স্পষ্টতা (ক্ল্যারিটি) গদ্যের প্রধানতম গুণ, পদ্যে তা অপ্রধান। গদ্যে চাই স্পষ্টতা, পদ্যে ইশারা।

তৃতীয়ত, সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ও ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনে শব্দের যে ব্যবহার, তা গদ্যকে করে তুলেছে চিন্তার ভাষা, মননের ভাষা, কাজের ভাষা। পদ্য এইসব উদ্দেশ্য সাধন করে না। পদ্য আমাদের আনন্দ বেদনাকে, হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করে বলে আলংকারিক রূপ ধারণ করে, স্পষ্টতা ছেড়ে ব্যঞ্জনায়, প্রত্যক্ষতা ছেড়ে অপ্রত্যক্ষতায়, অর্থ ছেড়ে ধ্বনিতে সার্থকতা খুঁজে পায়। পদ্যে যে আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত হয়, তা গদ্যে ব্যক্ত আবেগ অনুভূতি থেকে তীব্রতর।

শ্রীমতী বোল্‌টনের এই বিশ্লেষণ থেকে গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে একথাও সত্য যে, পোপ বা হুইটম্যানের কবিতা সত্যিকারের কবিতা নয়, গদ্য বা ফ্রী ভর্স মাত্র। আবার ল্যাণ্ডর বা জেমস জয়স্‌-এর গদ্য সত্যিকারের গদ্য নয়, পদ্যের রকমফের মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চে'র ভাষাকে পদ্যভাষা বলে স্বীকার করা কঠিন 'ছিন্নপত্রে'র গদ্য অনেক সময়ই গদ্যধর্মকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব-শতকে'র ভাষাকে বিশুদ্ধ পদ্যভাষা বলে মেনে নিতে অনেকেই রাজি হবেন না। সুতরাং গদ্য ও পদ্যের মধ্যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে অনেকটা গুণগত ব্যবধান।

গদ্য পদ্যের উপাদান বিচার করে আমরা অনেক সময় দুয়ের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারি। ফ্রী ভর্স বাদ দিলে পদ্যের উপাদান এইগুলি—পর্ব, চরণ, স্তবক, স্তবকগুচ্ছ, স্তবক-বন্ধ, সর্গ-বন্ধ। গদ্যের উপাদান এইগুলি—শব্দ, বাক্য, হ্রস্ব বাক্য, বাক্যাংশ (ফ্রেজ, ক্লজ) সমবায়ে গঠিত দীর্ঘ বাক্য, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়। বিষয় ও উদ্দেশ্যভেদে গদ্যের নানা নমুনা পাওয়া যায়—বর্ণনামূলক, যুক্তিবিচারমূলক, নাট্যধর্মী, চিন্তামূলক এবং জ্ঞাতব্যতথ্যমূলক গদ্য।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে গুণগত ব্যবধান এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু দুয়ের মধ্যে মিল আছে একটি ক্ষেত্রে; তা হ'ল সিমিলি-মেটাফর-এর ব্যবহারে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলংকার ব্যবহারের স্বাধীনতা ও সুযোগ দুয়েরই আছে। পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, এই মেটাফর বহিরঙ্গ অলংকার নয়, স্টাইলেরই অঙ্গীভূত।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তায় এই অর্থালংকার ব্যবহার করে থাকি। বস্তুতঃ সে বিষয়ে সচেতন নই বলেই মেটাফর ব্যবহারে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না। যে-সব উপাদান

(ছন্দ, সংগীত, কল্পচিত্র, নির্বাচিত সুললিত শব্দ) পদ্যের আছে, তার কিছুই গদ্যের নেই, আর সে কারণেই গদ্যে মেটাফর্-এর উপর আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। কেবল মেটাফর নয়, সিমিলি-ও আমরা সদাসর্বদা ব্যবহার করে থাকি। রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা তাই গদ্যের প্রধান অবলম্বন।

উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক (মেটাফর-সিমিলি) আমাদের কী দেয়? অ্যারিস্তোতল এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), স্ফূর্তি (ডিলাইট্‌ফুল্‌নেস্) ও নবীনতা (আন্‌ফ্যামিলিআরিটি)।[৭] এই তিনটি গুণ কেউ কাউকে ধরে দিতে পারে না, নিজেকেই অর্জন করতে হয়। সুতরাং সার্থক গদ্যলেখককে এই গুণগুলি আপন শক্তিতে অর্জন করতে হয়। গদ্যের স্টাইল এই সব গুণের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে।

স্টাইল মূলতঃ লেখক-ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ; পাঠকমনের সঙ্গে লেখকের যোগসাধনের সেতু। শব্দ, বাক্য, চিত্রকল্প, অলংকারের আবরণ-মণ্ডিত যে লেখক-ব্যক্তিত্ব, তারই নাম স্টাইল। তা ব্যক্তির পোষাক নয়, তার রক্ত মাংস হাড়। চিন্তা অনুভূতি-উপলব্ধি থেকেই স্টাইলের উৎপত্তি, সুতরাং স্টাইলকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

স্টাইল যখন লেখক-ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ তখন স্টাইলের স্বরূপ-সন্ধান লেখক-ব্যক্তিত্বের গুণ-সন্ধানের নামান্তর। এবার তারই সন্ধানে আমাদের যাত্রা।

॥ দুই ॥

সমাজে ভাষার সার্থকতা কোথায়? মনোভাব প্রকাশেই ভাষার সার্থকতা। একজন অন্যজনের কাছে তার মনোভাব প্রকাশে ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে। স্বভাবতই ভাষা যত স্বচ্ছ হবে স্পষ্ট হবে, মনোভাব ততই স্পষ্ট হবে। তাই ভাষার প্রথম গুণ—স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা। এই গুণ স্টাইলের ভিত্তিভূমি। গীতি-কবিতা ও স্বগতোক্তিতে নিজের কাছেই মনোভাব প্রকাশ করা হয়; কিন্তু কথাবার্তা ও লিখিত গদ্যরচনায় আমরা পরের কাছেই মনোভাব প্রকাশ করি। সুতরাং কীভাবে পরের চিত্তকে অধিকার করা যায়, সেদিকেই ভাষার লক্ষ্য থাকে। অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা, ধোঁয়াটে ভাব বর্জন করাই ভাষার সাধনা।

আনাতোল ফ্রাঁস ফরাসি গদ্য-স্টাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—গদ্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, গভীর স্বচ্ছতা, অশেষ স্বচ্ছতা।[৮] চিন্তা-শৃঙ্খলা থেকে ভাষার স্বচ্ছতা আসে। যেখানে চিন্তাদৈন্য, চিন্তায় অসংলগ্নতা, প্রসঙ্গের সংখ্যাধিক্য, প্রসঙ্গচ্যুতি, একসঙ্গে বহু কথা বলার প্রয়াস, আড়ম্বরপ্রবণতা, অবিবেচনা সেখানেই ভাষায় অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা দেখা দেয়। এই সব দোষ দূর করার উপায় কি? উপায় দুটি—সর্বজনবোধগম্যতা লাভের প্রয়াস, আর অলংকার ধ্বনি ও চিন্তার জন্যে প্রশংসালাভের দুর্বলতা বর্জন। ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের সম্পর্কে বহুশ্রুত গল্পটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি নাটক লিখে তাঁর রাঁধুনীকে পড়ে শোনাতেন। রাঁধুনীর বোধগম্যতার দ্বারা তিনি সংলাপের সার্থকতা বিচার করতেন। যে গদ্যলেখক আত্মম্ভরী, আত্মকেন্দ্রিক ও ভাষার বাহ্যিক চাকচিক্যের অনুরাগী, তার লেখাতেই স্বচ্ছতা গুণের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে আড়ম্বরযুক্ত অসংলগ্ন স্টাইলের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা এখানে উপস্থিত করছি:

"গুপ্ত কবির রচনাতে খুব গূঢ়ভাব বা কল্পনার বিশেষ লাবণ্যময়ী লীলাখেলা না থাকিলেও ভাবকে কখন ভাষার বিরাগ জন্য ম্রিয়মাণ হইতে হয় নাই। অনেক সময় হয়ত গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায়, অলংকার ঘটায় কিশোর ভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রৌঢ়ভাব কখন রুগ্‌ণা, ভগ্না, রোগিণী ভাষাকে সঙ্গিনী পাইয়াছে বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনী। ভাষা কোথাও তুব্‌ড়ির মত ফুটিতেছে—আর চারিদিকে কেবল ফুল উঠিতেছে; কোথাও ভাদ্রের গঙ্গার মত ছুটিতেছে—পালভরে কত তরিই না তাহাতে চলিয়াছে; কোথাও বসন্তে লতার মত ধীরে ধীরে দুলিতেছে—ফুলের গন্ধে ভোর করে; কোথাও ঝড়—বৃষ্টি বাদলের মত তড় তড় করিয়া শিল পড়িতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা দুরন্ত বালকের মত ধরি ধরি করিতে করিতে কুঁদিয়া কুঁদিয়া যায়,—ঠাকুরদাদাকে একটী চড় মারিয়া, ঠাকরুণদিদির দিকে একবার সহাস্য মুখভঙ্গি করিয়া, তবে নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসে। ভাষা বড় দুরন্ত।"[৯]

চিন্তাদৈন্য, বক্তব্যের অস্পষ্টতা ও শব্দালংকার-প্রিয়তা এই স্টাইলকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

স্টাইলের পরবর্তী গুণ সংক্ষিপ্ততা, পরিমিতি। 'বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার আত্মা

পরিমিতি'—'ব্রেভিটি ইজ দি সোল অফ উইট'—মন্তব্যের দ্বারা এই সত্যই হ্যামলেট নাটকের পোলোনিয়াস বুঝাতে চেয়েছিলেন। আর প্রমথ চৌধুরী এই সত্যকেই উপস্থিত করেছিলেন তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে—'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।'[১০]

অতিকথন বর্জন করে মিতভাষণে, অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস বর্জন করে আত্মসংযত পরিমিত বক্তব্যে উপনীত হবার সাধনাই স্টাইলের সাধনা। এই সাধনা, দুঃখের বিষয়, সকল গদ্যলেখককে আকর্ষণ করে না।

অতিকথন-দোষদুষ্ট স্টাইলের সামান্য নমুনা এখানে উদ্ধার করি:

"মনুষ্যজগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, একথা তথাপি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাসির যুদ্ধ' কাব্যে সর্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণস্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যতদিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।"[১১]

এখানে ভাবের উচ্ছ্বাস ও বক্তব্যের অসংযত প্রকাশ স্টাইলকে ব্যর্থ করেছে। বক্তব্যে পরিমিত প্রকাশ রচনাকে কেবল সংহতি ও পরিপাটি দান করে না, সেই সঙ্গে উন্নত ও উৎকৃষ্ট করে,—এই উপলব্ধির শোচনীয় অনুপস্থিতি এই উদ্ধৃতিতে অনায়াস লক্ষণীয়।

এপিগ্রামের পরিমিতি ও সংহতি রচনাকে যে পরিমিত শ্রী দান করে, সে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সচেতনতা খুব কম বাংলা লেখকেরই আছে। প্রাচীন সংস্কৃত চীনা ও গ্রীক কবিতায় এই গুণটির বিশেষ চর্চা হয়েছিল। ফরাসি সাহিত্যেও এই গুণের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। ল্য ফঁতেন, ল্য রোশফুকো, ল্য ব্রুয়ে-র রচনায় এই গুণের সার্থক স্বীকৃতি প্রমথ চৌধুরীকে উৎসাহিত করেছিল। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের স্বল্পাক্ষর তীক্ষ্ণাগ্র শ্লোক তাঁকে এই পথে চালনা করেছিল। এই জন্যেই তিনি সনেটে বনেট-পরা সরস্বতীকে চেয়েছিলেন, আলুলায়িতকুন্তলা শিথিলবাস বিশৃঙ্খলসৌন্দর্য কবিতা-বনিতার আরাধনা করেন নি। ইংরেজিতে পোপ্-এর কবিতায়, স্টার্ন বার্ক ও ল্যাণ্ডরের গদ্যে, ফরাসিতে পূর্বোক্ত কবিদের রচনায়, ভোলতেয়ার ও

ম'তাস্ক-এর গদ্যে এই বৈশিষ্ট্য অনায়াসলক্ষণীয়। এঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণচঞ্চল রচনার ভিত্তি পরিমিতি ও সংহতি (ব্রেভিটি)। এই গুণ রচনাকে দেয় গতি ও শক্তি, লাবণ্য ও ইঙ্গিতধর্মিতা, স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা'।

কিন্তু পরিমিতি ও সংক্ষিপ্তির অতিচর্চায় যে বিপদ আছে, সে-বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। ভাবের অতি সংহতি, ভাষার ঘন-পিনদ্ধতা, বক্তব্যের তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্তি অনেক সময় পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে। এক মুহূর্তের অনবধানতায় একটি মূল্যবান শব্দ সে হারাতে পারে। পাঠকমনের এইসব ক্ষেত্রে কোনো অবসর থাকে না, তাকে সদাজাগ্রত থাকতে হয়। পাঠকের থাকে না চিন্তার অবসর, থাকে না আত্মমগ্নতার অবকাশ, থাকে না বক্তব্যকে আপন ভাবে উপভোগের সুযোগ।

সেইক্ষেত্রে প্রয়োজন অবকাশ, বিরাম, অবসর। এখানেই পাই স্টাইলের তৃতীয় গুণ—বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যহীন তীক্ষ্ণাগ্র সংহত চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা অনেক সময়েই পাঠকমনের এত বেশি মনোযোগ ও আনুগত্য দাবি করে যে রচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। একারণেই রচনায় বৈচিত্র্যসাধন লেখকের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বৈচিত্র্য কেবল প্রকাশভঙ্গির নয়; লেখকের মেজাজের বৈচিত্র্য, অনুভূতির বৈচিত্র্য, লেখকের কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য পাঠককে যে বিচিত্র স্বাদ দেয়, তাতে রচনা আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে। যদি বারো মাস তিরিশ দিন পোলাও খেতে হয়, তাহলে শেষপর্যন্ত রসনার স্বাদ চলে যায়,—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিচিত্র প্রক্রিয়ায় রন্ধন যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ বাড়ায়, তেমনি রচনায় বৈচিত্র্য রচনাকে উপভোগ্য করে তোলে। শেকসপীঅরের উপভোগ্যতার মূলে যে ক'টি উপাদান আছে, বৈচিত্র্য তাদের অন্যতম, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সুতরাং স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের অভাবে স্টাইলের অপকর্ষ, এই সত্য আমাদের মেনে নিতে হয়।

স্টাইলের পরবর্তী গুণ—তার নাগরিকতা (আরব্যানিটি)। চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা, যুক্তিধর্মিতা ও প্রাণের সজীবতা নাগরিকতা-গুণের লক্ষণ। এর বিপরীত চিত্র হল গ্রাম্যতা

(ইনডিসেন্সি), তাকেই সংস্কৃত আলংকারিকরা বলেছেন অশ্লীলতা। প্রমথ চৌধুরী এই গ্রাম্যত্ব বা অশ্লীলতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "তাঁদের মতে অশ্লীলতা-দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার পোয়েটিক্স্-এর অন্তর্ভূত, এথিকস-এর নয়।"[১২] বামন প্রমুখ আলংকারিকরা বলেন, গ্রাম্যতা (ভাল্‌গারিটি) হচ্ছে শব্দের দোষ। শব্দ ব্যবহারে দুষ্টতা বা গ্রাম্যতাই অশ্লীলতা। বামনের এই কথাটি অলংকার-শাস্ত্রের শেষ কথা বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন—'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলা-তঙ্কদায়ী'—যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশংকা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। সহৃদয় সামাজিকের (কালচার্ড) মনে যদি লজ্জা বা ঘৃণার ভাব জন্মে, তবে তার উৎস যে রচনা, তা অশ্লীল, গ্রাম্য।

গ্রাম্যতা বলতে বুঝি চিত্তের অনুদারতা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা, যে-কোনো পরিবর্তনের প্রতি বিমুখতা, শ্রেষ্ঠত্বাভিমান। গ্রাম্যতা, উপনাগরিকতা, প্রাদেশিকতা অনেক সময়ে লেখাকে আচ্ছন্ন করে। গুণগ্রাহিতার অভাব ও নোতুনের প্রতি বিরাগ গ্রাম্যতায় লক্ষণীয়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে ('কৃষ্ণচরিত্র') বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র কয়েকটি স্থানে গ্রাম্য রুচির পরিচয় দিয়েছেন, বিদেশী পণ্ডিতদের প্রতি অকারণ ঈর্ষা, অযৌক্তিক ক্রোধ ও নোতুনের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নীতিবাদীদের লেখায় এই দোষ প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

গ্রাম্যতার বিপরীতধর্মিতাই নাগরিকতা। সহাস্য রসিকতা, মার্জিত বুদ্ধি, পরিচ্ছন্ন চিন্তা, শব্দ ব্যবহারে ত্রুটিহীনতা, বৈদগ্ধ্য ও চিত্তের উদারতা নাগরিকতার নামান্তর। ভদ্রতা ও নাগরিকতা বলতে মূলতঃ অমার্জিত স্থূল গ্রাম্য রুচির বিপরীত দিককেই বুঝায়। লেখকের মার্জিত ব্যক্তিত্বের, বৈদগ্ধ্যের প্রকাশই নাগরিকতা। দান্তে, মিল্টন, সুইফ্‌ট, ব্লেক, শাতোব্রিয়াঁ পাঠকের প্রতি নির্মম, অপ্রিয় সত্যভাষণে অকুণ্ঠ, মানবিক দুর্বলতার কষাঘাতে ক্ষমাহীন। পাঠকের সঙ্গে এঁদের প্রীতিসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। অপর পক্ষে হোরেস, চসার, মঁতেন, মলেআর, গোল্ডস্মিথ, ডিকেন্স, ল্যাম্ পাঠকের সহমর্মী, সখা, বন্ধু হয়ে ওঠেন প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের জন্যে। তাঁরা পাঠকের দুর্বলতাকে ক্ষমাস্নিগ্ধ হাস্যে অভিষিক্ত করেন, পাঠকের ভয় ভাঙিয়ে কাছে টেনে নেন। এই কারণে চন্দ্রনাথ বসু বা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অপেক্ষা প্রমথ চৌধুরী বা প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে পাঠক-হিসেবে আমার সম্পর্ক

ঘনিষ্ঠতর। এই কারণে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও পূর্ণচন্দ্র বসুকে দূর থেকে নমস্কার করি; কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসি।

নাগরিকতা-গুণের দ্বারা পাঠকের সঙ্গে লেখকের প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পাঠক অজ্ঞাতসারে লেখকের অনুভূতিলোকে উঠে আসেন, তাঁর আনন্দ বেদনার অংশীদার হন।

নাগরিকতা-গুণের অভাবে স্টাইলে যে দোষ ঘটে, প্রথমে তার পরিচয় গ্রহণ করি। শেকসপীঅরের 'ওথেলো' নাটকের শেষাংশে ওথেলো-কর্তৃক ডেসডিমোনা-হত্যাদৃশ্যের নিম্নধৃত আলোচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে, তা পাঠককে কাছে টানে না, দূরে ঠেলে দেয়:

"একজন প্রতারিত বুদ্ধিহীন মূরেব মত লোকের প্রতি কিছু এত সহানুভূতি জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিবপরাধা স্ত্রীর হত্যা তাহার (সহৃদয় ব্যক্তির) সহ্য হইবে। কোন ঘোর মহাপাতকীর খুন হইলে তবু লোক বলিতে পারে, কি হইবে? রাগের মাথায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি স্ত্রী-হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পাপীয়সী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। গোঁয়াব লোকের প্রতি কাহার দযার সঞ্চাব হইতে পারে? হিন্দুব চক্ষে যে আদর্শ রহিয়াছে, প্রকৃত সহৃদয় হিন্দুব যাহা রুচি হওযা উচিত, হিন্দু সমাজের এবং হিন্দুধর্মের যাহা বিধান, স্ত্রীহত্যা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আবার সেই স্ত্রীকে যখন নিরপরাধা বলিয়া বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, তখন তাহার হত্যা কোন্ হিন্দু পড়িতে বা দেখিতে পারেন? সেরূপ স্ত্রীহত্যা দেখাতে কি মনের মলিনতা জন্মে না, অন্তরে পাপস্পর্শ হয় না? সুতরাং তাহা দেখিতেও পাতক আছে।

প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এই স্ত্রীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্মাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।··· ·বাস্তবিক যাহা ইউরোপে ট্রাজেডি বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ তাহা হিন্দু ধর্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে। সেই ট্রাজেডি এদেশে আসিয়া কি অনর্থই না ঘটিয়াছে।"[১৩]

এই স্টাইল গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট, নাগরিকতা গুণবর্জিত, কারণ লেখক এখানে সংকীর্ণ অনুদার রক্ষণশীল বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং সাহিত্য-রুচির পরিবর্তনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। এই রচনা একটি উৎকৃষ্ট নাট্য-দৃশ্যের প্রতি পাঠকমনে জুগুপ্সা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে, সামাজিক সংস্কারের

চাপে সাহিত্যবোধকে দলিত করে, পাঠকের সঙ্গে লেখকের কোনো প্রীতি-সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

নাগরিকতা-গুণ কীভাবে স্টাইলকে হার্দ্য ও স্বাদু করে তোলে, কীভাবে লেখক পাঠককে তাঁর সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করেন, তার পরিচয় পাই নিম্নধৃত রচনায়:

"এখন আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানত এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্টিতে। তিনি যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য উদ্ভাবনে যতই কেন চিন্তার গভীরতা বা প্রগাঢ়তা থাক, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস, পরিহাসের একটু জ্বালা দেখা যায়। তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত বড় মনে করেন না—এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। একের জন্ম অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়া দিতে পার না। তুমি যাহাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছ, তাহার ভিতরও ক্ষুদ্রত্বের উপাদান আছে। তাই তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু-বিষয়-সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু-বিষয়-সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লিখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষায় এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ-ভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন্ কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন্ কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন। বিখ্যাত সমসাময়িক ফরাসী লেখক আনাতোল্ ফ্রাঁসের মনের প্রকৃতি অনেকটা এই রকমের।

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষা।…তিনি কোনও শ্রেণীর শব্দকেই নির্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গ-কুলীন 'সাধু' শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন 'ইতর' শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে?—ভাষার জীবন শব্দ। যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ডী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার জীবনীশক্তিরও হ্রাস পাইয়াছে।

কবির যে মনোধর্মের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার

'বিশ্বরূপ', 'বিশ্বকোষ', 'বিশ্বব্যাকরণ' ও 'আত্মপ্রকাশ' নামক কয়েকটি সনেটে বেশ সুপ্রকাশ। বিশ্বরহস্য লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত যে, তাহারা জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিতে পারে না—তাহারা অনুক্ষণ তর্কবিতর্কে মত্ত। কবি কিন্তু বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-সুখে গুম্ফ প্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষৎ হাস্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,—

বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!

'তার চেয়ে এস' এই বিপুল বিশ্বে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত সকল টানিয়া লইয়া—

প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক!"[১৪]

এই রচনায় নাগরিকতা-গুণ স্টাইলকে সমৃদ্ধ করেছে। লেখকের উদার জীবনবোধ, মার্জিত রুচি ও সংস্কারমুক্ত সাহিত্যবোধ সমালোচ্য কবির সঙ্গে পাঠকের যোগ সাধন করিয়েছে, পাঠকের সাহিত্যরুচিকে মার্জিত ও উন্নত করেছে, পাঠকমনে ব্রীড়া বা জুগুপ্সা নয়, একটি নোতুন সাহিত্য-আধারে (সনেট) প্রথাবর্জিত পথে জীবনোপভোগের পন্থা নির্দেশ করেছে।

গ্রাম্যতা-দোষ দূরীকরণের পন্থা কি? অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা দূর হবে কি করে? অতিকথন-দোষ বর্জনের উপায় কি?

এই তিন প্রশ্নেরই এক উত্তর: চাই সরলতা (সিম্‌প্লিসিটি)। স্টাইলের অন্যতম প্রধান গুণ সরলতা। যাঁর হাতে প্রবন্ধ (এস্‌সে) স্বতন্ত্র শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই নিপুণ ফরাসি গদ্যশিল্পী মঁতেন স্টাইলের তিনটি প্রধান গুণ নির্দেশ করে বলেছেন—চাই স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), সংক্ষিপ্তি (ব্রেভিটি) ও সরলতা (সিম্‌প্লিসিটি।[১৫]

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র সরলতা-গুণকে স্টাইলের প্রধানতম গুণ বলে নির্দেশ করেছেন।

তাঁর দুটি মূল্যবান উক্তি:

"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য

উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হইবে।"[১৬]

"সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"[১৭]

বস্তুত, রচনার প্রধান ও প্রথম গুণ সরলতা আয়ত্ত করতে যে-কোনো গদ্য-লেখককে সমস্ত জীবন ব্যয় করতে হয়। এখানেই স্টাইলের চূড়ান্ত পরিণতি। তা একদিনে হয় না, তা সাধনাসাপেক্ষ।

সরলতা ও স্পষ্টতা, সিম্প্লিসিটি ও ক্ল্যারিটি, দুয়ে মিলে স্টাইলের পূর্ণতা। সংস্কৃত অলংকারিকেরা একে বলেছেন—প্রসাদগুণ। প্রমথ চৌধুরীর কথায় এ হচ্ছে মনের আলো। লেখকের মন থেকে ঐ আলো যখন বিষয়ের উপর ঠিকরে পড়ে তখন তা স্পষ্ট স্বচ্ছ সরল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্টাইলের বিচারে শেষ লক্ষ্য, এই প্রসাদগুণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত সাহিত্যজীবনের রচনা থেকে প্রসাদগুণ-সমন্বিত একটি অংশ উদ্ধার করি :

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদী-জলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"[১৮]

এই গদ্যাংশের প্রসাদগুণ সহজেই পাঠকের চিত্তদর্পণে ধরা পড়ে।

স্টাইলের পরবর্তী গুণ সরসতা। এই গুণের জন্য লেখকের সহাস্য

রসিকতায়, উদার জীবনদৃষ্টিতে, জীবনসম্ভোগের আনন্দে। এই সরসতা বা গুড হিউমর লেখাকে দেয় স্বাদুতা, পাঠকের মন ভরে ওঠে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দে। অসূয়া, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, জুগুপ্সা এই গুণের পরিপন্থী। জুভেনাল, সুইফট, পোপ, ড্রাইডেন, ভোলত্যের, হোরেস আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গরচনা লিখেছেন। প্রথম তিনজনের লেখায় তিক্ততা প্রাধান্য পেয়েছে, শেষোক্ত তিনজনের রচনায় সরসতা। এই কারণে শেষোক্ত তিনজনের রচনার উপভোগ্যতা প্রথমোক্ত তিন জনের লেখায় নেই।

সরসতা এমন একটি গুণ যার পরিচয় পাওয়া যায় আস্বাদনে, ব্যাখ্যায় নয়। তাই আস্বাদনে যাই।

বাংলা সরস গদ্যরচনার তিনটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে এই গুণ স্টাইলের অর্থাৎ লেখক-ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের পক্ষে কতটা অপরিহার্য। জীবনে ও সাহিত্যে সরসতা ও স্ফূর্তির প্রয়োজন সম্পর্কে ফরাসি সাহিত্যের স্বীকৃতি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। রাবল্যে থেকে দোদে-ফ্রাঁস পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্যে সরসতা-গুণের চর্চা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে তিনটি সরস রচনা উদ্ধার করছি—তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সরসতা-গুণে কিরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা এখানে দেখা যাবে।

[ক] "নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন; তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্য-

বয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিত-নয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালোমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন।"[১৯]

[খ] "পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলচে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললে, 'ওতো আপনি খাচ্ছেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে, কোনো গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেথায় খাবার সময়ে চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ্ 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা, তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে; এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই, আমি কলকেতার মানুষ, এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গার পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না।"[২০]

[গ] "অনেক উকিল-ব্যারিষ্টার অসহযোগ আন্দোলনের ধুমধামের সময় আদালত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার তাঁদের মধ্যে দুচার জন আস্তে আস্তে আদালতে ফিরে যাচ্ছেন দেখে কংগ্রেস মহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমাদের মনে হয়, এতটা হৈ চৈ নিরর্থক। বেচারারা একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ লাভের আশায় দলে ভিড়েছিলেন; এখন দেখছেন যে, স্বরাজ পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এদিকে দু পয়সা রোজগার না করলে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো খায় কি? কংগ্রেসের মাসোহারার উপর নির্ভর করে ত আর চিরদিন চলে না!

আমাদের অনেক দিনের একটা পুরানো ঘটনা মনে পড়ে গেল। একজন

মহা বৈরাগ্যবান জটাজুটধারী পরম সাধুর সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, নির্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘণ্টাকতক সদালাপ হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'বাবাজী, আপনার বাড়ীতে কে আছে? আপনার বৈরাগ্য জন্মাল কোথা থেকে?' সাধুজী বললেন—'বাড়ীতে জমিজমা আছে, দু বছর ধান চাল বেচে শ দু-তিন টাকা হাতেও পেয়েছিলুম; কিন্তু বিয়ে করতেই সে টাকা খরচ হয়ে গেল। মেয়েটিও বয়সে ছোট। তাই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল; সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লুম—তা দেখি দু চার বছর ঘুরে-ফিরে। ব্রহ্মলাভ হলো ত হলো; নয়ত ঘরবাড়ী ত আর কেউ মারে নি!'

আমাদের উকিল বাবুদেরও সেই অবস্থা। একত্রিশে তারিখের মধ্যে স্বরাজ মিললো ত ভালো কথা, নয়ত আদালত ত আর কেউ মারে নি! এই রকম যাঁদের মনের ভাব তাঁদের নিয়ে বেশী টানাটানি করে কোনো লাভ নেই।"[২১]

এই তিনটি গদ্যরচনার অন্তরালে যে সহাস্যরসিক লেখক-ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তাদের উপস্থিতি মুহূর্তেই পাঠক উপলব্ধি করে। স্টাইলের অন্যতম গুণ সহাস্য-রসিকতা। এর উৎস লেখক-ব্যক্তিত্ব, সে-কারণেই তা স্টাইলের অঙ্গীভূত, বাইরে থেকে আরোপিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন:

"অলংকার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলংকার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলংকার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।"[২২]

অর্থালংকার (উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক) যে স্টাইলের বহিরঙ্গ নয়, স্টাইলেরই অঙ্গীভূত, তা আমরা গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। একথা স্বীকার্য যে রবীন্দ্র-গদ্যরচনায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের ব্যবহার বাইরের বিভূষণ নয়, সহজাত সৌন্দর্য, স্টাইলের অঙ্গীভূত। লেখক-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক রূপে সরসতা-সৃষ্টিনৈপুণ্য ও অলংকার-প্রয়োগ-কুশলতাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই।

স্টাইলের যে ছয়টি গুণ (স্বচ্ছতা, সরলতা, পরিমিতি, বৈচিত্র্য, নাগরিকতা ও সরসতা) এখানে লক্ষ্য করলাম, তা লেখক-ব্যক্তিত্বকে পাঠকের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। এদের অভাবে স্টাইলের অপকর্ষ, অতি প্রয়োগে গুণের হানি আর যথার্থ ব্যবহারে স্টাইলের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই ছয়টি গুণের সমবায়ে স্টাইলের পূর্ণতা, অভাবে দুর্বলতা। স্টাইলের মূল লক্ষ্য লেখক-ব্যক্তিত্বের উদ্‌ঘাটন; যেখানে তা ঘটে না, সেখানেই স্টাইলের ব্যর্থতা।

উল্লেখপঞ্জী

১ 'Le style est l'homme meme' — Buffon. 'Discours sur le style'.

২ 'Le style c'est une maniere de voir (penser, sentir)'. — Flaubert.

২ক 'Style consists in the order and the movement which we introduce into our thought.'—Buffon, Discourse on Style'.

৩ 'You are an artist.......You feel superbly, you are plastic ; that is, when you describe a thing, you see and touch it with your hands. That is real writing.'—Tchehov to Gorky.

৪ 'Le style est ceci : Ajouter a une pensee donnee toutes les circonstances propres a produire tout l'effet que doit produire cette pensee.' —Stendhal (Henri Beyle), 'Racine et Shakespeare'.

In Murry's translation: "Style is this: to add to a given thought all the circumstances fitted to produce the whole effect which the thought is intended to produce." ('The problem of style', pp. 79)

৫ Herbert Read, Introduction, 'English Prose Style' (1963)

৬ রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮)

৭ 'But far the greatest thing is a gift for metaphor. For this alone cannot be learnt from others and is a sign of inborn power.' — Aristotle, 'Poetics', xxii.

'In conversation all of us use metaphors and ordinary, current words. Evidently by a proper combination of these one may attain a style that will remain clear, yet unobtrusively avoid the commonplace....... In prose there is all the more need to take pains with this because prose has fewer resources than verse. Metaphor gives, above all, three advantages — clarity, delightfulness, unfamiliarity. And none can borrow this gift from another.' — Aristotle, 'Rhetoric' III, 2.

৮ 'D' abord la clarte, puis encore la clarte, et enfin la clarte.' — Anatole France.

৯ 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয় (১৯৬০) পৃঃ ৩৬০-৬১

১০ 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ', বীরবলের হালখাতা, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১

১১ 'পলাসির যুদ্ধ', কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ২২২

১২ 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত', প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১

১৩ 'সাহিত্যে খুন', পূর্ণচন্দ্র বসু, সমালোচনা-সাহিত্য (১৯৪৯), পৃঃ ৪৫-৪৬

১৪ 'সনেট-পঞ্চাশৎ', প্রিয়নাথ সেন, তদেব, ১৬২-৬৩

১৫ 'Le parler qui i'ayme, c'est un parler simple et naif, tel sur le papier qu'a la bouche; un parler succulent et nerveux, court et serre; non tant delicat et peigne,

comme vehement et brusque......non pédantesque, non fratesque, non plaideresque, mais plustost soldatesque.' —Montaigne.

১৬ 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২

১৭ 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', প্রচার, মাঘ ১২৯১, 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২

১৮ দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৯ বিষবৃক্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

২০ পরিব্রাজক

২১ 'দোষ কার?', পথের সন্ধান

২২ 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'

২ | স্টাইলের বিবর্তন : ফরাসি, ইংরেজি, বাংলা

কবিতায় যদি কোনো জাতির হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পায়, তবে গদ্য রচনায় প্রকাশ পায় তার মনস্বিতা, চিন্তাসামর্থ্য ও যুক্তিপূর্ণ জীবনদৃষ্টি। গদ্যরীতির বিশুদ্ধতর মূর্তি দেখা যায় প্রবন্ধে, যুক্তিধর্মী আলোচনায়। সেখানে মননশক্তির সুপ্রচুর চর্চা ও বিষয় প্রতিপাদনে লেখকের একাগ্র দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। কথাসাহিত্যে ও নাটকে গদ্যের যে রূপ দেখা যায়, তা আবেগধর্মী, অলংকৃত, বর্ণাঢ্য ও পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গদ্যের এই দুই রূপ সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করে।

বাংলা গদ্যের ক্রম-বিবর্তন ও গদ্য-স্টাইলের পরিণতির পথরেখা অনুসরণের পূর্ব মুহূর্তে ফরাসি ও ইংরেজি গদ্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা উচিত বলে মনে করি। এক্ষেত্রে সংস্কৃত গদ্যরীতি আমাদের সাহায্য করবে না। কারণ আধুনিক যুগে (রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগে) সংস্কৃত গদ্য এসে পৌছয় নি, আধুনিক পরিবর্তমান সমাজের সঙ্গে তাল রেখে তা পরিবর্তিত হয় নি, পরিবর্তনশীল জীবন থেকে তা বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গদ্যভাষায় লেখকের মূল লক্ষ্য ভারসাম্য,—চিন্তা ও বক্তব্যের ভারসাম্য, বক্তব্য ও ভাষার ভারসাম্য, লেখক ও পাঠকের (সমাজের) ভারসাম্য, সমাজ ও সমকালের ভারসাম্য। সংস্কৃত গদ্য কালস্রোতের সঙ্গে তাল রেখে বিবর্তিত হয় নি বলে জনসমাজ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, এ কারণেই সংস্কৃত গদ্যরীতির আলোচনা আমাদের পক্ষে নিরর্থক।

বাংলা গদ্যরীতি নানাভাবে, পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে ফরাসি ও ইংরেজি গদ্যরীতির কাছে ঋণী। সেই ঋণের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফরাসি ও ইংরেজি গদ্যরীতির রূপরেখা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে দুই গদ্যরীতির সঙ্গে পরিচয় সাধন করি।

ষোড়শ শতকের সূচনায় ভেনিস নগরীর পরিবর্তে লির্ঁ নগরীতে মুদ্রণ-ব্যবসায় স্থানান্তরিত হল। ইতালি থেকে ফ্রান্সে মুদ্রণ ও পুস্তক-ব্যবসায়ের এই স্থানান্তরণ রেনেসাঁস-উজ্জীবিত ইউরোপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভেনিসের এক ছাপাখানার মালিক আলডুস মামুটিয়াস ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে নোতুন ইটালিক হরফ তৈরি করে মুদ্রণব্যবস্থায় বিপ্লব আনলেন। শস্তায় অক্টাভো আকারে প্রচুর বই তিনি ছাপালেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মুদ্রণ ও পুস্তক-ব্যবসায় ফরাসিদের হাতে চলে এলো। ঐ সময় ফ্রান্স ইতালিতে সামরিক বিজয়ের যে ফলভোগ করছিল, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভ হল এই মুদ্রণ-ব্যবসায়ে। ফ্রান্সের সম্রাট দ্বাদশ লুই মুদ্রণ-শিল্পকে গুরু করভার থেকে অব্যাহতি দিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ও তাঁর ভগিনী নাভারের রাণী মার্গেরিট লেখকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা দিলেন এবং ইতালীয় স্টাইলের রচনায় প্রচুর উৎসাহ দিলেন। মানবতাবাদ, পেত্রার্কান স্টাইল ও প্লেটোনিক দর্শনচিন্তা,—এই তিনের সুফল ষোড়শ শতকের ফ্রান্স আত্মসাৎ করল এবং সুরু হল ফরাসি গদ্যের জয়যাত্রা। [১]

ফ্রান্সের প্রথম আধুনিক লেখক ফ্রাঁসোয়া রাবল্যে (১৪৯০-১৫৫৩)। মানববিদ্যার সকল ক্ষেত্রে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'গারগাঁতুয়া ও প্যাঁতাগ্রুয়েল' (১৫৩২-৫২) চারখণ্ডে বিশ বছর ধরে তিনি লিখেছিলেন (পঞ্চম খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত ও সম্ভবত অপরের দ্বারা সমাপ্ত)। আপাতদৃষ্টিতে এই বিরাট গ্রন্থ অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার-রোমান্স, ভুতুড়ে কাহিনীর সমষ্টি। আসলে এটি মানবতাবাদী আধুনিক সর্বজিজ্ঞাসু মনের সহস্র সংশয় ও কৌতূহলের ফল। ব্যঙ্গ, কৌতুক ও কমিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাবল্যে-র এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে যে, বিদ্যার বিস্তারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে উন্নততর সমাজের সৃষ্টি হবে। মানবতাধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চাই, একথা রাবল্যে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। শব্দ-ব্যবহারে লেখকের উদারতা এখানে বিশেষ লক্ষণীয়। দেশী-বিদেশী, পারিভাষিক, পাণ্ডিত্যধর্মী, আঞ্চলিক, গ্রাম্য—সব রকম শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। সুপ্রচুর বিশেষণ ও আঞ্চলিক শব্দের সাহায্যে নিজস্ব স্টাইলে প্রত্যক্ষ শব্দচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র অংকনে তিনি পারদর্শিতা দেখিয়াছেন। মধ্যযুগীয় রেটোরিকার বা অলংকার-সর্বস্ব পণ্ডিতদের হাত থেকে তিনি ফরাসি গদ্যকে উদ্ধার করেছিলেন। রাবল্যের সাহিত্যসাধনার মূল মন্ত্র তিনটি—ব্যঙ্গধর্মী রচনার দ্বারা সমাজকে

আঘাত করার স্বাধীনতা, সাহিত্যে নব নব পরীক্ষার স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা। এই মন্ত্রবলে তিনি ফরাসি গদ্যকে জনজীবনের কাছে নিয়ে এলেন, ভেঙে দিলেন পূর্বেকার আভিজাত্য-গর্ব ও দূরত্ব।

ফ্রাঁসোয়া দ্য মালের্ব (১৫৫৫-১৬২৮) ফরাসি সম্রাট চতুর্থ হেনরীর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন ষোড়শ শতকের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে। তিনি কবিতা লিখে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ভাষা-সংস্কারক রূপে। তাঁর শিষ্য রেসান মালের্ব-সম্পর্কিত স্মৃতি-কথায় ('মেমোয়ার্স পুর্ দ্য লা ভী দ্য মালের্ব', ১৬৭২) দেখিয়েছেন, মালের্ব ফরাসি গদ্যভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় কী প্রয়াস করেছেন। গ্রীক ও লাতিন শব্দ আমদানি বন্ধ করে, পূর্ববর্তী লেখকদের পাণ্ডিত্যগন্ধী সমাসবদ্ধ আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ বর্জন করে, কথ্য ভাষার নানা তুচ্ছ বুলি বাদ দিয়ে ফরাসি গদ্যকে তিনি বিশুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের সূচনায় ভাষার বিশুদ্ধি, শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষার প্রধান পুরোহিত রূপে মালের্ব দেখা দিয়েছিলেন। ফরাসি গদ্য ভাষার ক্লাসিকধর্মিতার সূচনা হল তাঁর হাতে, পরিণতি ঘটল বোয়ালোর হাতে।

মালের্ব-এর সমসাময়িক অপর প্রধান গদ্যলেখকের নাম মিশেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-৯২)। তিনি সংশয়ী মানবতাবাদী লেখক—জীবনকে দেখেছেন মুক্ত দৃষ্টিতে, অস্বীকার করেছেন সব রকম শাসন। মঁতেন বলেছেন, 'আমি যদি চিত্রকর হতুম, তবে আর্টকে করতাম প্রকৃতির অনুগত। অন্যেরা প্রকৃতিকে করে তোলে কৃত্রিম।' এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে মঁতেন গদ্যকে দিয়েছেন মুক্তি, প্রয়াস করেছেন নোতুন-কিছুর—যাকে ফরাসি ভাষায় বলে এসসে। সেই নামে দেখা দিয়েছে নব সাহিত্যসৃষ্টি—প্রবন্ধ—'এসেইজ' (১৫৮০-৮৮)। এই গ্রন্থ ইংরেজি গদ্য ও প্রবন্ধকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। তাঁর কাছে সাহিত্যের বিষয়বস্তু মানুষ; একমাত্র মানুষ, কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে মানব-স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয়। 'এসেইজ' গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয়-মূলক প্রবন্ধগুচ্ছে মানবস্বভাবের সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ ছবি অংকন করেছেন। গ্রন্থ-সূচনায় বলেছেন, 'আমি-ই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু'। তাঁর স্টাইল ঘরোয়া, ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ; কথ্যভঙ্গির ঢঙে তিনি পাঠককে সম্বোধন করে জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য খোলা মনে উপস্থিত করেছেন। মঁতেনের হাতে ফরাসি গদ্য সহজ ও সাবলীল হয়েছে, রাবলেয়র শব্দাড়ম্বর বর্জিত হয়েছে।

মঁতেনের স্টাইলের গুণ তিনটি—স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), পরিমিতি (ব্রেভিটি), এবং স্ফূর্তি (গ্যেইটি)। ফরাসি গদ্য গড়ে উঠেছে সালোঁবিহারী বাক্‌কুশলীদের মুখে মুখে—এই সত্যের পরিচয়স্থল মঁতেনের গদ্য। সরসতা ও স্ফূর্তি যে জীবনের ও স্টাইলের একটি প্রধান গুণ, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে এই সত্য প্রথম প্রমাণ করলেন মঁতেন তাঁর 'এসেইজ' গ্রন্থে।[২]

ষোড়শ শতকে রাবল্যে, মালের্ব ও মঁতেনের হাতে ফরাসি গদ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল। সপ্তদশ শতকে ইয়োরোপে সাহিত্য ও শিল্পকলার নেতৃত্ব স্পেন থেকে চলে এলো ফ্রান্সে। রেনেসাঁসের ফল ফরাসি সাহিত্য ও শিল্পের সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেল। প্রাচীন গ্রীক-লাতিন সাহিত্যের (ক্লাসিক সাহিত্যের) চর্চা রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ। তারই ফল দেখা গেল সপ্তদশ শতকের ফরাসি সাহিত্যে। সমতা, শৃঙ্খলা, যাথার্থ্য, বস্তুরূপ-সচেতনতা সাহিত্য-শিল্পসাধনার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ বলে গৃহীত হ'ল। বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রবণতা সকল রচনাতেই অল্পবিস্তর দেখা গেল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দুই প্রধান গদ্যলেখক দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ও প্যাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) যুক্তিভিত্তিক দর্শনচিন্তার প্রবক্তা ছিলেন। দুজনেই বিজ্ঞান-চিন্তার অনুশীলন করেছিলেন ও জগৎ-রহস্য সন্ধানে বেরিয়ে এক যুক্তিধর্মী বিশ্বকে পেয়েছিলেন। জগৎ-রহস্য ও ঈশ্বর-রহস্য ভেদে তাঁরা যে চিন্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাও যুক্তিবাদী গদ্য।

এই কালে সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলাদের সালোঁগুলি ফরাসি সাহিত্যে নোতুনের প্রবর্তন করেছিল। কারণ এই সব সামাজিক মিলনকেন্দ্রে ফ্রান্সের জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ হ'ত এবং স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী বাক্‌কুশলী যুক্তিবাদী সামাজিকেরাই সম্মানের আসনটি পেতেন। সালোঁগুলি ছিল সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জীবনের ঘাঁটি। ফ্রান্সের শিল্পরুচি ও সাহিত্য-বোধ এখানেই গঠিত হ'ত। নব্য ক্লাসিক মতবাদের জন্ম এখানেই।

সালোঁগুলির জনপ্রিয়তা দেখে ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তির নিয়ামক কার্ডিনাল রিশ্‌ল্যু সরকারী সাহিত্য-শিল্পসংস্থা রূপে ফরাসি আকাদামি (১৬৩৫ খৃ) খাড়া করলেন। এই বিদগ্ধ ডিক্টেটর ফরাসি সাহিত্য ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইলেন। তার ফল শেষ পর্যন্ত মন্দ হয় নি।

আকাদামির লক্ষ্য ছিল ফরাসি গদ্যভাষার সংস্কার সাধন—ভাষার নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন, ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষণ, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের উপযুক্ত

বাহনরূপে ভাষার প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একটি অভিধান, একটি ব্যাকরণ, একটি সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থ ও একটি অলংকার গ্রন্থ প্রণয়নের কর্মসূচী গৃহীত হল। ফরাসি গদ্যের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ণয়ে এই আকাদামির দান অবশ্যস্বীকার্য। কার্ডিনাল রিশল্যু ছিলেন ক্লাসিকপন্থী, সুতরাং ফরাসি গদ্য ক্লাসিকধর্মী হয়ে উঠল, গদ্য ভাষায় ঋজুতা, স্পষ্টতা, যাথার্থ্য, সংহতি, পরিমিতি ও শৃঙ্খলা গুণের চর্চা হ'ল। নাটকের গদ্যভাষা, গুরু প্রবন্ধের গদ্যভাষা, লঘু ব্যঙ্গরচনার গদ্যভাষা—সর্বত্রই এই সব গুণকে প্রাধান্য দেওয়া হ'ল।

ট্রাজেডি-রচয়িতা কর্নেই (১৬০৬-৮৪), ফেবল্‌স্-প্রণেতা ল্য ফঁতেন (১৬২১-৯৫), কমেডি-রচয়িতা মলিয়ের (১৬২২-৭০) ফরাসি গদ্যকে চোস্ত, সাফ, ধারালো করে তুললেন। ব্যঙ্গধর্মী পদ্য রচনায় বোয়ালো ওরফে দেপ্রেও (১৬৩৬-১৭১১) এবং নাটকে রাসীন (১৬৩৯-৯৯) এই ধারাকে প্রবলতর করে তুললেন। বোয়ালো ভাষার আতিশয্য ও কৃত্রিমতা দূর করলেন। 'আর্ট পোয়েটিক' গ্রন্থে (১৬৭৪) বোয়ালো সাহিত্যের সূত্র নিরূপণ করেছিলেন, ভাষার স্বচ্ছতা সৌষম্য ও কারুশিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন।

আর দুজন কুশলী গদ্যশিল্পী ফরাসি গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন তাঁদের ব্যঙ্গধর্মী সমাজচিত্রে। ল্য রোশফুকো (১৬১৩-৮০) লিখলেন 'ম্যাক্সিমস্',[৩] ল্য ব্রুইয়ের (১৬৪৫-৯৬) লিখলেন 'লে কারাক্টার্স্'। স্টাইলের যে-সব গুণ কুশলী গদ্যকারের অন্বিষ্ট—স্পষ্টতা, সরলতা, নাগরিকতা, ঋজুতা, স্ফূর্তি, যাথার্থ্য ও বৈচিত্র্য—তা এঁদের সকলের রচনায় লক্ষ্য করা গেল।

ল্য ব্রুইয়ের ও ল্য রোশফুকো তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন দশ বছর ধরে, সংশোধন করেছিলেন আরো দশ বছর। এঁদের গ্রন্থ রচনায় মূল সূত্র ছিল —উর্ধ্বশ্বাসে লেখ, মাঝে মাঝে লেখায় বিরতি দাও, দীর্ঘ অবসরে সংশোধন করো, পুনরপি সংশোধন করো।

সপ্তদশ শতকের ফরাসি গদ্য গড়ে উঠেছিল তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে —বিবরণ (অ্যানেকডোট), বচন (ম্যাক্সিম) ও আলেখ্য (পোর্ট্রেট)। রাবল্যে ও মঁতেন প্রথমটি, মঁতেন ও রোশফুকো দ্বিতীয়টি, মাদলিন দ্য স্কুদেরি ও মাদমোয়াজেল দ্য মঁপেঁসিয়ের সালোঁ-বিহারীগণ তৃতীয়টি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এই শতকে ফরাসি কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে যে-সব সূত্র ও নিয়ম প্রণীত ও গৃহীত হয়, আকাদামি ও সালোঁ-মারফৎ সে-সব নিয়ম ফরাসি গদ্য রচনায় আপতিত হয়। তার ফলে শব্দ ব্যবহারে

শৃঙ্খলা ও বাক্যনির্মাণে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতকের ফরাসি গদ্য বিশেষভাবে নিয়ম-নির্ভর, অল্প কথায় অনেকটা ভাব প্রকাশই তার মুখ্য সাধনা।

অষ্টাদশ শতকে ফরাসি গদ্য পূর্ণতা পেল। মঁতাস্ক (১৬৮৯-১৭৫৫), ভোলত্যের (১৬৯৪-১৭৭৮), রুশো (১৭১২-৭৮), দিদেরো (১৭১৩-৮৪), বোমার্শে (১৭৩২-৯৯) কেবল ফরাসি রস সাহিত্য ও চিন্তাপ্রধান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নি, সেই সঙ্গে ফরাসি গদ্যকেও সমৃদ্ধ করে তুললেন।

এন্‌সাইক্লোপীডিস্ট-গোষ্ঠী এই সময় ফরাসি গদ্য নির্মাণে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া-রচয়িতা বুদ্ধিজীবীরা বিজ্ঞানবুদ্ধির সমর্থক, সংশয়বাদী, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ও উদারনৈতিক। রুশো ও দিদেরো এই গোষ্ঠীর দুই প্রধান লেখক। চিন্তাজগতে ও ভাষায় তাঁরা পরিবর্তন ও সংশোধনের পক্ষপাতী। 'এনসাইক্লোপীডিয়া' প্রথম দুখণ্ড ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী সতেরো খণ্ড ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রধান গদ্যশিল্পী ভোলত্যের। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, দার্শনিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ কথা, নাটক, ইতিহাস,—সব-কিছুই তিনি লিখেছিলেন। একটি দর্শনের অভিধান, অসংখ্য ইশ্‌তাহার ও এগারো হাজার পত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁহার 'কাঁদিদ' (১৭৫৯) বিখ্যাত দর্শনচিন্তাসমৃদ্ধ উপন্যাস।

ভোলত্যের যে ক্লাসিক স্টাইল ব্যবহার করেছেন, তার অনুসরণ দুঃসাধ্য। বাক্‌কুশলী ভোলত্যের অনায়াস নৈপুণ্যে একে ব্যবহার করেছেন। যুক্তির ভূমি থেকে এর যাত্রা সুরু, স্বচ্ছ স্পষ্ট ধারণা স্বচ্ছ স্পষ্ট হ্রস্ব বাক্যে প্রকাশেই এর সার্থকতা, কড়া রসিকতা ও শহুরে মজাদার বিবরণে এর সমৃদ্ধি, সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতধর্মী এপিগ্রামে এর বৈচিত্র্য, বাদানুবাদে এর স্ফূর্তি। লা ব্রুয়েইর বা বুস্‌সে-র স্টাইল থেকে এই স্টাইল ভিন্নতর।

এই শতকে অভিধান ও এনসাইক্লোপীডিয়া সংকলন এবং দর্শন ও রাজনীতি-বিষয়ক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ রচনার ফলে ফরাসি গদ্য এক দুর্লভ ক্লাসিক গুণ অর্জন করল; গদ্য হয়ে উঠল সূক্ষ্ম, গভীর অথচ স্বচ্ছ চিন্তার প্রকাশবাহন; সেই সঙ্গে যুক্ত হল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রকাশের উপযোগী সংহত, পরিমিত, এপিগ্রাম-তীক্ষ্ণ ঋজুতা।

অষ্টাদশ শতকের অন্যতম দার্শনিক ও গদ্যশিল্পী রুশো এক স্বতন্ত্র গদ্য-

স্টাইলের সূচনা করলেন। ভোলত্যের-এর স্টাইল ক্লাসিকাল, রুশোর স্টাইল রোমান্টিক। রুশোর স্টাইল প্রায়শই গীতিধর্মী, কখনো বা আলংকারিক। তাঁর দর্শন-বক্তব্যের মূলে আছে রোমান্টিক ভাবনা। প্রকৃতিতে ফিরে যাবার জন্যে তাঁর আহ্বানের উৎস প্রকৃতি সম্পর্কে এক অবাস্তব রোমান্টিক ধারণা। প্রকৃতি বা নেচারকে রুশো সর্ব দুঃখহর শান্তিনিকেতন বলে মনে করতেন। এই রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে রোমান্টিক গদ্যে। 'লে কঁত্রা সোশিয়েল' (১৭৬১), 'এমিল' (১৭৬২), 'লে কনফেশিওঁ' (১৭৭০) গ্রন্থে রুশো আত্মপরিচায়ক রোমান্টিক ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন।

উনবিংশ শতকের ফরাসি গদ্যের যে রোমান্টিক চেহারা মাদাম দ্য স্তীল ও শাতোব্রিয়াঁর রচনায় লক্ষ্য করা গেল, তার সূচনা হয়েছে রুশোর রচনায়। রুশোর পত্রাকারে রচিত 'ন্যুভেল হেলোইজ' (১৭৬১) ও বার্নার্দ্যা দ্য সঁ-পিয়ের (১৭৩৭-১৮১৪)-এর 'পল এট্ ভিজিনি' (১৭৮৭) (এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'পৌল-বর্জিনী' পড়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন)—উনবিংশ শতকের ফরাসি রোমান্টিক উপন্যাসের অগ্রদূত। এখানেই রোমান্টিক গদ্যের সূচনা হয়। ভোলত্যের্-এর যুক্তিবাদ ও এনসাইক্লোপীডিস্টদের জড়বাদের অবসান হ'ল, রোমান্টিক লেখকরা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসি সাহিত্য ও গদ্যরীতিকে অধিকার করলেন। দ্বিতীয়ার্ধে এলেন বাস্তববাদী ও প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক। স্তাঁধাল, মেরিমে, শাতোব্রিয়াঁ, বালজাক, দুমা, ফ্লোব্যের, উগো, জোলা, মোপাসাঁ, দোদে, পিয়ের লোতি, আনাতোল ফ্রাঁস: ফরাসি গল্প উপন্যাসের এইসব উজ্জ্বল নামের সঙ্গে জড়িত আছে ফরাসি গদ্যের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এঁদের অনেকের লেখাই বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

এঁদের মধ্যে সচেতন গদ্যশিল্পীরূপে স্তাঁধাল, ফ্লোব্যের, দোদে ও আনাতোল ফ্রাঁসের নাম অবশ্য উচ্চার্য। এঁরা প্রত্যেকেই স্টাইলের রূপ রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জীতে এঁদের যে সব উক্তি উদ্ধার করেছি, তার দ্বারাই এ-কথা প্রমাণিত হবে।

ফ্লোব্যের বলেছেন, স্টাইল হচ্ছে লেখকের বিভিন্ন বস্তুকে দেখার বা চিন্তা করার একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি। (অধ্যায় ১, উল্লেখ ২)

স্তাঁধালের মতে, কোনো উপস্থিত চিন্তায় সেই চিন্তার প্রত্যাশিত সামগ্রিক ফলদায়ী পরিস্থিতি সৃষ্টি স্টাইলের লক্ষ্য। (অধ্যায় ১, উল্লেখ ৪)

আনাতোল ফ্রাঁসের মতে, গদ্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, গভীর স্বচ্ছতা, অশেষ স্বচ্ছতা। (অধ্যায় ১, উল্লেখ ৬)। আয়রনি তাঁর প্রধান আয়ুধ।

দোদে স্টাইলের প্রধান গুণরূপে সংক্ষিপ্ততাকে নির্দেশ করেছেন। এপিথেট এই সংক্ষিপ্তির প্রধান শত্রু বলে তিনি মনে করেন। এপিথেট বা অভিধা বিশেষ্যের রক্ষিতারূপে থাকবে, দীর্ঘকালের পরিণীতা পত্নীরূপে থাকবে না বলে তিনি মনে করেন।

একটিমাত্র উদাহরণেই উনবিংশ শতকের ফরাসি গদ্য-স্টাইলের ঐশ্বর্য প্রমাণিত হবে। তাঁর আপন দেশ ফ্রান্সের প্রোভাঁস অঞ্চলের বর্ণনামূলক যে পত্রগুচ্ছ দোদে পারীর সংবাদপত্রে লিখতেন, সেগুলি 'আমার উইণ্ডমিল্ থেকে লেখা চিঠি' (লেতর্স দ্য মঁ মুলেঁ, ১৮৬৯) নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়। এইসব গল্পের ভাষায় এমন সকরুণ হাসি, শান্ত শ্রী ও সংযত লাবণ্য আছে, তা আর কোথাও নেই। এখানে তার থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

গল্পের নাম 'লে ভ্যু'—'বুড়ো-বুড়ী'—ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুবাদ।

"আমার বাকী জীবন ধরে আমি সেই দীর্ঘ করিডরটি দেখব; মন্দমধুর ঠাণ্ডা, শান্ত-প্রশান্ত, দেয়ালগুলো গোলাপী রঙের, খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি বাগানটি যেন স্বচ্ছ রৌদ্রালোকে অল্প অল্প কাঁপছে আর শার্সিগুলোর উপর ফুলপাতায় জড়ানো বেহালার ছবি আঁকা। আমার মনে হল আমি সেদেন যুগের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত দরবারখানায় পৌঁছে গিয়েছি।......করিডরের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে, আধ ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে আসছে দেয়াল ঘড়ির টিক-টাক শব্দ, আর একটি শিশু—ইস্কুলের বাচ্চার গলায় শব্দে—প্রতি শব্দে থেমে থেমে পড়ছে: ত—খন·· সেণ্ট ইরেনে·· চিৎকা·· র···করে···বললেন ··· আমি ··· প্রভুর ··· যেন ··· গম ... শস্য ··· আমাকে ··· ময়দা ··· হতে ··· হবে ··· ঐ ··· সব ··· পশুদের ··· দাঁতের ··· পিষণে। আমি ধীরে ধীরে মৃদু পদে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকালুম।

শান্ত অর্ধ দিবালোকে, ছোট্ট একটি কামরার ভিতর, গভীর একটা আরামকেদারার ভিতর ঘুমুচ্ছেন এক অতি বৃদ্ধ। গোলাপী ছোট্ট দুটি গাল, আঙুলের ডগা অবধি সর্ব শরীরের চামড়া কোঁচকানো, মুখ খোলা, হাত দুটি দু' জানুর উপর পাতা। তাঁর পায়ের কাছে নীল পোশাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে—মাথায় নানদের মত টুপি, অনাথাশ্রমের মেয়েদের পোশাক পরা

—সাধ্বী ইরেনের জীবনী পড়ছে—বইখানা আকারে তার চাইতেও বড়। এই অলৌকিক পুরাণ পাঠ যেন সমস্ত বাড়িটার উপর ক্রিয়া চালিয়েছে। বৃদ্ধ ঘুমুচ্ছেন তাঁর আরাম কেদারায়, মাছিগুলো ছাতে, ক্যানারি পাখিগুলো এই হোথায় জানলার উপরে তাদের খাঁচায়। প্রকাণ্ড দেয়াল-ঘড়িটা নাক ডাকাচ্ছে—টিক, টাক, টিক, টাক। সমস্ত ঘরটাতে কেউই জেগে নেই—শুদ্ধ মাত্র খড়খড়ির ভিতর যে একফালি সাদা, সোজা আলো এসে পড়েছে তার ভিতর ভর্তি জীবন্ত রশ্মি-কণা—তারা নাচছে তাদের পরমাণু নৃত্যের চক্রাকারে ওয়ালটস্‌···এই ঘরজোড়া তন্দ্রালসের মাঝখানে সেই মেয়েটি গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছে : সঙ্গে ··· সঙ্গে ··· ছুটো ··· সিংহ ··· লাফ ... দিয়ে ··· পড়ল···তাঁর ··· উপর . এবং ... তাঁকে ··· উদর ··· সাৎ ··· করে ফেলল ··· ঠিক ঐ মুহূর্তেই আমি ঘরে ঢুকলুম।”[৪]

বিংশ শতকের ফরাসি গদ্য আরো উন্নতি লাভ করেছে, স্টাইল আরো পরিপূর্ণতা পেয়েছে। আনাতোল ফ্রাঁস যে স্টাইল নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে পরবর্তীরা ফরাসি গদ্যকে দুরূহ বিমূর্ত চিন্তার ও সূক্ষ্ম জটিল মানবিক অনুভূতির বাহন রূপে গড়ে তুলেছেন। রমাঁ রলাঁ, আঁদ্রে জিদ, মার্সেল প্রুস্ত্‌, জুলে রমেঁ, জর্জেস্‌ দুহামেল, রজার মার্তা দ্যু গার্‌, জাঁ রিশার ব্লশ, ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, আঁদ্রে মাল্‌র‍্য, জাঁ পল সার্তর্‌, অলব্যের কাম্যু ফরাসি প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সঙ্গে ফরাসি গদ্যে দিয়েছেন শ্রী, সংযম ও গতি।

বাংলা গদ্যভাষার চর্চায় ফরাসি গদ্যভাষার আলোচনার সার্থকতা কি ?

পঞ্চাশ বছর পূর্বেই বাঙালি পাঠকের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। “ফরাসি সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি, ভক্তির না হোক, প্রীতির উদ্রেক করে।···ফরাসি সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে।” (ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১)।

পাঠক অধীর হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, ফরাসি সাহিত্য নয়, ফরাসি গদ্যের আলোচনায় আমাদের কি উপকার হবে ?

তার উত্তরও এখানে প্রমথ চৌধুরী দিয়েছেন।

“সংগীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ

আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। ···ইংরেজি সাহিত্যের এই অ্যামেচারিশনেস আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।

ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়। কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্মজগতে, কোনো বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না।······

তারপর সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ট, সে বিষয়েও উক্ত সাহিত্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়।······লেখকদের নিকট ভাষা একধারে উপাদান ও যন্ত্র।···· ফরাসি সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি। কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলত এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।

আমরা যে ভাষায় এখন সাহিত্য রচনা করি, সে ভারতচন্দ্রের ভাষা নয়; ইতিমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে-ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থ-করা শব্দ চাপিয়ে দিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি, তার গতি মন্দ করেছি। ফরাসি সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে বসে গেলে আমরা আবার বহুসংখ্যক পণ্ডিতি শব্দকে সসম্মানে বিদায় করব এবং তার পরিবর্তে বহুসংখ্যক তথাকথিত ইতর শব্দকে সাহিত্যে বরণ করে নেব। কেননা এই কৃত্রিম ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় প্রতিভা মাথা তুলতে পারছে না।"

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যের সংস্কার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলেন। বাংলা গদ্যের যে-সব দোষ তাঁর চোখে পড়েছিল, তা বাংলা গদ্যভাষা থেকে আজ অন্তর্হিত হয়েছে, একথা বলা যায়না। যেমন-তেমন করে লেখা, ব্যাকরণের ও বানানের যথেচ্ছাচার,

পদনির্বাচনে ও পদযোজনায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝংকার, দুষ্ট পদান্বয়, ভাবগত অসংযম থেকে বাংলা গদ্যভাষা মুক্ত হয়েছে, একথা বলা যায় না। সে-কারণেই ফরাসি গদ্যের রীতি ও প্রকৃতির চরিত্র অনুধাবন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

প্রমথ চৌধুরী ফরাসি গদ্য-স্টাইলের উদ্ভব ও বিকাশ যে-ভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলা ভাষা ও ফরাসি ভাষার মধ্যে চারিত্রিক ঐক্য ও সমধর্মিতা তিনি সন্ধান করেছিলেন 'ফরাসি ভাষার বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি ফরাসি গদ্যরীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরীতির বিকাশও লক্ষ্য করেছেন। এখানে আমরা কেবল প্রথম ব্যাপারটি অনুসরণ করব। আমার বিশ্বাস, তা নিরর্থক নয়।

"খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফরাসি জাতি যখন প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করল, তখন হতে লেখা জিনিসটে যে একটি আর্ট এ বিষয়ে ফরাসি কবি এবং ফরাসি গদ্যলেখকেরা সজ্ঞান হয়ে উঠল। এই ক্ল্যাসিক-সাহিত্যের আদর্শ ফরাসি লেখকদের নিকট একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠল এবং এই কারণেই ক্ল্যাসিসিজম্ হচ্ছে সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম।"

এই ভূমিকার পর প্রমথ চৌধুরী ফরাসি ভাষার প্রধান গদ্যশিল্পীদের নামোল্লেখ করে তাঁদের স্টাইলের গুণনির্ণয় করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সার সংকলন করছি :

রাবল্যে-র পাঁচরঙা ভাষার পরিবর্তে ফরাসি গদ্যের ভাষা একরঙা হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকে মালের্ব ভাষা-সংস্কার-কার্যে ব্রতী হন। তিনি পারী নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্যরচনার আদর্শভাষাস্বরূপে গণ্য করেন। মালের্ব ভাষা থেকে গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্য বর্জন করেন। পারীর মৌখিক ভাষার ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ ও ভদ্রতা ভাষার প্রধান গুণ বলে মালের্ব মনে করেন বলেই তাকে আদর্শভাষা রূপে গ্রহণ করেন।

পদ নির্বাচন ও পদযোজনায় মালের্ব-এর লক্ষ্য ছিল। বাক্যরচনা যাতে সুগঠিত হয়, যাতে রেখার সুষমা ও সামঞ্জস্য থাকে, যাতে পদগুলি সুবিন্যস্ত ও সুসম্বদ্ধ হয়, যাতে একটি রচনা পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর ও সমগ্র হয়, সেদিকে ফরাসি গদ্যশিল্পীরা চার শ বছর ধরে মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন। সপ্তদশ শতকে বোয়ালো ভাষার দোষ বর্জনে যত্নবান হন। বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার

আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝংকার রচনাকে কৃত্রিম করে তোলে, তাই এসব দোষ সর্বথা বর্জনীয়—এই হ'ল বোয়ালোর অভিমত।

মালের্ব কর্তৃক আবিষ্কৃত ও বোয়ালো কর্তৃক পরিষ্কৃত নব পথে পরবর্তী গদ্যশিল্পীরা অগ্রসর হয়েছিলেন এবং গদ্যরচনায় সংযম সাধনা করেছিলেন। শব্দাড়ম্বর, শব্দালংকার, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার ও অতিকথনের প্রলোভন থেকে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করেছিলেন। প্যাসকাল, লা ব্রুইয়ের, বস্যুয়ে, ফেনেলঁ, রাসীন, মলিয়ের এই নবপথের যাত্রী। দেকার্তের দর্শনের অন্বিষ্ট আইডিয়ার সুস্পষ্ট পরিচ্ছিন্ন সুনির্দিষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ রূপ। এই রূপকে পাবার জন্যে দেকার্তে ভাষাকে করে তুলেছিলেন সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, শব্দকে ব্যবহার করেছিলেন সুনির্দিষ্ট অর্থে। ভোল্‌ত্যের-এর হাতে ফরাসি গদ্যভাষা হয়ে উঠেছিল লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ

এই সুমার্জিত ভাষা মানুষের চিন্তাপ্রকাশে খুবই উপযোগী। মালের্ব থেকে ভোল্‌ত্যের পর্যন্ত গদ্যশিল্পীরা শব্দ বর্জনের সাহায্যেই ভাষার সংস্কার সাধন করেন। এঁদের হাতে শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠেছিল। এখানে শব্দের বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।

কিন্তু যে শব্দে ব্যঞ্জনাশক্তি, ইশারা, অনুরণন, ইঙ্গিত প্রবল, সে শব্দ এতাবৎকাল উপেক্ষিত ছিল। ফরাসি ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থই একমাত্র অন্বিষ্ট।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসি সাহিত্যে ক্লাসিকাল রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটল, দেখা দিল রোমান্টিক সাহিত্য। শাতোব্রিয়াঁ এর প্রবর্তক, ভিক্তর হিউগো (উগো) এর নায়ক। এঁদের হাতে শব্দে দেখা দিল ব্যঞ্জনা, ইশারা। এঁরা ইতর বলে কোনো শব্দকেই বর্জন করেন নি, শত শত উপেক্ষিত বিস্মৃত শব্দ ও শিল্পবিজ্ঞান থেকে সংগৃহীত শত শত পারিভাষিক শব্দ রোমান্টিক লেখকেরা ব্যবহার করলেন। উগোর নেতৃত্বে এঁরা ফরাসি সাহিত্যে দিয়ে গেলেন অগাধ শব্দসম্পদ। এই নোতুন ভাষা—রোমান্টিক ভাষা—হৃদয়াবেগ প্রকাশে ও বহির্দৃশ্য অঙ্কনে সামর্থ্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিল। ঊনবিংশ শতকে ফরাসি ভাষায় অর্থের চাইতে ইঙ্গিত প্রাধান্য পেল। কিন্তু এই রোমান্টি-সিজম্ ফরাসি জাতির ধাতুগত নয়; অচিরে এর প্রতিবাদে নব রিয়ালিজম্ দেখা দিল। রিয়ালিস্টদের নেতা ফ্লোবেয়র নোতুন উপাদান (রোমান্টিক সাহিত্যসৃষ্ট শব্দসম্পদ) নিয়ে পুরনো (ক্লাসিক) রীতিতে সাহিত্য রচনা

করেছেন। তার ফলে জোলা, ফ্লোবেয়র, মোপাসাঁ, স্তাঁধাল, দোদে, আনাতোল ফ্রাঁস, দুমা, পিয়ের লোতি ফরাসি গদ্যের সার্থক গদ্যশিল্পীরূপে দেখা দিলেন।

এইভাবে প্রমথ চৌধুরী ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ফরাসি গদ্যরীতির পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যের স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনায় ফরাসি গদ্যভাষা ও রীতির আলোচনার সার্থকতা প্রমথ চৌধুরী নিপুণভাবে দেখিয়েছেন 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রকাশিত 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে (১৩২৪ অগ্রহায়ণ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১) ভাষার সার্থকতা অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, "ভাষার উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনো উপায় নেই। অপর পক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরেজরা ইমোশন সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে, যথা স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু শীৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে।"

জ্ঞান ও চিন্তার সার্থক বাহন হওয়াই গদ্যভাষার প্রধান লক্ষ্য : প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্যের সমর্থন পাই স্টাইলের স্বরূপ সন্ধানে স্তাঁধালের বক্তব্যে (প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী ৪ দ্রষ্টব্য)।

এই দৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যভাষার সাবালকত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস সন্ধান করেছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন :

"সে যুগে (নবাবা যুগে) আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্য যুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সেকালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনোই অধিকার ছিল না। সুতরাং ইংরেজ আসার পূর্বে এ দেশে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি ভাল্‌গার টাঙ্গ্, অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরেজি আমলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য

মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরেজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ লাইব্‌নিৎসের যুগে জর্মান ভাষার যে অবস্থা ছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোশন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।”

এই সিদ্ধান্তের শেষাংশ আজ পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজও বাংলা গদ্যভাষা জ্ঞান চিন্তার ভাষারূপে স্বরাজ্যলাভ করতে পারে নি।

লোকভাষা বাংলা ভাষার মুক্তির ইতিহাস অন্বেষণ করে এই প্রবন্ধেই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

“পৃথিবীতে যখন কোনো নূতন ধর্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা।...বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে বৈষ্ণব যুগে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মের, জ্ঞান ও কর্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্মসংস্কারকে বাংলাদেশের রিফর্মেশন বলা অসংগত নয়। তারপর এসেছে আমাদের রেনেসাঁ; ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরেজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তিলাভ করেছি, এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল; আমাদের কাছেও ইংরেজি তেমনি ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে। ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি, সে ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চলছে। কিন্তু সে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতক পরিমাণে ধর্মের ভাষা বলে মান্য। কিন্তু প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙালিদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

অতএব দেখা গেল যে, পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশিই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা; বলা বাহুল্য, ধর্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার

ভাষা।...এই গুণেই ইংরেজি আজ বাংলার উপরে প্রভুত্ব করছে।. এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ভাষা, এককথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা।"

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, বাংলা ভাষাকে স্বাধিকার লাভ করতে হবে, আর সে-কারণেই ক্লাসিক ভাষা (সংস্কৃত) ও আধুনিক বিদেশি জ্ঞান-চিন্তার ভাষার (ইংরেজি, ফরাসি) চর্চা করতে হবে।

॥ দুই ॥

এই দৃষ্টির আলোকে এবার ইংরেজি গদ্য ভাষা ও স্টাইলের পদাংক অনুসরণ করি। ইংরেজি গদ্য প্রথমে লাতিন, পরে ফরাসি গদ্যের চাপে পড়ে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারে নি। লাতিন ও ফরাসি গদ্যের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের ইতিহাসই ইংরেজি গদ্যের প্রথম দিকের ইতিহাস। খৃষ্টীয় দশম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইংরেজি গদ্যের ক্রম-বিবর্তনরেখার অনুসরণ করলে দেখা যায় যে লাতিন-মোহ সহজে যেতে চায় না। সপ্তদশ শতকের শেষে এই মোহ থেকে মুক্তি ঘটেছে এবং ড্রাইডেনের হাতে ইংরেজি গদ্য স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইংরেজি গদ্যের ইতিহাসে পর পর তিনটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে দু শ বছরের মধ্যে—ক্যাকস্টনের ছাপাখানা স্থাপন (১৪৭৬), বাইবেলের অনুমোদিত ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ (১৬১১) ও রয়াল সোসাইটির স্থাপনা (১৬৬০)।

উইলিয়ম ক্যাকস্টন ছাপাখানা স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি, ইংরেজি শব্দভাণ্ডার ও গদ্যরীতি নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিলেন। তিনি নিজে ভাল অনুবাদক ছিলেন। ইংলাণ্ডের বিভিন্ন উপভাষার বাধা ভেঙে ফেলে তিনি দেশকে দিয়েছিলেন ইংরেজি গদ্যের একটি আদর্শ। ক্যাকস্টন টমাস ম্যালোরির অনুবাদ 'মোর্ট দ্য আর্থার' (১৪৭০) ছেপেছিলেন। এর ভূমিকায় ক্যাকস্টন বলেছেন, মাতৃভাষা ইংরেজিকে সমৃদ্ধ করার জন্যই তিনি এটি প্রকাশ করলেন (১৪৮৫)। লর্ড বার্নার্স ফরাসি থেকে অনুবাদ করলেন ফ্রোসার্ত-এর

'ক্রনিকলস্' (১৫২০)। ফরাসি গদ্যের গুণসমূহ এইভাবে ইংরেজি গদ্যে বর্তালো—ঋজুতা, সরলতা ও কাঠিন্য। ম্যালোরির অনুবাদে বিশেষ লক্ষণীয় ইংরেজি বাক্যের গঠনসৌকর্য। সুতরাং ম্যালোরি ও লর্ড বার্ণার্স ইংরেজি গদ্যকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি জোগালেন।

জন উইক্লিফ, মিলস্ কভারডেল ও উইলিয়ম টিন্‌ডেল বিগত দু শ বছর ধরে বাইবেলের বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের অনুবাদে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, তা ইংরেজি বাইবেলকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পারে নি। রাজা প্রথম জেমসের অনুজ্ঞায় এক দল বিশপ সমগ্র বাইবেল হিব্রু ও গ্রীক থেকে অনুবাদের ভার নিলেন এবং ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হল। পরবর্তী তিন শ বছর ধরে তা ইংরেজমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। হার্বার্ট রীডের ভাষায়, এই অনুবাদ 'ইংরেজি গদ্যের বিকাশে সর্বপ্রধান একতম প্রভাব'। ইংরেজি বাইবেলের বাক্য সংগঠন ও শব্দব্যবহার নানাভাবে ইংরেজি গদ্যকে প্রভাবিত করেছে। বাইবেলের সারল্য, সমুন্নতি, ছন্দ ও মূর্ততা ইংরেজি গদ্যকে স্থূল গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণ পাণ্ডিত্য থেকে রক্ষা করেছে এবং গদ্যে এক অননুভূত-পূর্ব আবেগ সঞ্চারিত করেছে।

রয়াল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল দর্শন ও বিজ্ঞান ('প্রাকৃতিক দর্শন') চর্চার উদ্দেশ্যে। ইংরেজি গদ্যের জনক জন ড্রাইডেন ছিলেন সোসাইটির গোড়ার দিকের সদস্য। সোসাইটির ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—বাহুল্য-বর্জিত অনলংকৃত স্পষ্ট স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক সরল রীতির গদ্যচর্চা অন্যতম লক্ষ্য।[৫]

টমাস হবস্, জন ড্রাইডেন, জন বানিয়ান, জন লক—রেস্টোরেশন যুগের এই সব লেখক ইংরেজি গদ্যকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মচিন্তার উপযোগী করে গড়ে তুললেন। সরলতা, স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এঁদের রচনার (এমন কি বানিয়ানের রূপক-কাহিনীর) প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হবস্-এর 'লেভিয়াথান্' (১৬৫১), ড্রাইডেনের 'এসে অফ্ ড্রামাটিক পোয়েসি' (১৬৬৮), বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্' (১৬৭৮), লক্-এর 'অ্যান্ এসে কনসার্নিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' (১৬৯০) সপ্তদশ শতকের ইংরেজি গদ্যকে দিল স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা। এই শতকের সূচনায় প্রকাশিত হয়েছে মঁতেনের 'এসেজ'-এর ফ্লোরিও-কৃত অনুবাদ (১৬০৩) ও বেকনের ইংরেজি গ্রন্থ 'দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ লার্নিং' (১৬০৫)। পূর্ববর্তী শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত হয়েছে রিচার্ড হুকারের ইংরেজি গ্রন্থ 'ল'জ অফ্

ইক্লেসিয়াসটিক্যাল পোলিটি' (১৫৯৪)। এই সাতটি গ্রন্থ ইংরেজি গদ্যে রেনেসাঁস যুগের প্রবর্তন করল।

স্যার টমাস মোর্-এর 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬), বেকনের 'নোভাম্ অর্গানাম্' (১৬১০), মিল্টনের 'দ্য ডক্‌ট্রিনা ক্রিশ্চিয়ানা' (১৬৫০), নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' (১৬৮৭)—লাতিন গদ্যে লিখিত। ড্রাইডেনের 'এসে অফ্ ড্রামাটিক পোয়েসি' (১৬৬৮) এই লাতিন-আনুগত্যের শেষ সূত্রটি ছিন্ন করল, স্বনির্ভর আধুনিক ইংরেজি গদ্যের প্রতিষ্ঠা হ'ল। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইংলাণ্ডের বিদ্যালয়ে লাতিন গদ্যের বিশেষ চর্চা হ'ত এবং ইংরেজি গদ্যচর্চা অবহেলা করা হ'ত। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন জন লক। তিনি 'অন এডুকেশন' গ্রন্থে (১৬৯৩) স্পষ্ট ভাষায় বললেন—লাতিন গদ্যের মোহ পরিত্যাগ করতে হবে, ইংরেজি গদ্যেই সকল মনোভাব ও চিন্তা প্রকাশ করতে হবে এবং সে-কারণে ইংরেজি গদ্যের চর্চায় মনপ্রাণ সমর্পণ করতে হবে।[৬] এখানেই পরবর্তী শতকের—অষ্টাদশ শতকের-ইংরেজি গদ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির সূচনা হ'ল। অতঃপর অষ্টাদশ শতক ইংরেজি সাহিত্যে গদ্যের শতক, যুক্তির শতক, যথাযথতা ও পারিপাট্যের শতক রূপে দেখা দিল।

সপ্তদশ শতকে ইংরেজি গদ্যের যে প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা এখানে উদ্ধার করছি। ইংরেজি গদ্য কীভাবে সরলতা, সাবলীলতা ও স্বচ্ছতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যাবে। মিল্টনের ইংরেজি বাক্য রচিত হয়েছিল লাতিন বাক্যের কাঠামোয়। এই কাঠামোর আশ্রয় ছেড়ে ইংরেজি গদ্য কীভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, তা এখানে লক্ষণীয়।

[ক]

Then they took him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.

And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.

But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.

And he denied him, saying, Woman, I know him not.

And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.

[St. Luke, The Authorised Version of The Bible, 1611.

[খ]

Read not to contradict and confute ; nor to believe and take for granted ; nor to find talk and discourse ; but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested ; that is, some books are to be read only in parts ; others to be read, but not curiously ; and some few to be read wholly, and with diligence and attention. Some books also may be read by deputy, and extracts made of them by others ; but that would be only in the less important arguments, and the meaner sort of books ; else distilled books are like common distilled waters, flashy things. Reading maketh a full man ; conference a ready man ; and writing an exact man.
[Francis Bacon, 'Of Studies', 'Essays', Third Edition, 1625.

[গ]

To begin, then, with Shakespeare. He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul. All the images of nature were still present to him, and he drew them not laboriously, but luckily ; when he describes anything, you more than see it, you feel it too. Those who accuse him to have wanted learning, give him the greater commendation. He was naturally learned ; he needed not the spectacles of books to read nature ; he looked inwards and found her there.

[John Dryden, 'Essay of Dramatick Poesie', 1668.

[ঘ]

My sword I give to him that shall succeed me in my pilgrimage, and my courage and skill to him that can get it. My marks and scars I carry with me, to be a witness for me, that I have fought His battles who will now be my rewarder.

[John Bunyan, 'The Pilgrim's Progress', 1678.

[ঙ]

Some men are remarked for pleasantness in raillery; others, for apologues, and opposite, diverting stories. This is apt to be taken for the effect of pure nature, and that the rather, because it is not got by rules, and those who excel in either of them, never purposely set themselves to the study of it as an art to be learnt. But yet it is true, that at first some lucky hit, which took with somebody, and gained him commendation, encouraged him to try again, inclined his thoughts and endeavours that way, till at last he insensibly got a facility in it without perceiving how; and that is attributed wholly to nature, which was much more the effect of use and practice.

[John Locke, 'An Essay concerning Human Understanding', 1690.

রয়াল সোসাইটির ঘোষণাপত্রে গদ্যচর্চার যে আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল, সপ্তদশ শতকের ইংরেজি গদ্যে তার স্বীকৃতি পাই: বাহুল্যবর্জিত অনলংকৃত স্পষ্ট স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক সরল রীতির গদ্যচর্চা সোসাইটির আদর্শ। উদ্ধৃতি গুলিতে বাইবেলের গদ্যে সারল্য ও স্বাভাবিকতা, বেকনের গদ্যে বাক্য-অনুচ্ছেদ-সংগঠননৈপুণ্য ও যাথার্থ্য, ড্রাইডেনের গদ্যে গতি ও সংহতি, বানিয়ানের গদ্যে সারল্য ও সাবলীলতা, লক্-এর গদ্যে স্পষ্টতা ও নিরাভরণতা অনায়াস লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতক ইংরেজি সাহিত্যে যুক্তির শতক, গদ্যের শতক। এই পর্বের ইংরেজি গদ্যের ভিত্তিভূমি যুক্তি, প্রধান লক্ষণ পারিপাট্য ও সংযম, প্রধান আয়ুধ 'উইট' ও 'কমনসেন্স'। সাংবাদিকতার চর্চা এই পর্বের গদ্যকে দিয়েছে লঘুতা ও ধাবৎশক্তি। এই শতকের প্রথমার্ধের প্রধান গদ্যশিল্পী সুইফ্‌ট, অ্যাডিসন, স্টীল, ডিফো; দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান গদ্যশিল্পী ফীল্‌ডিং, স্মলেট, গোল্ডস্মিথ, জনসন, গিবন, বার্ক।

এই পর্বের ইংরেজি গদ্য স্টাইলকে বলা হয়েছে ক্লাসিক স্টাইল। 'ফর্ম'-এর প্রতি নিষ্ঠা, ভাষার নিয়ম ও ব্যাকরণের প্রতি আনুগত্য, ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষায় যত্ন এই স্টাইলের মূলকথা। ব্যঙ্গরচনা, বাস্তব বর্ণনা, সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ, সাহিত্য-সমালোচনা এই পর্বের প্রধান গদ্য-ফসল। সেই

সঙ্গে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে আবেগপ্রধান উপন্যাস। এই পর্বের গদ্য রেনেসাঁসের বল্গাহীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করল, পূর্ববর্তী পর্বের মানবতাবাদীদের লাতিন-আনুগত্য থেকে মুক্ত হল। যুক্তির দ্বারা হৃদয়াবেগ, সংযমের দ্বারা উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রিত হল। সারল্য, সহজবোধ্যতা, স্পষ্টতা মূলমন্ত্র হ'ল। 'ইংরেজি ইডিয়মের শুচিতা ও শক্তি পূর্ণরূপে ব্যক্ত হ'ল।'[৭] জনসন তাঁর 'ডিক্‌সনারী অফ দি ইংলিশ্‌ ল্যাংগুয়েজ' (১৭৪৭-৫৫) সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বললেন—'এই অভিধান ইংরেজি ইডিয়মের শুচিতা ও যথার্থ অর্থভাবনাকে সংরক্ষিত করেছে।'[৮] এই শতকের গদ্যে অনতিস্পষ্ট ছন্দঃস্রোত ও বাক্যনির্মাণে অ্যান্টি-থিসিসের ব্যবহার অনায়াস লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যে তিনটি স্টাইল লক্ষণীয়—সরল, মধ্যগা, অলংকৃত। সরল স্টাইলের শিল্পী—সুইফ্‌ট, ডিফো, ফীল্‌ডিং, স্মলেট। মধ্যগা স্টাইলের শিল্পী—অ্যাডিসন, গোল্ডস্মিথ। অলংকৃত স্টাইলের শিল্পী—জনসন, গিবন, বার্ক।

সরল গদ্যস্টাইলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুইফ্‌ট।[৯] তা নিশ্চিত, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, দৃঢ়াভিত্তিক। তিক্ত উইটের প্রয়োগে সুইফ্‌টের গদ্য পেয়েছে তীক্ষ্ণতা ও দ্রুতগতি। অপর শিল্পী ডিফোর গদ্য অতি-সরল, কখনো বা দ্রুত লেখনের ফলে ঈষৎ অযত্নশীল। ডিফো, ফীলডিং, স্মলেটের গদ্য কথ্যভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছে।

এই তিনরীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রীতি মধ্যগা স্টাইল, এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এর প্রধান শিল্পী অ্যাডিসন। তাঁর গদ্যে ইংরেজি গদ্যের আধুনিক যুগের যথার্থ সূচনা হ'ল। অ্যাডিসনের গদ্য জটিলতামুক্ত, যথাযথ, বাহুল্যবর্জিত, সুষম, সহজ, সুবিন্যস্ত।[১০] এই গদ্য বহু প্রয়োজন সাধনে সক্ষম—সংবাদপত্র, রাজনীতিচিন্তা, ইতিহাস ও জীবনী এবং প্রবন্ধ রচনায় এর উপযোগিতা তর্কাতীত।

গোল্ডস্মিথের গদ্য ও জনসনের শেষজীবনের গদ্য এই মধ্যগা রীতির উদাহরণ। বাক্যনির্মাণে ও শব্দব্যবহারে গোল্ডস্মিথের নৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। মধ্যগা রীতি যে বহুমুখী প্রয়োজনসাধনে সক্ষম, তার পরিচয় এঁদের গদ্যে পাওয়া যায়। এই মধ্যগা রীতির স্থায়িত্বও অবশ্যস্বীকার্য।

অলংকৃত রীতির গদ্য শতকের প্রথমার্ধে ছিল না। কারণ এর সৌন্দর্যের সঙ্গে ছিল ত্রুটি—বাক্যগঠনে জটিলতা, সুদীর্ঘ বাক্যাংশ ও বাক্য, গুরু শব্দ,

সুপ্রচুর অলংকার ও শব্দাড়ম্বর এই রীতির গদ্যকে করে তুলেছিল মন্থর। জনসনের হাতে এই রীতির দুর্বলতাই প্রকট হয়েছিল, কিন্তু গিবন ও বার্ক্-এর হাতে এই রীতির সবলতা ও সৌন্দর্য নিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যের এই তিন রীতির শক্তি ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক তিনটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক।

[ক]

And so the question is only this—whether things that have place in the imagination may not as properly be said to exist as those that are seated in the memory, which may be justly held in the affirmative, and very much to the advantage of the former, since this is acknowledged to be the womb of things, and the other allowed to be no more than the grave. Again, if we take this definition of happiness, and examine it with reference to the senses, it will be acknowledged wonderfully adapt. How fading and insipid do all objects accost us that are not conveyed in the vehicle of delusion. How shrunk is everything as it appears in the glass of Nature! So that if it were not for the assistance of artificial mediums, false lights, refracted angles, varnish and tinsel, there would be a mighty level in the felicity and enjoyments of mortal men. If these were seriously considered by the world, as I have a certain reason to suspect it hardly will, men would no longer reckon among their high points of wisdom the art of exposing weak sides, and publishing infirmities; an employment in my opinion, neither better nor worse than that of unmasking, which, I think, has never been allowed fair usage, either in the world or the play-house.

[Jonathan Swift, 'The Tale of a Tub', 1704.

[খ]

I am always very well pleased with a country Sunday, and think, if keeping holy the seventh day were only a human institution, it would be the best method that could

have been thought of for polishing and civilizing of mankind. It is certain, the country people would soon degenerate into a kind of savages and barbarians, were there not such frequent returns of a stated time, in which the whole village meet together with their best faces, and in their cleanliest habits, to converse with one another upon different subjects, hear their duties explained to them, and join together in adoration of the Supreme Being. Sunday clears away the rust of the whole week, not only as it refreshes in their minds the notions of religion, but as it puts both the sexes upon appearing in their most agreeable forms, and exerting all such qualities as are apt to give them a figure in the eye of the village A country fellow distinguishes himself as much in the churchyard, as a citizen does upon the Change. the whole parish-politics being generally discussed in that place either after sermon or before the bell rings.

[Joseph Addison, from 'The Spectator', 1711-12.

[গ]

Elated with these praises, which gradually extinguished the innate sense of shame, Commodus resolved to exhibit, before the eyes of the Roman people, those exercises which till then he had decently confined within the walls of his palace and to the presence of a few favourites. On the appointed day the various motives of flattery, fear, and curiosity, attracted to the amphitheatre an innumerable multitude of spectators ; and some degree of applause was deservedly bestowed on the uncommon skill of the Imperial performer. Whether he aimed at the head or heart of the animal, the wound was alike certain and mortal. With arrows, whose point was shaped into the form of a crescent, Commodus often intercepted the rapid career and cut asunder the long bony neck of the ostrich. A panther was let loose ; and the archer waited till he had leaped upon a trembling malefactor. In the same instant the shaft flew,

the beast dropped dead, and the man remained unhurt. The dens of the amphitheatre disgorged at once a hundred lions; a hundred darts from the unerring hand of Commodus laid them dead as they ran raging round the Arena. Neither the huge bulk of the elephant nor the scaly hide of the rhinoceros could defend them from his stroke. Aethiopia and India yielded their most extraordinary productions; and several animals were slain in the amphitheatre which had been seen only in the representations of art, or perhaps of fancy. In all these exhibitions the surest precautions were used to protect the person of the Roman Hercules from the desperate spring of any savage who night possibly disregard the dignity of the emperor and the sanctity of the god.

But the meanest of the populace were affected with shame and indignation, when they beheld their sovereign enter the lists as a gladiator, and glory in a profession which the laws and manners of the Romans had branded with the justest note of infamy.

[Edward Gibbon, 'The Decline and Fall of the Roman Empire', 1770.

উদ্ধৃত উদাহরণে সুইফ্‌টের স্টাইল উইটের আলোয় উদ্ভাসিত, দ্রুতগতি-সম্পন্ন, তিক্ত, রুক্ষ, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ ও পৌরুষসমৃদ্ধ। অ্যাডিসনের স্টাইল আয়রনির আলোয় উজ্জ্বল, নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও শালীনতাযুক্ত, সুমার্জিত ও সুভদ্র। গিবনের স্টাইল অলংকারসমৃদ্ধ, বর্ণাঢ্য, শব্দাড়ম্বরযুক্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ধ্বনিবহুল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যের গৌরব-যুগের এইসব উদাহরণ গদ্যের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

তারপরই আমরা উনবিংশ শতকে উপনীত হই। এই শতকে—রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগে—ইংরেজি গদ্যের অশেষ বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য লক্ষণীয়। রোমান্টিক যুগ একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। এই যুগে কোনো লেখকের সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের মিল নেই। প্রত্যেকের স্টাইল আপন ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, ল্যাম, রাস্কিন, কার্লাইল, ম্যাথু আর্নল্ড, রবার্ট লুই স্টিভেনশন, টমাস হার্ডি, ওয়াল্টার পেটার—প্রত্যেকেই আপন

স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অলঙ্কৃত গদ্য স্টাইলের পুনরাবির্ভাব ঘটল কার্লাইল ও রাস্কিনের লেখায়। এই যুগে কী লিখব তার চেয়ে কেমন করে লিখব, এই ভাবনা দেখা দিয়েছে। গদ্যের স্টাইল ও আর্ট নিয়ে নানা আলোচনাও হয়েছে।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের রোমান্টিক পর্বে সৌন্দর্যধ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জটিল সাহিত্যচিন্তা। কোল্‌রিজের কবিতা ও সমালোচনা তার পরিচয়স্থল। রোমান্টিক জীবনদৃষ্টি লেখককে করে তুলেছিল একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্পী। রোমান্টিক গদ্যরচনায়ও তার নিদর্শন পাই। কোল্‌রিজ, ডি কুইন্সী, হ্যাজলিট, স্কট, থ্যাকারে, ল্যাম্—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। আবেগ ও কল্পনার আশ্চর্য প্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জীবনের তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা। তাই এই পর্বের গদ্যরীতি বহুমুখী, বহুচারী।

ভিক্টোরীয় যুগে সাহিত্যে ও সমাজে রাজনীতি ও ধর্মচর্চায় পুনর্বার যুক্তি-মনোভাব ও রক্ষণশীলতা দেখা দিল। র‍্যাশনালিটি ও পিউরিটানিজম্ প্রাধান্য পেল। বাস্তব সত্যের প্রতি আগ্রহ, বিজ্ঞান সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখা দিল। ভিক্টোরীয় যুগের রক্ষণশীল ইংরেজ সমাজ আত্মসংযম ও কঠিনতর নৈতিক আদর্শে দীক্ষিত হল। গদ্যরীতিতে এলো সংযম, সতর্কতা ও শৃঙ্খলা। বিজ্ঞানচিন্তার ফলে জীবনের সর্বত্র যে সত্যদিদৃক্ষা লক্ষ্য করা গেল, তার প্রভাব পড়ল গদ্যরীতিতে। নিরাভরণ, ব্যাকরণনিষ্ঠ, সংযত, নিশ্চিত স্টাইল গড়ে উঠল। ইংরেজ জীবনে যেমন, তেমনি সাহিত্যে,—বিশেষ করে গদ্যরীতিতে—শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার চর্চা ব্যাপকতর হ'ল।

এই সতর্ক সংযত নিয়মনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল চিন্তারীতি ও প্রসাধিত গদ্যরীতির প্রধান শিল্পী কার্লাইল। তাঁর স্টাইলে এইসব গুণ অনায়াসলক্ষণীয়।

For there is a perennial nobleness and even sacredness, in Work. Were he never so benighted, forgetful of his calling, there is always hope in a man that actually and earnestly works : in Idleness alone is there perpetual despair. Work, never so Mammonish, mean, is in communication with Nature ; the real desire to get Work done will itself lead one more and more to truth, to Nature's appointments and regulations, which are truth.

[Carlyle, 'Past and Present', 1843.

কিন্তু এই ছবি শেষ কথা নয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও গদ্যরীতিতে ঠিক এর বিপরীত ছবিটি পাই রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের লেখায়। কার্লাইল কর্মের গৌরব ঘোষণা ও আলস্যের নিন্দা করেছেন; এখানে তাঁর স্টাইল সংযত, নিরাভরণ, বস্তুনিষ্ঠ। ষ্টিভেনসন আলস্যের জয় ও কর্মশৃঙ্খল-মুক্তির আনন্দ ঘোষণা করেছেন; তাঁর স্টাইল কাব্যগুণসমৃদ্ধ ধ্বনিরোলসমন্বিত। কার্লাইলের রচনার মূল্য বিষয়গৌরবে, ষ্টিভেনসনের রচনার মূল্য বিষয়ীগৌরবে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থেকে এসেছে স্টাইলের ভিন্নতা। কার্লাইল খোঁজেন সংহত স্বচ্ছ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। ষ্টিভেনসনের অম্বিষ্ট জীবনোপভোগের আনন্দ, তাই তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট, শব্দের সুরে তিনি বিমুগ্ধ।

His way takes him along a by-road not much frequented, but very even and pleasant, which is called Commonplace Lane, and leads to the Belvedere of Common-sense. Thence he shall command an agreeable, if no very noble prospect; and while others behold the East and West, the Devil and the Sunrise, he will be contentedly aware of a sort of morning hour upon all sublunary things, with an army of shadows, running speedily and in many different directions into the great daylight of Eternity. The shadows and the generations, the shrill doctors and the plangent wars, go by into ultimate silence and emptiness; but underneath all this, a man may see, out of the Belvedere windows, much green and peaceful landscape; many fire-lit parlours; good people laughing, drinking, and making love as they did before the Flood or the French Revolution; and the old shepherd telling his tale under the hawthorn.

[Robert Louis Stevenson, 'An Apology for Idlers', 'Virginibus Puerisque', 1881.

ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজি গদ্য-স্টাইল বহুমুখী, বহুচারী। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থেকে এসেছে স্টাইলের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। তাতে গদ্যের স্বাদ বেড়েছে। উপকরণের বৈচিত্র্য ও সমারোহ গদ্যে দিয়েছে রূপের বৈচিত্র্য, স্বাদের বৈচিত্র্য।

বিংশ শতকের প্রথম পাদে গদ্যশিল্পীরূপে প্রাধান্য লাভ করেছেন এইচ. জি. ওয়েলস, বার্নার্ড শ', আর্নল্ড বেনেট, চেস্টারটন, ডরোথী রিচার্ডসন, ডি.

এইচ. লরেন্স, জেমস জয়েস, অস্কার ওয়াইল্ড। জয়েসের হাতে ইংরেজি গদ্যরীতির নব জন্ম হয়েছে। তারপর প্রবাহিত হয়েছে দুটি রুধির-নদী—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বসমর। তার ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্য-বোধের অবসান ঘটেছে, নোতুন মূল্যবোধ দেখা দিয়েছে। প্রসাধিত স্টাইল বর্জিত হয়েছে, প্রাধান্য লাভ করেছে অপ্রসাধিত স্টাইল,—তা যেন অপ্রসাধিত সৌন্দর্যরিক্ত জীবনের প্রতিরূপ। শব্দ সম্পর্কে শুচিতা দূর হয়েছে, আঞ্চলিক ও প্রাকৃত শব্দ (স্ল্যাং, কলোকিয়াল, ভালগার, জারগন্) নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদপত্রের দ্রুত লিখনভঙ্গি নানাভাবে সাহিত্যের গদ্যকে প্রভাবিত করেছে। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন ভাষার শুচিতা ও আভিজাত্যকে নষ্ট করেছে। রুক্ষ, কর্কশ, অপ্রসাধিত গদ্যরীতি ও বাক্‌ভঙ্গি সমাদৃত হয়েছে।

তবু সংযত গম্ভীর স্বচ্ছ স্পষ্ট গদ্যরীতির দিন শেষ হয় নি, বরং নব নব বৈচিত্র্যে ইংরেজি গদ্যস্টাইল বিকশিত হয়েছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ : এই বিশ বছরের ইংরেজি গদ্যের সুনির্বাচিত সংকলনে যে-সব গদ্যশিল্পীর রচনা গৃহীত হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই আপন ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল। এঁদের স্টাইলে প্রতিভাত হয়েছে এঁদের প্রখর ব্যক্তিত্ব · উইনস্টন চার্চিল, ই এম. ফর্স্টার, ম্যাক্স বীরবুম, হিলেরী বেলক, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জি. এম. ট্রেভেলিন, রিচার্ড হিলেরী, জয়স কেরী, এল পি হার্টলী, এফ ডি ওম্যানি. অসবার্ট সিটওয়েল, ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি, ফ্লোরা থম্‌সন, ফ্রেয়া ষ্টার্ক, ডেভিড সেসিল, বার্নার্ড শ, রোজ মেকলে, টি এস. এলিঅট, কেনেথ টিনান, এ সি ওয়ার্ড, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, সি ভি ওয়েজউড, রিচার্ড চার্চ, ইরিশ মারডক, মর্টিমার হুইলার, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জন উইণ্ডহ্যাম, জেরাল্ড ডুরেল, রোয়েনা ফার, এলিজাবেথ জেঙ্কিন্স, হ্যারল্ড স্পেন্সার জোন্স।[১১]

ইংরেজি গদ্য-স্টাইলের ট্রাডিশন গড়ে উঠেছে গত তিন শ বছরের গদ্য-লেখকদের অক্লান্ত সাধনায়, ড্রাইডেন থেকে এলিঅট পর্যন্ত গদ্যশিল্পীদের সচেতন গদ্যচর্চায়।[১২] গদ্য-স্টাইলের ট্রাডিশন গড়ে ওঠে একটি গদ্যভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগরীতিকে কেন্দ্র করে'। নানা সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত ও বহিরাগত উপাদানের সমবায়ে গদ্যভাষা নির্মিত হয়। এই সব উপাদান যখন এক শিল্পচেতনায় উন্নীত হয়, শব্দ অর্থ ধারণা ও কথ্যভঙ্গির মিলনে এক সংহত রূপ গড়ে ওঠে, তখনই দেখা দেয় গদ্যের ট্রাডিশন। ইংরেজি সাহিত্যে

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এমনি এক মুহূর্ত এসেছিল, ড্রাইডেনের গদ্যস্টাইলে তা সাকার রূপ ধারণ করেছিল। ড্রাইডেনের আগে গদ্যলেখক ছিলেন না এমন নয়; বানিয়ান, মিল্‌টন, টেলর, ব্রাউন, ডান্‌, বেকন, হুকার, ম্যালোরি ও বাইবেল-অনুবাদকবৃন্দ ইংরেজি গদ্য-স্টাইলকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু ড্রাইডেনে এসে তা বিশিষ্ট শিল্পরূপ লাভ করল, ইংরেজি গদ্য শিল্পচেতনায় উন্নীত হল। গদ্যলেখকদের সংঘচেতনা ও শিল্পচেতনা সংহত রূপ ধারণ করল, গদ্যরচনা গদ্যলেখকের বৃত্তিকে নির্দিষ্ট করে দিল, গদ্যলেখকরা বৃত্তিগত সচেতনতায় উত্তীর্ণ হলেন, এবং সাধারণ পাঠকসমাজকে পেলেন। ড্রাইডেন, অ্যাডিসন, সুইফট, জনসন, গিবন, বার্ক, গোল্ডস্মিথ, জোশুয়া রেনল্ডস, জেমস ফ্রেজার ইংরেজি গদ্যস্টাইলের ধারক ও বাহক রূপে দেখা দিলেন। এঁদের গদ্যরচনার একটি বিশিষ্ট ছাঁচ বা প্যাটার্ন দেখা গেল, এই ছাঁচ লেখক-ব্যক্তিত্বের আদলে গড়ে উঠল। ইতিহাসচেতনা ও বৃত্তিচেতনা লেখকদের রচনাকে দিল ট্রাডিশনের স্থায়িত্ব ও শিল্পবোধ। আজ পর্যন্ত সেই ট্রাডিশন সমানে চলে এসেছে।[১৩]

॥ তিন ॥

জ্ঞান ও চিন্তার সার্থক বাহন হওয়াই গদ্য ভাষার প্রধান লক্ষ্য: এই সত্য স্মরণে রেখে এবার বাংলা গদ্য ভাষার ক্রমবিকাশের পথরেখা অনুসরণ করি। বক্তব্যকে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করাই গদ্যভাষার কাজ; স্টাইল ভাষার এমন একটি গুণ যা লেখকের বিশিষ্ট চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতিকে অব্যর্থভাবে যাথার্থ্যের সঙ্গে পাঠকমনে পৌঁছে দেয়: এ কথা মনে রেখে বাংলা গদ্যের স্টাইল, তার রূপ ও বিবর্তন লক্ষ্য করি।

বাংলা ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি মূল সত্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

"সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষা শব্দ ত্রিবিধ—তজ্জ, তৎসম, দেশ্য। বঙ্গভাষায় তজ্জ (তদ্ভব) এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প, এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য। এ বিষয়ে ফরাসি

ভাষার সহিত বঙ্গভাষা একজাতীয় ভাষা।...ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসি ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষারও ঠিক একইরূপ সম্বন্ধ।"[১৪]

"বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসি ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত।"[১৫]

বাংলা ভাষা মূলতঃ এক। একটিমাত্র মূল থেকে তার উৎপত্তি। ফলে প্রমথ চৌধুরীর মতে বাংলা ভাষায় প্রাধান্য পেয়েছে এই সব গুণ—সারল্য, ঐক্যসমতা, স্বচ্ছতা (প্রসাদগুণ), সংযম।[১৬]

সুতরাং বাংলা গদ্যের প্রধান শিল্পীদের অম্বিষ্ট হল এইসব গুণ—সারল্য, ঐক্যসমতা, স্বচ্ছতা বা প্রসাদগুণ, সংযম। আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি এইগুলিই সার্থক গদ্য-স্টাইলের প্রধান উপাদান।

ফরাসি গদ্যভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এইসব গুণের কথাই বলেছিলেন:

"খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মালের্ব নামক জনৈক কবি এই ভাষা-সংস্কার-কার্যে ব্রতী হন। তিনি প্যারি নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্যরচনায় আদর্শ-ভাষাস্বরূপে গণ্য করেন। কেননা সে ভাষার ভিতর এমন-একটি ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ এবং ভদ্রতা ছিল, যা কোনো প্রাদেশিক ভাষার অন্তরে ছিল না।"[১৭]

বাংলা গদ্য-স্টাইলের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এইসব গুণ অন্বেষণ করব।

বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের সূচনা হল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশে (১৮৪৩ খৃ)। এর ঠিক এক শ বছর পূর্বে পোর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খৃ) মুদ্রিত হয়। এই তারিখটি বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত বলে ধরা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না। গদ্যের আবেদন যুক্তির কাছে। ধর্মাশ্রিত পুরনো বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যাশ্রয়ী, তার আবেদন আবেগ ও অনুভূতির কাছে। পুরনো বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পয়ার ছন্দ। এই ছন্দ সর্ববিধ ব্যবহারের উপযোগী, নমনীয় ও শোষণ-শক্তিসম্পন্ন। পয়ারের ছাঁদে গঠিত সরল বাক্যের দ্বারা অনায়াসে ভাবপ্রকাশ করা যায়। পয়ারে মানবিক অনুভূতি ও আবেগ যেমন অনায়াসে প্রকাশ করা যায়, তেমনি তত্ত্ব ও যুক্তিমূলক ভাবকেও প্রকাশ করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে দুরূহ বৈষ্ণব দর্শন-তত্ত্বকে নিপুণভাবে

প্রকাশ করা হয়েছে, পদ্যবাহন কোথাও কবির তত্ত্বালোচনায় বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করে নি। তাই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের অপরিহার্যতা অনুভূত হয় নি। সে অনুভূতি, সে প্রয়োজন, সে তাগিদ এলো অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সন্ধিস্থলে—যখন ইংরেজ মারফৎ আধুনিক জগৎ যুক্তি ও বাস্তবচেতনা নিয়ে আমাদের উপর এসে পড়ল ও ভারতবর্ষের সহস্রাব্দের তন্দ্রা ভেঙে দিল।

১৭৪৩-১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ : এই এক শ বছরের আগে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে গদ্যের ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যে লেখা চিঠি ও দলিলের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন—১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মল্লদেবের পত্র। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে লেখা দলিলপত্রের গদ্যভাষায় মুসলমান-শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনায়াস-লক্ষণীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে রচিত সাধন-ঘটিত প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা "কড়চা" অনেক পাওয়া যায়। এগুলির লেখক বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকরা। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে নকল-করা একটি এই ধরনের বৈষ্ণব কড়চা বা নিবন্ধে গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গির স্থূল রূপ লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলা গদ্যের সাধুরূপের নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালে লিখিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটকের গদ্যাংশে। অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যের চর্চা করতেন। ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-নিবন্ধের পুথিগুলি গদ্যচর্চার নিঃসংশয় প্রমাণস্থল।[১৮] সুতরাং একথা অবশ্যস্বীকার্য, শ্রীরামপুরের পাদরি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরা বাংলা গদ্যের প্রবর্তক নন।

চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ-কড়চা লিখেছেন এদেশের লোক। পরবর্তী বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে এখানে। ধর্মচর্চা, রাজ্যশাসন ও বিষয়চর্চা উপলক্ষে ব্যবহৃত এইসব গদ্যনমুনায় (শিবরতন মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ সেনের দুখানি অমূল্য সংকলন-ধৃত নমুনা) প্রাক্‌-উনবিংশ শতকীয় বাংলা গদ্যের রূপটি ফুটে উঠেছে। তৎসম তদ্ভব দেশী শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব কড়চা, শাস্ত্র-নিবন্ধ, রাজাদেশ ও ধর্মালোচনায়। আর আরবী-ফারসী শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় দলিল-দস্তাবেজ-আদালতনির্দেশ ও ওকালতনামায়।[১৯]

এই পর্বের বাংলা গদ্যের আর-এক রূপ পাই পোর্তুগীস-প্রভাবিত

গদ্যরচনায়, অবশ্য তার আদর্শ ছিল বৈষ্ণবদের প্রশ্নোত্তরময় কড়চা-নিবন্ধ। সংস্কৃত সূত্রধর্মী গদ্যের আদর্শে লিখিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় বাংলা গদ্য—যার নিদর্শন শ্রীরূপ গোস্বামীর কারিকা। পরবর্তী বৈষ্ণব কড়চা-নিবন্ধে এই আদর্শ অনুসৃত। এই সূত্রধর্মী গদ্যের প্রধান লক্ষণ ক্রিয়াপদবিরলতা ও সংকোচন, স্বল্পাক্ষরতা ও সংক্ষিপ্ততা। পোর্তুগীস-প্রবর্তিত গদ্যরীতিতে এই সূত্রধর্মী গদ্যরীতির ছাপ আছে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোর্তুগীস পাদরিগণ মধ্য ও পূর্ববঙ্গে ধর্মপ্রচার করেন। তাঁদের গদ্যে মধ্য ও পূর্ববঙ্গের উপভাষার ছাপ অনায়াসলক্ষণীয়। এই গদ্যের নিদর্শন দোম আন্তোনিও দো রোজারিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (রচনাকাল: সপ্তদশ শতক) ও পাদরি মানোএল্-দা আস্সুম্পসাম্ রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খৃ)।[২০]

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর—১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণ আরম্ভ হয়। প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ('এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'), লেখক নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড। তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর অনুরোধে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্য ঢালাই-করা হরফ প্রস্তুত করেন। সেই হরফে হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয় (১৭৭৮)।

দু বছর পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকী তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলকাতায় সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন; আরো চার বছর পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। শুরু হল বাংলা গদ্যের নবযুগ।[২১]

১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ—বাংলা গদ্যের নেপথ্য-পর্ব। এই সময়ে অভিধান, ব্যাকরণ ও শব্দ সংকলন প্রণয়নের দ্বারা বাংলা গদ্যভাষার ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ হয়।

"এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয়জন বৈদেশিক কর্মীর নাম পাইতেছি; ইহাদের কীর্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত; আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা

বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয়জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।........

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয়জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।"[২২]

এই ছয়জনের নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ থেকেই এঁদের কীর্তির আভাস পাই —(১) নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, 'এ গ্রামার অফ্ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ১৭৭৮, (২) জোনাথান ডানকান, 'রেগুলেশনস ফর দি অ্যাডমিনিসট্রেশন্ অফ্ জাস্টিস ইন দি কোর্টস্ অফ্ দেওয়ানী আদালত' বা 'ইম্পেকোড'-এর বঙ্গানুবাদ, ১৭৮৫, (৩) এন. বি. এডমনস্টোন, 'বেঙ্গল ট্রানস্লেশন অফ্ রেগুলেশনস ফর দি অ্যাডমিনিসট্রেশন অফ্ জাস্টিস ইন দি ফৌজদারি অর ক্রিমিনাল কোর্ট,' ১৭৯১; 'বেঙ্গল ট্রানস্লেশন অফ্ রেগুলেশনস্ ফর দি গাইডান্স অফ্ দি ম্যাজিস্ট্রেটস্', ১৭৯২; (৪) হেনরি পিট্‌স্ ফরষ্টার, 'গভর্নর বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন', ১৭৯৩; 'এ ভোকেবুলারি ইন টু পার্টস্, ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী, অ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা' ১৭৯৯; (৫) এ. আপজন্, 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি', ১৭৯৩; (৬) জন্ মিলার, 'দি টিউটর' বা 'শিক্ষা গুরু', ১৭৯৭।[২৩]

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলা গদ্যভাষার যে ভিত্তিভূমি এইভাবে স্থাপিত হল, উনবিংশ শতকের সূচনায় সেই ভিত্তির উপর বাংলা গদ্যের ভবননির্মাণকার্য শুরু হল। বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্য প্রবর্তনের ইতিহাসকে প্রমথ চৌধুরী সূত্রকারে লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে—"ইংরেজরা ভারতে আসিল, rhyme অর্থাৎ, অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কাব্যের চর্চার স্থান reason অর্থাৎ, বিচার-মূলক চিন্তা দখল করিল এবং বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হইল।"

১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে দুইটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল: শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন (১০ জানুঅরি, ১৮০০) ও সেই সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; আর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (৪ মে, ১৮০০)। উনবিংশ শতকের প্রথম চার

দশকে যে-সব দেশী-বিদেশী পণ্ডিতের অক্লান্ত সাধনায় বাংলা গদ্যের ভবন নির্মিত হল, তাঁরা ছিলেন স্থপতি। পঞ্চম দশকে দেখা দিলেন 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ (১৮৪৩) ও বাংলা গদ্যের প্রথম স্টাইলিস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এই দশককে স্মরণীয় করে তুলল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে রোমান লিপিতে পোতুর্গীস বানান অনুসারে লিখিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' প্রকাশের এক শতাব্দী পরে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপটি বিদ্যাসাগরের হাতে ধরা দিল।

গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নানা কারণে স্মরণযোগ্য। তাঁরই চেষ্টায় হালহেড 'জেণ্টু কোড' (সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি) রচনা করেন। তাঁরই উৎসাহে সার্ চার্লস উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়ে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান (১৭৭৮) এবং মহাভারত ও হিতোপদেশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি রূপে খৃষ্টধর্ম প্রচারে ও সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন রামরাম বসু।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের বাংলাভাষা-বিভাগের কাহিনী বাংলা গদ্যচর্চার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিলাত থেকে আগত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত, বাংলা, ব্রজভাষা, হিন্দুস্থানী অর্থাৎ, হিন্দী ও উর্দু) এবং আরবী ও ফার্সী শেখবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় বাংলা, হিন্দী ও উর্দুতে গদ্যসাহিত্য রচনার সার্থক প্রয়াস দেখা দেয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের সূচনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী-সম্পাদিত বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির নজর উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর নির্দেশে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন (১ মে, ১৮০১)। তাঁর সহকর্মী-রূপে নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (প্রধান পণ্ডিত), রামনাথ বাচস্পতি (দ্বিতীয় পণ্ডিত) এবং শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু (সহকারী পণ্ডিতগণ)।

কেরীর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বাংলা গদ্যচর্চার পথকে সুগম করেছিল। ১৮০১ খৃ, ১৮০৫ খৃ, ১৮১৫ খৃ, ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয়, কেরীর মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হয়।[২৪]

কেরীর ব্যাকরণ এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণ পরিচয়। ২। যুক্তবর্ণ। ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য)। ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ)। ৫। সর্বনাম। ৬। ক্রিয়াপদ। ৭। শব্দ গঠন। ৮। সমাস। ৯। অব্যয় ও উপসর্গ। ১০। সন্ধি প্রকরণ। ১১। অন্বয় (সিন্‌ট্যাক্স)।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ক্রান্তিকারী পুস্তক, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কথোপকথন' বা 'ডায়ালোগ্‌স' (১৮০১) বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের আধার। কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় এই কথোপকথন লিখিত। ঐ ভাষাই পরবর্তীকালে সাহিত্যিক চলতি বাংলা গদ্যের আদর্শরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের নানা স্তরের নরনারীর মুখের বুলির মাধ্যমে সমাজজীবনের ছবি এখানে পাই। জেলেনীর কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের কথা, ঘাটের কথা, 'মাইয়া কন্দল', রায়তের কথা, মজুরের কথা—সবকিছুই এখানে আছে। এইসব কথাবার্তা "এমনই সহজ ও বাস্তব ভঙ্গিতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্তী কালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া যায়।"[২৫] কেরী কেবল "খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা" লেখেন নি, কথ্য বাংলা গদ্যকেও নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন, তার প্রমাণ 'কথোপকথন'।

কেরীর গদ্যরচনা আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-কালের প্রথম মাইল-স্টোন। ব্যাকরণ অভিধান প্রণয়ন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও হিন্দু জনসাধারণের নিকট খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার—এই তিন ঘটনার যোগাযোগে কেরী যে বাংলা গদ্য লিখলেন, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য—পূর্ববর্তী আরবী-ফারসীর প্রভাবমুক্তি (দলিল-দস্তাবেজের ভাষারীতি থেকে মুক্তি) ও সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ।[২৬] তার ফলে বাংলা গদ্যে ক্রমশ এলো গঠন-সৌষ্ঠব ও তৎসম শব্দ-নির্ভরতা। এ ছাড়া কেরীর যে প্রধান উদ্দেশ্য, তরুণ সিবিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দান, সেজন্যে দুটি বই তিনি লেখেন—'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। কেরীর উদ্দেশ্য ছিল

বিবিধ—তরুণ সিবিলিয়ানদের কথ্যভাষায় শিক্ষাদান, সেইসঙ্গে শাসিত ভারতীয়দের সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিফহাল করে শাসন-কর্তব্য পালনে উপযোগী অভিজ্ঞতাদান।

শ্রীরামপুরে কেরী ও তাঁর সহকারীবৃন্দ (টমাস, মার্শম্যান, ওয়ার্ড) বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এইসব অনুবাদ ইংরেজি বাক্‌রীতির অন্ধ অনুসরণমাত্র, প্রকাশভঙ্গি আড়ষ্ট, সে-কারণে বাংলা সাহিত্যে এদের প্রভাব নগণ্য। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরী ইংরেজি বাক্‌রীতি ছেড়ে সংস্কৃত গদ্যের আদর্শকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনসি, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায়) সংস্কৃত গদ্যরীতিতে বাংলা গদ্যের চর্চা করলেন। এদের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনাতেই গদ্য ব্যবহারে স্বচ্ছন্দতা, কুশলতা ও নব পরীক্ষার সাহসিকতা দেখা যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর লেখকদের সামনে গদ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। এঁদের গদ্যচর্চায় কোনো আন্তরিক প্রেরণা ছিল না, চাকুরীজীবনে কেরী সাহেবের নির্দেশ ছিল একমাত্র সম্বল। আরবি-ফারসি-উর্দু-সংস্কৃতের উপর কম-বেশি অধিকার নিয়ে তাঁরা গদ্যচর্চায় অবতীর্ণ হন। "নিজ নিজ অঞ্চলের প্রচলিত সংলাপ-রীতি বা তাঁহাদের কর্মজীবনে অর্জিত বিশেষ মানস-রুচি ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়াই তাঁহাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনভ্যস্ত ভাষায় নূতন বিষয়ের যে প্রকাশ-দুরূহতা, অনির্দিষ্ট ছাঁচে অবাধ্য ভাবকে ঢালাই করার যে গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা তাহাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পর্যায়েই ফেলা যায়। এই দুঃসাধ্য কাজে যাঁহারা অনুবাদের বিশেষতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের যষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের পদক্ষেপ অনেকটা সুষম হইয়াছে। যাঁহারা উর্দু, হিন্দী বা ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা নির্ভরযোগ্য আদর্শের অভাবে প্রায়ই হোঁচট খাইয়াছেন।...... .

এই যুগে সুষ্ঠ গদ্যরচনার প্রধান বাধা ছিল—(১) শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, (২) দূরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বোধে অনিশ্চয়তা, ও (৩) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে সুমিতিহীনতা।"[২৭]

এই বাধাগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় কিছু-না-কিছু ছিলই। এই সব বাধা সবলে অপসারিত করে সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টি করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাই তিনিই বাংলা গদ্যের প্রথম স্টাইলিস্ট।

কেরির বাংলা গদ্যরচনা থেকেই এইসব বাধা ও ক্রটির পরিচয় পাওয়া যায়।[২৮]

(ক) সে কালে য়িহোদা দেশের উজাড়ে য়োহান ডুবা আইল ঢেড়ি দিতে ২ এবং বলিতে ২ খেদ কর একারণ স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য। এই সে জন যাহার বিষয় বিভাষিত ছিল যিশঊহ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া একজনের রব চেঁচাইতে ২ উজাড়ে প্রস্তুত করহ ঈশ্বরের পথ সোজা কর তাহার পথকে। এবং সে যোহনের ছিল উঠের লোমের পরিচ্ছদ ও চর্ম্মের পটুকা কমরে তাহার ভক্ষ ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন মধু। [ধর্ম্মপুস্তক। ১৮০১। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ। শ্রীরামপুর মিশন।][২৯]

(খ) আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমার মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

[কথোপকথন। ১৮০১

(গ) কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিম্মিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন। নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেক আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে।

[ইতিহাসমালা। ১৮১২

প্রাক-রামমোহন পর্বের বাংলা গদ্যের যে সব ত্রুটির উল্লেখ করেছি, তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় বারবার দেখা গিয়েছে। প্রত্যেকের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সার্থকতা নেই এই কারণে যে নিজস্ব স্টাইল তখনো দেখা দেয় নি। এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে।

রামমোহন রায়ের কাল বাংলা ভাষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই সময়ে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। বাঙালি জীবনে আধুনিকতার প্রবর্তনে সংবাদ-পত্রের দান অবশ্যস্বীকার্য। এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ ফল সংবাদপত্র। সংবাদপত্র গদ্যভাষাকে যে ধাবৎশক্তি ও লঘুতা দিতে পারে, তা দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতি-শেষে লিখিত গ্রন্থ দিতে পারে না। ঘড়ির উপর চোখ রেখে, মাস বা সপ্তাহ-শেষে সাময়িকপত্র প্রকাশের তারিখটি লক্ষ্য করে' দ্রুত লেখনী চালনা করতে হয় বলে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের লেখককে লঘুরীতি অবলম্বন কবতে হয়। সংবাদপত্রের প্রসারেব অর্থ সমকালের ঘটনা ও বিষয়ের প্রতি পাঠকের সদ্য-জাগ্রত কৌতূহলের নিবৃত্তিসাধন এবং জীবনের বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে পাঠকের মনোরঞ্জন সাধন। ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে যে-সব সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) শ্রীরামপুর মিশন-প্রবর্তিত 'সমাচার দর্পণ' (২৩ মে, ১৮১৮), (২-৩) রামমোহন রায়-প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), ও 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১), (৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২), (৫) ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রবর্তিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮ জানুঅরি ১৮৩১)।

এইসব সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনা করে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সাংবাদিকতা ক্রমশঃ সাহিত্য-পদবিতে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের গুরুত্ব তিনটি কারণে (১) গদ্যরীতির সরলীকরণ ও উন্নয়নে, (২) ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক, আক্রমণ ও জবাবের অবতারণা করে গদ্যভাষাকে তর্কভাষার উপযোগিতা দানে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার দ্বারা গদ্য-ভাষার ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষায়, (৩) সমাজের উৎকেন্দ্রিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কণের দ্বারা গদ্যভাষাকে ধাবৎশক্তি ও লঘুগতি দানে।[৩০]

এই পর্বের প্রধান লেখক দুজন—রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বই প্রাক-তত্ত্ববোধিনী পর্ব। এর পরই বাংলা গদ্যে যথার্থ স্টাইলের আবির্ভাব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-পর্ব বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-পর্ব, আর সাময়িক-পত্রের পর্ব সৃষ্টিচেতনা ও কৌশলের পর্ব। প্রথম পর্বের বিস্তৃতি ১৮০০ থেকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় পর্বের বিস্তৃতি ১৮১৮ থেকে ১৮৪৩ (তত্ত্ববোধিনী-র প্রকাশ) অথবা সামান্য বাড়িয়ে নিয়ে বলা যায় ১৮৪৭ (বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি-র প্রকাশ) খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম পর্বে বাংলা গদ্যে প্রয়োজন-ধর্মেরই প্রাধান্য, দ্বিতীয় পর্বে এই প্রয়োজন-ধর্মের সঙ্গে শিল্পধর্মের মিশ্রণ।

রামমোহন ও ভবানীচরণের লেখায় কী ভাবে প্রয়োজন-ধর্মের সঙ্গে শিল্প-ধর্মের মিশ্রণ ঘটছে, তা পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এই সময় বাংলা গদ্যে শিল্পধর্ম ও সৃষ্টিচেতনা প্রধান নয়, প্রয়োজন-ধর্ম ও সৃষ্টির কৌশলই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সাময়িক পত্রের পর্ব সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য।

"একদিকে যেমন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) প্রমুখ মনীষী ও লেখকগণ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, অন্যদিকে তেমনি উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) প্রমুখ খ্রীষ্টান মিশনরীগণও মৌলিক ও অনুবাদ রচনার মাধ্যমে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির ভার ধর্মপ্রচারের তাগিদেই গ্রহণ করিলেন। কেরি সাহেবের উদ্যোগে ১৮১৮ সালে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হইল। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যেও এবিষয়ে সার্থক চেষ্টা আরম্ভ হইল। দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাল রাখিয়া সরল ও সহজবোধ্য বাঙ্গালা গদ্য গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সংবাদপত্র একটি মুখ্য সাধন হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে ইংরাজী হইতে যেমন, তেমনি অন্যদিকে সংস্কৃত হইতেও অনুবাদের পথ ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের প্রসার ও শক্তি উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪০ সালের পূর্বেই এই সমবেত চেষ্টার ফলে বাঙ্গালায় একটি কার্যকরী ও শক্তিশালী গদ্যশৈলী স্থাপিত হইয়া গেল।"[৩১]

রামমোহন ও ভবানীচরণের সঙ্গে তৃতীয় যে সংবাদপত্র-সম্পাদক-লেখকের নাম অবশ্যউচ্চার্য, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তাঁর

'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকায় যে ভাষার চর্চা হয়েছিল, তা সাংবাদিকের ভাষা। গদ্যের জড়তামুক্তি ও সাংবাদিকসুলভ হাল্কা চালের বাক্য গঠনে ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এই ভাষাকে বলা যায় আটপৌরে ভাষা,—কেরীর 'কথোপকথনে' ও ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে' যার পত্তন, এখানে তারই প্রতিষ্ঠা।

সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র যুগের বাংলা গদ্যচর্চার ফলশ্রুতি কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে গদ্যের ইতিহাসকারের কথার প্রতিধ্বনি করে বলি,—

"বাংলা গদ্য সংসারের নিত্য চলাচলের স্রোতে এসে পড়ছে। এতকাল যা মন্থর ভাবে চলছিল, কয়েকজন বলবান মাল্লার গুণের টানে বা সরকারী সাহায্যের পালের বাতাসে, এবারে তা হাজার বৈঠার ক্ষিপ্র তাড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৈঠাওয়ালাদের প্রধান ঈশ্বর গুপ্ত, আর হালে অবশ্যই আছেন মনীষী রামমোহন। গদ্যসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন বলেছি। এইসব মাঝি মাল্লাদের সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লীর বাদশার খেতাবপ্রাপ্তি সত্ত্বেও রামমোহন মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছু নন। বহুজন কর্তৃক বহুতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষায় এসেছে নমনীয়তা, তাতে ঢুকেছে নূতন শব্দ সম্ভার তাদের ইঙ্গিত ও স্মৃতির পরিমণ্ডল নিয়ে; বেশ বুঝতে পারা যায় যে অনেকগুলো কলমের প্রচেষ্টায়, তাদের মধ্যে আনাড়ির কলমের সংখ্যাও অল্প নয়, ভাষার কর্দম উত্তমরূপে মথিত হয়েছে, এবারে মূর্তি গড়ে তুললেই হয়, এলেই হয় শিল্পী। এলেন 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' বিদ্যাসাগর।"[৩২]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের ইংরেজী গদ্য সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যে আলোচনা করেছি, এইবার তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐ সময় যাঁরা নব্য ইংরেজি গদ্য গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গদ্যকে সর্বকার্যে নিয়োগ, সর্বজন ব্যবহারযোগ্যতা দান, নমনীয়তা দান ও শব্দসম্ভারের প্রাচুর্য—ঐ সময়ের ইংরেজি গদ্যের প্রধান লক্ষণ। এই পর্বের বাংলা গদ্য সম্পর্কে একই কথা বলা যায়।

এখানেই বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্বের অবসান ও তৃতীয় পর্বের সূচনা। তৃতীয় পর্বের প্রধান পুরুষ বিদ্যাসাগর, তাই এই যুগকে বলা যায় বিদ্যাসাগরের যুগ। ১৭৪৩ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে শতাব্দীকাল, 'কৃপার শাস্ত্রের

অর্থভেদ' থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পর্যন্ত যে অধ্যায়, এবার তার সুফল দেখা গেল। শুরু হল বাংলা গদ্যে স্টাইলের চর্চা। এখন স্টাইল থেকে লেখক-ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ সম্ভব ও সহজতর হল।

তৃতীয় পর্বের বাংলা গদ্যে প্রয়োজন-ধর্মের উপর শিল্পধর্মেরই প্রাধান্য, সৃষ্টি-শক্তির পূর্ণ জাগরণ। স্টাইল বলতে এই শিল্পধর্মকেই বুঝি। গদ্য-রচনায় লেখকের ব্যক্তিধর্মের স্পর্শেই গড়ে উঠেছে লেখকের স্টাইল। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) এই শিল্পধর্ম-চর্চার প্রধান আধার। তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর লেখকরাই এই পর্বের প্রধান গদ্যলেখক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক। বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় এই পর্বে যাঁরা বাংলা গদ্যের চর্চা করেন, তাঁরা হলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারাশংকর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি বসাক। প্রথম জন বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক, বাকি সকলে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও স্নেহভাজন। এঁদের অনেকের লেখাই বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন। বস্তুত বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যিক গদ্যরূপকে চিরকালের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন।

বিদ্যাসাগরের যুগের অবসানের পূর্বেই কেরীর কথোপকথন (১৮০১), ভবানীচরণের নববাবুবিলাস (১৮২৩), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত (১৮৩১-৪০) দৈনন্দিন ঘটনা-বিবরণীর লঘু গদ্যরীতির ধারায় দেখা দিলেন হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স ('ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', ১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্র ('আলালের ঘরের দুলাল', ১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচার নকশা, ১৮৬২)।

পণ্ডিতী-রীতি ও বিষয়ী রীতি, কথ্যরীতি ও সংস্কৃত গদ্যরীতির মধ্যে মিলন ও বিরোধ, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর-পর্বের অবসান হ'ল, দেখা দিল গদ্যভাষায় মধ্যগা রীতি। এই রীতির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যাসাগর। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি গদ্যে অ্যাডিসন যেরূপ মধ্যগা রীতির আবিষ্কারক, উনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর সেরূপ মধ্যগারীতির আবিষ্কারক ও প্রবর্তক। এখানেই তৃতীয় পর্বের

অবসান ও চতুর্থ পর্বের সূচনা। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত অ্যাডিসনের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি প্রসঙ্গে অবশ্যস্মর্তব্য।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বারবার স্মরণযোগ্য : "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী"।

বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি-ভিত্তিভূমির উপর গড়ে উঠলো বঙ্কিমী গদ্যরীতি। এখানেই বাংলা গদ্যে চতুর্থ পর্বের সূচনা। বঙ্কিমী গদ্যরীতির প্রথম লক্ষ্য— গদ্যের ভারসাম্য অর্জন, শেষ লক্ষ্য সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জন। দুয়ে মিলে ভাষারীতির পূর্ণতা।

চতুর্থ পর্বে বাংলা গদ্যে সৃষ্টিশক্তির পূর্ণাঙ্গ পরিণতি, শিল্পধর্মেরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলের নিজস্বতা দেখা গেল বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে (১৮৭২)। তার পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগরী রীতির অনুসারী। সেদিন থেকে মৃত্যুদিন (১৮৯৪) পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা গদ্যের অধীশ্বর। শব্দ, ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অলংকার ও অনুচ্ছেদ ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্বতা তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনায় (১৮৬৫-৯৪) পূর্ণরূপে প্রকাশিত। সবটা মিলিয়ে বঙ্কিমের স্টাইল, তা আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্বের ভাষারূপ।

পোপ্ থেকে স্কট পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের যে পর্ব (১৭৪৫-১৮৩২), সেটিকে ইংরেজি গদ্যের পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্বটি জ্ঞান, যুক্তি, তর্ক ও বিচারের পর্ব। গদ্য এর যোগ্য বাহন। ইংরেজি গদ্য এই পর্বেই সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, শক্তিশালী ও গুরুভারবহনক্ষম হয়ে ওঠে। এই পর্বে লণ্ডন ও এডিনবরাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি সংবাদপত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটে; হ্যানোভার বংশীয়দের রাজত্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; যানবাহন ও ডাকব্যবস্থার উন্নতি ঘটে; সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ সংবাদপত্র ও গ্রন্থের লোভী পাঠকে পরিণত হয়; সর্বোপরি ফরাসি বিপ্লব মারফৎ ফরাসি চিন্তাধারার সঙ্গে ইংরেজ জনসাধারণ পরিচিত হয় এবং জর্মান সাহিত্য ও ধর্মান্দোলনের মারফৎ জর্মান চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করে। এইসবের সম্মিলিত যোগফল ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিকাশ। ইংরেজি গদ্যের মহারথীরা এই পর্বে দেখা দেন : সুইফ্‌ট, ডিফো, অ্যাডিসন, বার্কলে, ষ্টীল, জনসন, হিউম, গীবন, অ্যাডাম স্মিথ, বার্ক, টমাস পেইন, কোল্‌রিজ, ওঅর্ডসওঅর্থ, ডী কুইন্সি, ল্যাণ্ডর, ল্যাম, জেরেমি বেন্থাম, সাদে, মূর, ক্রস, লকহার্ট, হ্যালাম, মিটফোর্ড। সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ, ধর্মতত্ত্বালোচনায় গদ্যরথীরা সর্বশক্তি

নিয়োগ করলেন। একটি নোতুন জগৎ—জ্ঞানের বুদ্ধির যুক্তির জগৎ—প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর স্কটের হাতে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে—ইংরেজি গদ্য পূর্ণতা লাভ করল। ট্যাটলার, স্পেকটেটর, গার্ডিয়ান, মর্নিং ক্রনিক্ল, টাইমস্, মর্নিং পোস্ট, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টার্লি, ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন প্রভৃতি সাময়িকপত্রের পাতায় যুক্তি ও তর্কের, সংশয় ও জ্ঞানান্বেষণের, বিচার ও বিশ্লেষণের পরিচয় মুদ্রিত হল। ফলে ইংরেজি গদ্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, তা শুরু চিন্তাভার বহনে সক্ষম ও সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি প্রকাশে সমর্থ হয়ে উঠল।

ইংরেজি সাহিত্যের যে পর্বটি এখানে উল্লেখ করলাম, তার প্রতিচ্ছবি দেখা গেল শতাব্দীকাল পরে বাংলা সাহিত্যে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে এই গদ্যের যুগ দেখা গেল। সে যুগের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন ইংরেজি গদ্যের নায়ক ডক্টর জনসন। বঙ্গদর্শন-বান্ধব-সাধারণী-নবজীবন-প্রচার-ভারতীর পাতায় যে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল, তার আদর্শ—যুক্তি ও বুদ্ধি, মনন ও বিশ্লেষণ, তর্ক ও বিচার।

বঙ্কিমী গদ্যরীতির অনুগামী লেখকদের তালিকা দীর্ঘ। এতে আছেন—রমেশচন্দ্র দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মীর মশারফ হোসেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ-চন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।[৩৩]

বঙ্কিমী যুগে যে-সব লেখক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি, তাঁদের মধ্যে আছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। কালী-প্রসন্ন সিংহের হাত থেকে কথ্যরীতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্র-নাথ, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, যোগেশচন্দ্র। সে ধারাকে একাল পর্যন্ত বহন করে এনেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যসংলাপে) ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩৩]

বাংলা গদ্যের পঞ্চম পর্ব রবীন্দ্রনাথের পর্ব। বঙ্কিমের মৃত্যু (১৮৯৪) থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১) পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দ কাল এর বিস্তার। বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যে দুটি ভিন্ন গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন,

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একই রীতি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য মহাকবির গদ্য। রবীন্দ্র-গল্প-উপন্যাসের আর রবীন্দ্র-প্রবন্ধের গদ্য—দুই-ই অননুকরণীয়।

রবীন্দ্র-গদ্যরীতির প্রথম পর্ব জ্ঞানাঙ্কুর-ভারতীর যুগ (১৮৭৬-৮৩), দ্বিতীয় পর্ব হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসীর যুগ (১৮৮৪-১৯১৩), তৃতীয় পর্ব সবুজপত্রের যুগ (১৯১৪-১৯৪১)।

বাংলা গদ্যের পঞ্চম পর্ব রবীন্দ্রনাথের পর্ব। এই পর্বের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি পূর্বেকার কোনো পর্বে দেখা যায় নি। সাধু ও চলিত বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই ধরা দিয়েছে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনায় রবীন্দ্র-গদ্যের রোমান্টিক রীতির ঐশ্বর্য অনুধাবন করা যাবে।

রবীন্দ্র-পর্বে বাংলা গদ্যের বিচিত্র রূপ দেখা গিয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রত্যেকেই অসাধারণ গদ্যশিল্পী, আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। এই পর্বে বিনয়কুমার সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত গুপ্ত বাংলা গদ্যকে দিয়েছেন দীপ্তি ও সংহতি, আবার কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু দিয়েছেন স্ফূর্তি ও সরলতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন কাঠিন্য ও শিল্পসংযম।

আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প উপন্যাসের অনুভূতিপ্রধান গদ্যে দিয়েছেন নবতর ঐশ্বর্য। জীবিত লেখকদের মধ্যে যাঁরা গদ্যশিল্পী তাঁদের সৃষ্টিকর্ম আজো অব্যাহত বলে তাঁদের নামোল্লেখে বিরত রইলাম।

বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতির বিবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা জীবন ভেবেছিলেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে—অর্ধ-শতাব্দীকাল তিনি নানা প্রবন্ধে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন; 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯) ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) নামক দুটি গ্রন্থে ও অন্যত্র তা সংকলিত হয়েছে।

বাংলা গদ্যের স্টাইলের ধারাবাহিক চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এইসব লেখা থেকে পাই। এই চিত্রটি রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে দেখে নিলে আমরা লাভবান হবো বলে আমার ধারণা।

বাংলা গদ্যের একেবারে গোড়াকার নিদর্শন রূপে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগে রচিত রূপ গোস্বামীর কারিকা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,

"বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে

হচ্ছে ক্রিয়াব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্যডিমভাঙা পাখির বাচ্ছার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। ······ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাষার এরকম লাফ দিয়ে চলা সম্ভব হত না। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে।"[৩৪]

স্পষ্টতই বোঝা যায় এখানে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যের সূত্ররীতির উল্লেখ করেছেন। পূর্বেই বলেছি এই রীতির প্রধান লক্ষণ ক্রিয়াপদের বিরলতা ও সংকোচন, সংক্ষিপ্ততা, স্বল্পাক্ষরতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কড়চা-নিবন্ধে এর অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। পোতু´গীস্ বাংলা গদ্যও এর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃত গদ্যের অপর রীতির—দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী রীতির—উপর নির্ভর করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। বাংলা গদ্যে কথ্য রীতির বিলম্বিত আবির্ভাবকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন,

"একবার যেমনি একে (কথ্য রীতিকে) আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তার কারণ এটা জবরদখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।"[৩৫]

বাংলা গদ্যভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব স্থল সংস্কৃত ভাষা, একথা যতটা সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য, তা প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। বাংলা ভাষার সংস্কৃত আভিজাত্য অপেক্ষা প্রাকৃত রূপকেই রবীন্দ্রনাথ বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। তাই তৎসম শব্দের প্রাচুর্য অপেক্ষা ইসলাম ও খৃষ্টান জগতের এবং প্রাকৃত সমাজের শব্দ ঋণের কথা তিনি ভুলতে চান নি। বাংলা সাহিত্যিক গদ্য ইংরেজি গদ্যের কাঠামোয় নির্মিত, একথা ঠিক, কিন্তু প্রাকৃত বাক্‌রীতিও উপেক্ষণীয় নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তার চেহারা বলে

একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষায় কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাই বলে অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়ে মরে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রেখেছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক পরে সে ভদ্রসাহিত্যসভায় মোড়লি করে বেড়াতে পারে না।"[৩৬]

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবিওয়ালা ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এই প্রাকৃত অসাধু ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গচিত্রে এই ভাষার ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়।

বিদ্যাসাগরের ভাষাসৃষ্টিকার্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রকৃতিগত অভিরুচির উপর জোর দিয়েছিলেন। বাংলা গদ্য নির্মাণে সংস্কৃত গদ্যরীতির (দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী রীতির) সার্থকতা তিনি স্বীকার করেছিলেন, সেইসঙ্গে তার আধুনিক ব্যবহার বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতিতে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি নিজেও 'প্রাচীন সাহিত্যে' একে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ, দুজনেই এই সংস্কৃত গদ্যরীতিকে ইংরেজি গদ্যরীতির আদর্শে ব্যবহার করেছিলেন, বাণভট্টের কাদম্বরীর পল্লবিত রীতিকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

এই দুটি সিদ্ধান্তের সমর্থন রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পাই। প্রথমে সংস্কৃত গদ্যের ধ্বনিরোল-বিস্তার ও-গাম্ভীর্য এবং স্বরবৈচিত্র্যের স্বীকৃতি, তারপর তার আধুনিক ব্যবহারের আবশ্যকতা-প্রতিষ্ঠা।

"সংস্কৃত ভাষায় এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের কন্‌সার্ট বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না।"[৩৭]

"ভাষার অন্তরে একটি প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর

শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি।"৩৮

বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহু-উচ্চারিত উক্তিটি এখানে স্মরণ করি—এই উক্তিতে সংস্কৃত গদ্যে আধুনিক ছন্দঃস্পন্দের আবিষ্কারকেই গৌরবদান করা হয়েছে—বিদ্যাসাগরের স্টাইলের উপকরণ পুরনো (সংস্কৃত গদ্যের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও স্বরবৈচিত্র্য), কিন্তু তার নির্মাণ হয়েছে আধুনিক পথে (ইংরেজি গদ্যরীতির পথে)—এই সত্য এখানে ব্যক্ত :

"গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নিবাচন করিয়া বিদ্যাসাগব বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"৩৯

বিদ্যাসাগরের পর বাংলা গদ্য স্টাইলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যাঁর হাতে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইল-চিন্তার পরিচয় প্রথম ও বর্তমান অধ্যায়ে আগেই দিয়েছি। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলের স্বকীয়তা দেখা গেল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যরীতি ও প্রবন্ধরীতির স্বীকৃতি লক্ষ্য করি বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলে ও প্রবন্ধে। বঙ্কিমের গদ্যরীতি ক্লাসিক আর রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি রোমান্টিক —একথা বললে ভুল হবে না। প্রবন্ধ-গদ্যে যুক্তিধর্মিতা ব্যবহারিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চা বঙ্কিম করেছিলেন, আর কথা-গদ্যে চর্চা করেন বিবরণাত্মক বস্তুনিষ্ঠতার। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও রসসাহিত্যে ব্যক্তিকতার চর্চাই প্রথম ও শেষ কথা, তাই তা রোমান্টিক অনুভূতিপ্রধান গদ্য। বঙ্কিমের আদর্শ অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্য, আর রবীন্দ্রনাথের আদর্শ—? তা মহাকবির গদ্য, তা অননুকরণীয় ও দ্বিতীয়রহিত।

এইসব সত্য স্মরণে রেখেই বঙ্কিমের স্টাইল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমাদের গ্রহণ করতে হয়—

"নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্যবহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি

জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিলে চলে।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যরীতির আবহাওয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়সেই তাঁর গদ্যরীতি ও প্রবন্ধরীতিতে স্বকীয়তা দেখা গেল। ব্যবহারিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার পথ ছেড়ে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির পথে গেলেন, বিষয়প্রাধান্য অগ্রাহ্য করে বিষয়ীপ্রাধান্যের দিকে ঝুঁকলেন, আত্ম-নিরপেক্ষতা ছেড়ে আত্মভাবনাকে আশ্রয় করলেন। তার ফলে কৈশোরের শেষ ধাপ পেরোবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী গদ্যরীতি ছেড়ে আপন গদ্যরীতির আবিষ্কারে আগ্রহী হলেন। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর বাংলা গদ্য-স্টাইল রবীন্দ্র-স্টাইলের পটভূমি থেকে পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি আহরণ করেছে।

পরবর্তী অধ্যায় থেকে বাংলা গদ্যের বিচিত্র রূপ ও স্টাইলের বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করব।

উল্লেখপঞ্জী

১ 'A History of Western Literature', Chap. VII, J. M. Cohen.

২ বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য ও দার্শনিক বিজ্ঞতা সম্পর্কে মঁতেনের দুটি সহাস্য উক্তি এখানে পর পর উদ্ধার করছি :

'Le suis des plus exempts de cette passion, et ne l'ayme ny l'estime ; quoy que le monde ayt entreprins, comme a prix faict, de l'honnorer de faveur particuliere : ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience ; sot el vilain ornement !' [Quoted by F. L. Lucas in 'Style', pp. 139.]

'On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants, et d'un visage renfrogne', sourcilleux et terrible : qui me l'a masquee de ce fauls visage, pasle et hideux? Il n'est rien plus gay, plus gaillard, plus enioue, et a peu que ie ne die folastre.' [Do.]

৩ লা রোশফুকোর একটি সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র ম্যাক্সিম্—

La veritable eloquence consiste a dire tout ce qu'il faut et a ne dire que ce qu'il faut. (Do, pp 99).

অন্য একটি ম্যাক্সিমের ইংরেজি অনুবাদ : Hypocrisy is the homage which vice pays to virtue.'

৪ "Je reverrai toute ma vie ce long corridor frais et calme, la muraille peinte en rose, le jardinet qui tremblait au fond a travers un store de couleur claire, et sur tous les panneaux des fleurs et des violons fanes.

Il me semblait que j'arrivais chez quelque vieux bailli du temps de Sedaine...

Au bout du couloir, sur la gauche, par une porte entr'ouverte on entendait le tic tac d'une grosse horloge et une voix d'enfant, mais d'enfant a l'ecole, qui lisait en s'arretant a chaque syllabe :

A...LORS...SAINT...I...RE...NEE...S'E...CRI...A ...JE...SUIS...LE...FRO...MENT....DU...SEIGNEUR ...IL ..FAUT...QUE...JE...SOIS ..MOU... LU... PAR ...LA...DENT...DE...CES...A...NI...MAUX...

Je m'approchai doucement de cette porte et je regardai...

Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un bon vieux a pommettes roses, ride jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. A ses pieds, une fillette habillee de bleu—grande pelerine et petit beguin, le costume des orphelines—lisait la Vie de saint Irenee dans un livre plus plus gros qu'elle...

Cette lecture miraculeuse avait opere sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les

mouches au plafond, les canaris dans leur cage, la-bas sur la fenetre. La grosse horloge ronflait, tic tac, tic tac.

Il n'y avait d'eveille dans toute la chambre qu'une grande bande de lumiere qui tombait droite et blanche entre les volets clos, pleine d'etincelles vivantes et de valses microscopiques...

Au milieu de l'assoupissement general, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave : AUS...SI...TOT ...DEUX...LIONS...SE...PRE....CI...PI...TE... RENT ...SUR...LUI...ET...LE...DE...VO...RE....RENT...

C'est a ce moment que j'entrai..."

বাংলা অনুবাদ 'দেশ' বর্ষ, ৩৩, সংখ্যা ১৯, 'বড়োবাবু' গ্রন্থে সংকলিত।

৫ "All were desired to have a careful regard for the English language by developing 'a close, naked, natural way of speaking ; positive expressions, clear senses, a native easiness."—A. C. Ward, 'Twentieth Century Prose', pp xi.

৬ "To write and speak correctly gives a Grace, and gains a favourable attention to what one has to say ; and, since it is English that an English Gentleman will have constant use of, that is the Language he should chiefly cultivate, and wherein most care should be taken to polish and perfect his Style. To speak or write better Latin than English may make a man be talked of ; but he would find it more to his purpose to express himself well in his own tongue, that he uses every moment, than to have the vain commendation of others for a very insignificant quality."—Locke, 'On Education' (1693).

৭ 'Never again has the English idiom been expressed in such purity and strength.'—Herbert Read, 'English Prose Style.'

৮ 'It helped to preserve the purity, and determine the sense of our English idiom.'

৯ 'The prose style of Swift is unique, an irrefrangible instrument of clear, animated, animating and effective thought. English prose has perhaps attained here and there a nobler profundity, and here and there a subtler complexity, but never has it maintained such a constant level of inspired expression.'—Herbert Read, 'English Prose Style', Introduction, pp. xiii.

১০ 'Addison's prose is the model of middle style; ..pure without scrupulosity, and exact without apparent elaboration; always equable, and always easy, without glowing words or pointed sentences.'—Dr. Johnson.

'Whoever wishes to attain an English style, familiar, but not coarse, and elegant, but not ostentatious, must give his days and nights to the volumes of Addison.'

১১ 'Twentieth Century Prose', A. C. Ward.

১২ 'If the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its successes, 'tradition' should positively be discouraged. We have seen many such simple currents soon lost in the sand; and novelty is better than repetition. Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense...and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence; the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneons order.' —T. S. Eliot, 'The Sacred Wood', pp 44-45.

১৩ Herbert Read, 'English Prose Style' (1952), pp 184-92.

১৪ Lytton Strachey র 'Landmarks in French Literature' গ্রন্থ থেকে একটি উক্তি তুলে প্রমথ চৌধুরী লাতিন-ফরাসি সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, সংস্কৃত বাংলার সম্পর্ক অনুরূপ সম্পর্ক। ঐ উক্তির মধ্যে বন্ধনীতে শব্দগুলি ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃত-বাংলার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন :

"With a very few exceptions, every word in the French [Bengali] vocabulary comes straight from Latin [Sanskrit]. The influence of pre-Roman celts [earlier non-Aryans] is almost imperceptible : while the number of words introduced by the Frankish [Moslem] conquerors amounts to no more than a few hundreds.' ('সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', প্রবন্ধ সংগ্রহ ১)

১৫ 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', প্রবন্ধ সংগ্রহ ১

১৬ 'ঐরূপ হওয়াতে, ফরাসি সাহিত্যের যা বিশেষ গুণ, বঙ্গসাহিত্যেরও সেই গুণ থাকা সম্ভব এবং উচিত। সে গুণ পূর্বোক্ত লেখকের মতে হচ্ছে এই—

French literature is absolutely homogeneous. The genius of the French language, descended from its single stock has triumphed most—in simplicity, in unity, in clarity, and in restraint. ('সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা')

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রমথ চৌধুরীর অভিমত অগ্রাহ্য করে লিখেছেন :

"প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে ফরাসী ভাষার সমধর্মী কেন বলেছেন জানি না। আমার তো মনে হয় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিল অনেক বেশি। বাঙালী জাতের মতোই বাংলা ভাষা বহু ও বিচিত্র উপাদানে গঠিত।" ('বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক,' ফাল্গুন ১৩৬৭, পাদটীকা, পৃ ১৮)।

প্রমথ চৌধুরীর অভিমতের মূলে আছে বাংলা ও ফরাসি শব্দ ভাণ্ডারের উৎস-সাদৃশ্য। বাংলা বাক্যরীতির উপর গোড়ার দিকে (রামমোহনের আমলে) সংস্কৃত বাক্যরীতির ও পরে (বঙ্কিমের আমলে) ইংরেজি বাক্য-রীতির প্রভাব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ নিম্নধৃত উক্তি—

"মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে তখন সেই মৃতভাষার রচনাপদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজমের আমদানি ইংরেজির আদি গদ্য-লেখকরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে করব, সে তো নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়স সবে এক শ বছর হলেও তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চলছে। প্রথম যুগে সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চলছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরেজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের, মুখে এসে পৌঁছেছি।" ('বাংলার ভবিষ্যৎ', ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১)।

১৭ 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ, তদেব।

১৮ এই সকল প্রাক-উনবিংশ শতকীয় বাংলা গদ্যচর্চার নমুনা ও তার মূল্যায়ন পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে—
শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র। সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। Siva Ratan Mitra, Types of Early Bengali Prose.

১৯ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

২০ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—দোম আন্তোনিও দো রোজারিয়ো। সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭॥ সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকাযুক্ত; রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯॥ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' —পাদরি মানোএল্-দা-আসুম্পসাম্॥ দ্র° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩, বঙ্গাব্দ ১৩২৩। শ্রীসুশীলকুমার দে ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ॥
"পোর্তুগীস পাদরিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় মধ্য ও পূর্ববঙ্গে। সেই কারণে ইহাদের রচনা মধ্যে স্থানীয় উপভাষার ছাপ বিশেষভাবে দেখা যায়।

বিদেশী লেখকের হস্তাবলেপের জন্য, অথবা দেশী লোকের লেখা হইলেও অনুবাদ বলিয়া, বিদেশী বাক্যরীতির প্রভাব নিতান্ত অসুলভ নয়। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈষ্ণব প্রশ্নোত্তরময় কড়চা নিবন্ধগুলিই এই সকল রচনার আদর্শস্থানীয় ছিল, এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে তখনকার দিনের বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের রূপ ইহাতে আছে।'— ডঃ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (৩য় সং ১৯৪৯, পৃ ১০-১১)॥

২১ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), পৃ ২৯-৩২

২২ তদেব, পৃ ৩৭-৩৯

২৩ তদেব, পৃ ৩৭-৩৮

২৪ তদেব, পৃ ১৩০-৩১

২৫ তদেব, পৃ ১৩৭, 'কথোপকথনে'র নিদর্শন, পৃ ১৩৭-৩৯

২৬ "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্‌সটন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন।" —সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩২-৩৩

২৭ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, খণ্ড ২, অধ্যায় ১

২৮ বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক দ্রষ্টব্য

২৯ ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃঃ ১৯

৩০ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, খণ্ড ২, অধ্যায় ১

৩১ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থের ভূমিকা

৩২ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' গ্রন্থের ভূমিকা

৩৩ এইসব লেখকের গদ্যরচনার নিদর্শন পাওয়া যাবে 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্কে'

৩৪ 'বাংলাভাষা-পরিচয়', ১০ (১৯৩৮)

৩৫ 'পরিচয়' (১৯৩১)

৩৬ 'ছন্দ (১৯৩৬)

৩৭ কাদম্বরীচিত্র, 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭)

৩৮ 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি' (১৯৩৯)

৩৯ 'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৮৯৫)

৪০ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ৬ (১৯৩৮)

৩ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লেখকগোষ্ঠীর উজ্জ্বলতম রত্ন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯) প্রাক্‌-বিদ্যাসাগর যুগের বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন নির্মাতা। মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে যাঁহারা বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লংকার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই দলের প্রধান। গোলোক শর্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ, রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্য বিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ই ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারিখানি গ্রন্থ—'বত্রিশ সিংহাসন,' 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা: (১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), (২) হিতোপদেশ (১৮০৮), (৩) রাজাবলি (১৮০৮), (৪) বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭), (৫) প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা ১৮১৩, প্রকাশ ১৮৩৩)।

মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, পরে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাদরি উইলিয়ম কেরীর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

গদ্যস্রষ্টা মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে প্রথম কথা—তাঁর অদ্বিতীয় ভাষাজ্ঞান। সংস্কৃতে

অনায়াস অধিকারের ফলে তিনি দুরূহ শাস্ত্রবিচারকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ফলে গদ্যরীতি (স্টাইল) সম্পর্কে তাঁর শিল্পীমন সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে তাঁর রচনাতেই সাহিত্যিক গুণ ছিল সবচেয়ে বেশি।

তিনি বাংলা লিখতে বসে একটি নিজস্ব স্টাইল খাড়া করেছিলেন এবং সাধু ও চলিত—এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ একই ভঙ্গিতে রচিত নয়, বক্তব্য-ভেদ ও গুরুত্ব-ভেদে তিনি স্টাইল বদলিয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁর সাহিত্যকর্মের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করে নি, পরন্তু তাঁর মনকে উদার ও গ্রহণেচ্ছু করে তুলেছে। কেরীকে তিনি যেমন সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়েছেন, তেমনই নিজে কেরীর কাছে ইংরেজি গদ্যের পাঠ নিয়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর লেখকরা পূর্বপ্রচলিত পণ্ডিতী পদ্ধতি, বা সংস্কৃত রীতি ও কথকতার কথ্যরীতিতে গ্রন্থ রচনা করতেন। আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ যেমন আছে, সংস্কৃত শব্দের উপর অতি-নির্ভরতাও আছে।

"এই সকল গ্রন্থে রচনারীতির প্রধান দোষ হইতেছে—(১) দূরান্বয়, (২) পেরেনথিসিস্-এর অত্যধিক ব্যবহার, এবং (৩) ছেদচিহ্নের অল্পতা। তখনকার দিনের সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় হইতেছে এই আটটি—(১) একাধিক বহুবচন-বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—স্ত্রীগণেরা, ভৃত্যবর্গেরা, পঞ্চজন যক্ষেরা, ইত্যাদি; (২) তৃতীয়া-সপ্তমীতে -এতে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—হাতেতে, ঘরেতে, ইত্যাদি; (৩) ক্রিয়াযোগে চতুর্থীর স্থানে -কে বা -রে বিভক্তির ব্যবহার, যেমন—বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল, আমি প্রসন্ন আছি তোকে, রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারেও উচিত নহে এখানে থাকিতে, ইত্যাদি; (৪) তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে "করণক" শব্দের প্রয়োগ, যেমন—ঐরাবত করণক পর্ব্বত বিদার করিয়া দিলে, হংস হত হইল পথিক করণক, ইত্যাদি; (৫) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত বহুবচনের -দিগ বিভক্তির যোগ, যেমন—তাহার দিগের, রাজারদিগকে ইত্যাদি; (৬) শতৃপ্রত্যয়জাত শব্দের অসমাপিকা অর্থে প্রয়োগ, যেমন—চরত, আচরত, হওত, ইত্যাদি (৭) সামান্য অথবা নিত্যবৃত্ত

অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্তমান কালের ব্যবহার, যেমন,—পথিক প্রকাশ করিয়া কহিতেছে, ইত্যাদি; (৮)-অন এবং -ইবা প্রত্যয়ান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া তাহা-ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার, যেমন —হইবাতে, আইসনে, পাওনেতে ইত্যাদি।" (ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সং, ১৯৪৯ খৃ)।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ঐ যুগের রচনারীতির এইসব সাধারণ দোষ থেকে মুক্ত নয়। বেদান্তচন্দ্রিকা ছাড়া বাকি চারখানি গ্রন্থই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিদেশী ছাত্রদের জন্য লিখিত। এই দুটি সত্য স্মরণে রেখেই মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতি বিচার্য। তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থে স্টাইলের যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সচেতন গদ্যনির্মাতা।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২)। পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর ও লণ্ডন থেকে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটি অনুবাদ, স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ। ভাষা সংস্কৃত রীতির সাধু গদ্য। এর নমুনা—

[১] "হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমপুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন।" [মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, পৃ ২৭]

ছেদচিহ্নের অল্পতা সত্ত্বেও এখানে অর্থবোধে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। মৃত্যুঞ্জয়ের লিপিকুশলতার পরিচয় রূপে এই অংশকে গ্রহণ করতে পারি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) আক্ষরিক অনুবাদ, বাক্যরীতি সংস্কৃতানুসারী, মাঝে মাঝে উৎকট। বাক্যে ভারসাম্যের অভাব আছে। নমুনা—

[২] "দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত

হয় না পুরুষেতে স্ত্রী তৃপ্ত হয় না। অপর স্ত্রীলোক দানেতে তুষ্ট হয় না ও সম্মানেতে তুষ্ট হয় না ও সারল্যেতে তুষ্ট হয় না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না যেহেতুক স্ত্রী জাতিরা সর্ব্বপ্রকারে বিষম।" [গ্রন্থাবলী, পৃ ৮১]

এই ভাষা পূর্ববর্তী গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। সংস্কৃত ক্রিয়াপদের প্রভাব লেখক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, প্রথম বাক্যেই তার পরিচয় পাই।

তৃতীয় গ্রন্থ 'রাজাবলি' (১৮০৮) অনুবাদ, বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। প্রথম দুটি গ্রন্থের দোষ থেকে মুক্তিলাভ করে এখানেই মৃত্যুঞ্জয় গদ্যস্রষ্টা রূপে আপন দাবি প্রতিষ্ঠিত করলেন। এতে উন্নত বাক্যপদ্ধতি ও অনাড়ষ্ট ভঙ্গি দেখা যায়। একাধিক পদ্ধতির বাক্য আছে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় দুই পদ্ধতির বিসদৃশ সংমিশ্রণ নেই। নমুনা—

[৩] "যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল।" [গ্রন্থাবলী, পৃ ১৩৪]

একাধিক বহুবচন-বিভক্তির ব্যবহার ও ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তির যোগ সত্ত্বেও এই গদ্যাংশের গতিবেগ সহজেই অনুভব করা যায়।

চতুর্থ গ্রন্থ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর (১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত। বাংলা গদ্য গুরুচিন্তার ভারবহনে কতটা সমর্থ, তার পরীক্ষা এখানে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের স্তর থেকে শাস্ত্র-বিচারের স্তরে বাংলা গদ্যকে উন্নীত করলেন মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন। কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারে এতাবৎকাল এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। নব্যপন্থী রামমোহনের বাংলাভাষায় বেদান্তচর্চার প্রতি কটাক্ষ করে প্রাচীনপন্থী মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থ-উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকে বেদান্তচন্দ্রিকার বাক্যপদ্ধতি ও ভাষারীতির প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

[৪] "পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত

বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তশেলমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রির হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতি নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নানা উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রতেই পরাঙ্মুখ হন। [গ্রন্থাবলী, পৃ ২১৩]

লেখকের রক্ষণশীলতা এখানে দৃষ্টিভঙ্গি ও বাক্যপদ্ধতি, উভয়ত্রই লক্ষ্য করা যায়। রাজাবলির প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা এখানে নেই। হয়তো বিষয়-গুরুত্ব তার কারণ।

মৃত্যুঞ্জয়ের শেষ গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' লেখকের মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত (১৮৩৩)। এই গ্রন্থ বহু বৎসর যাবৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল। প্রবোধচন্দ্রিকা লেখকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বহু শাস্ত্র, অলংকার ও নীতি-বিদ্যার সংকলন এই গ্রন্থ।

কেরীর অনুরোধে হিন্দু-সমাজ ও সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসরূপে মৃত্যুঞ্জয় প্রবোধচন্দ্রিকা লেখেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মৃত্যুঞ্জয়কে এই গ্রন্থ রচনার জন্য পুরস্কৃত করার সুপারিস করেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করেন নি, কয়েক মাসের মধ্যেই ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার কবল থেকে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নিষ্কৃতি লাভ করে (১৮৩৩) (সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১৯৯)।

মৃত্যুঞ্জয় নানা গদ্যরীতির নমুনা দ্বারা গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। "প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কথ্যরীতি, সাধু-রীতি ও সংস্কৃতরীতি। কথ্যরীতি প্রধানত কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বইখানার অধিকাংশ সাধুরীতিতে লেখা। সংস্কৃত-রীতির ব্যবহার কেবল সংস্কৃত হইতে আক্ষরিকভাবে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই। এযাবৎ যাঁহারা প্রবোধচন্দ্রিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় রীতিকেই প্রবোধ-

চন্দ্রিকার বিশিষ্ট রচনারীতি মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। আসলে এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তন্ত্রের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেইসঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। কথ্য এবং সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা সে যুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ হইতে নির্মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী হওয়াতে ভাষাও সর্বত্র সুগম নয়। তবে কথ্যভাষামূলক অংশগুলি প্রাঞ্জল।" (ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', ৩য় সং, পৃ ৩৩-৩৪)

প্রবোধচন্দ্রিকায় ব্যবহৃত এই তিন রীতির নমুনা গ্রহণ করা যাক্।

[১] কথ্য বা মৌখিক রীতি—

"তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল ও মা একি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরগুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মূড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।" [গ্রন্থাবলী, পৃ ২৮৯]

বিরামচিহ্নের বিরলতা ছাড়া এই কথ্যরীতির বিশেষ কোনো দোষ নেই। প্রমথ চৌধুরী এই অংশ উদ্ধার করে এক ভাষণে বলেছিলেন, "এ ভাষা সজীব সতেজ স্বচ্ছন্দ ও সরল। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ····· আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালঙ্কর মহাশয়ের রচনায় এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।" (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ, ফাল্গুন ১৩২১, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, পৃ ৭৭-৭৮)।

আলালী গদ্যরীতি এই নিরলঙ্কার কথ্যরীতির পরবর্তী রূপ।

[৬] সাধুরীতি—

"পঞ্চকোট বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কালপ্রভাবে ঐ বাঘিনীর কাল হওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহার্থ উন্মত্ত-প্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথায় কন্যা না পাইয়া পথিকের দিগকে ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরূপাদি যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রিকালে এক ঘটক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া গভীরস্বরে ডাকিয়া কহিল। ঘটক ঠাকুর তোমরা সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পণের অংশ কিছু পাইয়া শুভকর্ম্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক। আমি আগেই প্রচুর ধন আনিয়াছি তাহা নির্ভয়ে লও আমার বিবাহ যেরূপে হয় তাহা শীঘ্র কর। কন্যার কুলশীল সৌন্দর্য্য বয়স আমার কিছু নির্ব্বন্ধ নাই যেমন তেমন একটা স্ত্রী মাত্র হইলেই হয়।" [গ্রন্থাবলী, পৃ ৩০৪]

বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি এই অলঙ্কৃত সাধুরীতির পরবর্তী রূপ।

[৭] সংস্কৃত রীতি—

"দক্ষিণদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্ন-রঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনীবিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যাস্তবালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন।" [গ্রন্থাবলী, পৃ ২৭১—৭২]

এই রীতি, আগেই বলেছি, রীতিবিন্যাসের নিছক নমুনা রূপেই লিখিত। এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদের সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়সাধনের জন্যই ব্যবহৃত। এই রীতি প্রবোধচন্দ্রিকার বা মৃত্যুঞ্জয়ের বিশিষ্ট রচনারীতি নয়। বস্তুত প্রবোধচন্দ্রিকাকে তৎকালীন সকল গদ্যরীতির প্রদর্শনী মনে করা যায়।

রাজাবলি থেকে গৃহীত [৩] সংখ্যক উদাহরণ ও প্রবোধচন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃত [৬] সংখ্যক উদাহরণেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যরীতির আসল পরিচয় পাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সকল লেখকই বিদেশী ছাত্রদের জন্য

পাঠ্যপুস্তক লিখতেন, মৃত্যুঞ্জয় তার ব্যতিক্রম নন। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য-রীতিতে প্রয়োজনধর্মেরই প্রাধান্য। তবে পরবর্তী পর্বের শিল্পধর্মের ক্ষীণপদধ্বনি শোনা যায় রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকার কোনো কোনো গদ্যাংশে। এখানেই মৃত্যুঞ্জয়ের সার্থকতা—পরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজপথের পত্তন হয়েছিল তাঁর রচনায়। আজ বাংলা গদ্যের বিশাল সৌধের কক্ষে কক্ষে নানা গীতধ্বনি মন্দ্রস্বরে তরল সুরে ললিত সুরে গম্ভীর সুরে বেজে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয় এই সুর-সাধনার ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন, একথা আমরা ভুলে যেতে পারি না।

৪ রামমোহন রায়

বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্ব সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের পর্ব। এই পর্বের তিন প্রধান লেখক রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনজনেরই হাতে বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট চেহারা দেখা গেছে, তর্কের যুক্তির বক্তব্য-প্রতিপাদনের বাহনরূপে গদ্যকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন। এই পর্বের চিন্তা ও কর্মের প্রধান বাহন ছিল সংবাদপত্রের গদ্য—যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করে প্রাণ ও গতি। এই পর্বে (১৮১৮-৪৭) বাহাত্তরটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল (দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮-৬৭', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী)।

গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন (দ্র° 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য', ১ম সং, পৃ ২০৯-১০), আর গদ্যলেখক রামমোহন রায়কে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ (দ্র° বঙ্কিমচন্দ্র, 'আধুনিক সাহিত্য' এবং ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা পরিক্রমা'য় উদ্ধৃত রবীন্দ্র-উক্তি, পৃ ৬৫)।

রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) নব্যভারত স্রষ্টাদের মধ্যে প্রথম, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই কিন্তু তিনি বাংলা গদ্যের স্রষ্টা—এ দাবি মেনে নেওয়া কঠিন। "তাঁহার সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁহার অপেক্ষা ভাল গদ্য লিখিতে পারিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই মনীষায় বা মননে রামমোহনের সমকক্ষ না হইলেও গদ্যরচনার গুণগত উৎকর্ষে রামমোহনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।" (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', পৃঃ ৯৯)।

আসল কথা, রামমোহন উপনিষদ অনুবাদ করে বাংলা গদ্যের ভারবহ-সামর্থ্য পরীক্ষা করেন ও বাংলা গদ্যে মৌলিক চিন্তা (দার্শনিক চিন্তা) লিপিবদ্ধ

করে গদ্যের সহনশীলতা বৃদ্ধি করেন। গদ্যকে প্রয়োজনসাধনের ভাবারূপেই রামমোহন দেখেছেন, শিল্পধর্ম এখানে অনুপস্থিত,—এই সত্যটি মেনে নিলে গদ্যলেখক রামমোহনের বিচারে বিভ্রান্তি ঘটে না।

রামমোহন ছিলেন যুক্তি ও ন্যায়ের উপাসক, pure ও practical reason-এর ভক্ত। তাঁর গদ্যচর্চা মূলত এই যুক্তি ও ন্যায়কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাদানের সাধনা। সুতরাং তাঁর গদ্য তর্কসভার গদ্য, যুক্তিচর্চার গদ্য; হৃদয়াবেগের বাহন নয়, যুক্তি ও বুদ্ধির বাহন।

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। সেদিন থেকে বিলাত যাত্রার দিন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর) পর্যন্ত জাতীয় জীবনে যুক্তি ও চিন্তার প্রতিষ্ঠাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তার উপযোগী গদ্য নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। এই গ্রন্থের 'অনুষ্ঠানে' বাংলা বাক্যরীতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও ব্যবহারকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

"প্রথমত বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন্ শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাব বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২

কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।”

বাক্যে ভারসাম্য ও সুষ্ঠু পদান্বয় রামমোহন আয়ত্ত করতে পারেন নি, কিন্তু সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, তার পরিচয় এই উদ্ধৃতি।

রামমোহনের প্রধান বাংলা রচনা: উপনিষদের বাংলা গদ্যানুবাদ (১৮১৬—১৯), বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮, ১৯), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) ও পথ্যপ্রদান (১৮২৩)। সাপ্তাহিক সম্বাদকৌমুদী (১৮২১) ও দ্বিভাষিক ব্রাহ্মণসেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ (১৮২১)—পত্রিকা দুটিতে রামমোহন নিয়মিত লিখতেন। রামমোহনেব মৃত্যুর অল্প পরে ১৮৩৩ এ প্রকাশিত হয় ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’। তা সত্ত্বেও রামমোহনের গদ্য পরিপাটি, সাবলীল, সুষম হয়ে ওঠে নি। এর কাবণ কি?

সংস্কৃত ভাষা ও আরবী-ফারসীতে তাঁর ছিল অগাধ অধিকার। শাস্ত্রানুবাদ ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবিরাম তর্ক, তাঁকে কখনো সাহিত্যরচনার নিভৃত অবসর দেয় নি। উপনিষদ-চর্চাই তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল, তাই তাঁর গদ্যও গড়ে উঠেছে সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুসরণে। অর্থাৎ তা আধুনিক গদ্য নয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি, প্রমথ চৌধুরী এক অভিভাষণে প্রবোধচন্দ্রিকার কথ্যভঙ্গির গদ্যাংশ তুলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রশংসা করেছিলেন। সেই অভিভাষণেই তিনি রামমোহনেব উপরোক্ত গদ্যাংশ উদ্ধার করে আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেব অধীনতা স্বীকার না করে আমরা যদি সংস্কৃত অভিধানের অধীনতা স্বীকার করি, তবে বাংলা ব্যাকরণ ও গদ্যের মুক্তি ঘটবে বলে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন।

প্রমথ চৌধুরী ‘বেদান্তগ্রন্থ’ থেকেই রামমোহনের ভাষাচিন্তার দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। (ক) ভাষার স্বাতন্ত্র্য তার গঠনের উপর নির্ভর করে, এক ভাষা অপর ভাষার ব্যাকরণের অধীন হতে পারে না—

“ভিন্ন ২ দেশীয় শব্দে বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের

রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই২ দেশীয় ভাষায় ব্যাকরণ কহা যায়।"

(খ) মৌখিক ভাষাতেই রচনার মুক্তি, রামমোহনের ব্যবহৃত পদগুলি অবৈধ সন্ধিবদ্ধ কিংবা সমাসবিড়ম্বিত নয়। কারণ তিনি জানতেন যে—

"সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।"

এবং "এরূপ পদ (সংস্কৃত সমাস) গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না।"

ব্যাকরণ ও ভাষা সম্পর্কে এই সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও রামমোহনের গদ্য-রীতি ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? তার একমাত্র উত্তর—তিনি সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে মডার্ন প্রোজ বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।" (প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, পৃ ৮০)

রামমোহনের এই গদ্যরীতির নমুনা দিই—কঠোপনিষদের অনুবাদ—

"কঠোপনিষৎ: জানম্যহং শেষধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতাশ্চিতোঽগ্নিয়ানিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং॥ ১০॥

রামমোহনের অনুবাদ:

[১] "প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল সে অনিত্য, আমি তাহা জানি, যেহেতু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্যবস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্যবস্তু দ্বারা স্বর্গফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

(ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', ১ম সং, পৃ ৯৯—১০০)

আশ্চর্যের কথা, 'বেদান্ত গ্রন্থে'র 'অনুষ্ঠান' বা ভূমিকায় ও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'

রচনায় সংস্কৃতপ্রভাবমুক্ত বাংলা গদ্যভাষার যে রূপটি রামমোহনের দৃষ্টিতে আভাসিত হয়েছিল, এই অনুবাদে তার আভাস নেই, এ কেবল সংস্কৃত বাক্য-রীতির অন্ধ অনুসরণ মাত্র।

রামমোহনের গদ্যরীতির সার্থকতা সেই ক্ষেত্রে যেখানে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন, সাময়িকপত্রের দ্রুতলেখনভঙ্গিটি স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে দুটি নমুনা দিচ্ছি—প্রথমটিতে ইংরেজ মিশনারিদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ, দ্বিতীয়টিতে দেশী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাদের প্রতি কঠোর যুক্তিপূর্ণ বিদ্রূপ।

[২] "শতাব্দ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ কবেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারেব রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাংলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত

হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন।"

(ব্রাহ্মণসেবধি, ১৮২১, রামমোহন-গ্রন্থাবলী, পৃ ৪৫৫)

রামমোহনের নির্ভীকতা ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠতা সকল ত্রুটি সত্ত্বেও এই গদ্যাংশকে দিয়েছে গদ্যভাষার দুটি প্রধান গুণ—ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা।

[৩] "ধর্ম্মসংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে 'এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা যবনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহারদের স্ত্রীও বিধবা তুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কিনা' উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহ বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচসিকা গোঁসাইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচসিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।" ('পথ্যপ্রদান', ১৮২৩, পৃ ২৫৯—৬০)।

এই গদ্যের ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা অবশ্যস্বীকার্য।

সম্বাদকৌমুদী (১৮২১) ও ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১) পত্রিকায় এবং 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) ও 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) গ্রন্থে রামমোহনের গদ্যরচনানৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে।

[ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ড' 'নগরান্তবাসী' (অর্থাৎ চণ্ডাল) ও 'ভাক্তত্বজ্ঞানী' রামমোহন রায়কে আক্রমণ করে 'চারিপ্রশ্ন' (সমাচার দর্পণে ১৮২২-এ প্রকাশিত) ও 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) রচনা করেন; রামমোহনের 'চারিপ্রশ্নের উত্তর' ও 'পথ্যপ্রদান' তারই যোগ্য উত্তর। দ্র সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১৩৬৯, পৃ ৩২৪-২৬]

রামমোহন রায়ের গদ্যে ভারসাম্য ও বিরতির (বিরামচিহ্নের) অভাব

আছে। দুরান্বয় ও প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুসৃতি অনায়াসলক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও তিনি তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে গদ্যকে দৈনন্দিন জীবনের স্রোতের পথে এনেছিলেন এবং উপনিষদ-অনুবাদের দ্বারা বাংলা গদ্যকে গুরু ভারবহনে সমর্থ করে তুলেছিলেন। আর গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করে বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীনতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের গদ্যে সাহিত্যিক সুষমা ও ভারসাম্য নেই, তা এসেছে বিদ্যাসাগরের গদ্যে। সাময়িকপত্র-পর্বের অন্যতম প্রধান লেখক রামমোহন বাংলা গদ্যকে দিয়েছেন ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা ও প্রাঞ্জলতা, এনেছেন দার্শনিক চিন্তার বলিষ্ঠতা ও নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা। গদ্যভাষার আগামী সমৃদ্ধির ইঙ্গিত তিনিই দিয়েছেন।

৫ | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র-পর্বের অন্যতম প্রধান লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা ওরফে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্মা (১৭৮৭-১৮৪৮) বাংলা গদ্যে এনেছিলেন ক্ষিপ্রতা ও লঘুতা। তিনি দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে রামমোহনের সঙ্গে সম্বাদকৌমুদী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ (প্রথম প্রকাশ: ৪ ডিসেম্বর ১৮২১) করেন। প্রথম তের সংখ্যা সম্পাদনার পর সমাজ সংস্কার-বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে ভবানীচরণ সম্বাদকৌমুদীর সম্পর্ক ত্যাগ করে সাপ্তাহিক সমাচারচন্দ্রিকা (প্রথম প্রকাশ: ৫ মার্চ ১৮২২) প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা পরে (এপ্রিল ১৮২৯ থেকে) সপ্তাহে দু বার করে প্রকাশিত হয়।

ভবানীচরণ মুখ্যত সাহিত্যসেবী ছিলেন না। জীবনে আর পাঁচটি কাজের সঙ্গে সাহিত্যেরও সেবা করেছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা বাঙালি হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে এগিয়েছিলেন ও যাঁরা সংস্কারে বাধা দিয়েছিলেন, ভবানীচরণ তাঁদেরই একজন। এই দুই পক্ষই সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তিকা মাধ্যমে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। রামমোহন রায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা কেবল সাহিত্যসেবী নন, মুখ্যত সমাজসেবী। হিন্দু সমাজের সংরক্ষণে ও ভাঙনে, সংস্কারে ও গঠনে এঁরা কোনো-না-কোনো পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই সংঘর্ষে কোনো পক্ষ হেরেছেন, কোনো পক্ষ জিতেছেন। কিন্তু লাভবান হয়েছে বাংলা গদ্য, তর্কের ও যুক্তির ভাষা, রসের ও ব্যঙ্গের ভাষা, গুরু চিন্তা ও দুরূহ শাস্ত্রবিচারের ভাষা রূপে বাংলা গদ্য এঁদেরই হাতে গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-আন্দোলন ও-সংঘর্ষের ইতিহাস পরোক্ষে বাংলা গদ্যের ইতিহাস।

রামমোহন ছিলেন সংস্কারপন্থী, আর ভবানীচরণ সংরক্ষণপন্থী, তাই দুজনে

বেশিদিন এক সঙ্গে চলতে পারেন নি। কিন্তু দুজনেই গদ্য-সরণি আশ্রয় করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন কলাকার। রামমোহন আড়ষ্ট বাংলা গদ্যকে তর্কসভার উপযোগী ঋজুতা ও গতিবেগ দান করেন। তখনো বিদ্যাসাগর আসেন নি। সেই সময়ে—শাস্ত্রীয় বিচার ও সমাজ সংস্কার নিয়ে মাথা ফাটাফাটির দিনে—ভবানীচরণ বাংলা গদ্যে ক্ষিপ্রতা ও সরসতা আনেন। ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশংকর তর্কবাগীশ প্যারীচাঁদ মিত্র কালী-প্রসন্ন সিংহের হাতে যে ব্যঙ্গপ্রধান বিদ্রূপাত্মক শাণিত গদ্য গড়ে উঠেছিল, তার পত্তন হল ভবানীচরণের হাতে। তাঁর গদ্যচর্চার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল সাময়িক পত্রিকা।

ভবানীচরণ সম্পর্কে একটি অভিমত প্রাণিধানযোগ্য :

"দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাল রাখিয়া সরল ও সহজবোধ্য বাঙ্গালা গদ্য গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সংবাদপত্র একটি মুখ্য সাধন হইয়া দাঁড়াইল। এক দিকে ইংরেজী হইতে যেমন, তেমনি অন্যদিকে সংস্কৃত হইতেও অনুবাদের পথ ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের প্রসার ও শক্তি উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪০ সালের পূর্বেই এই সমস্ত সমবেত চেষ্টার ফলে বাঙ্গালায় একটি কার্যকরী ও শক্তিশালী গদ্যশৈলী স্থাপিত হইয়া গেল। এই বিষয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙ্গালায় প্রথম গদ্য স্টাইলিস্ট অর্থাৎ, শক্তিশালী পদ্ধতির প্রবর্তক বলিতে পারা যায়।" (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের পরিচিতি, ১৯৫৭)

ভবানীচরণের গদ্যের ক্ষিপ্রচারিতা ও সাবলীলতা-গুণের প্রতি এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। ভবানীচরণের গদ্যরচনাকাল ১৮২১ থেকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ। তিনি ধর্মসভা (১৮৩০) স্থাপন করেন; সনাতন ধর্মের পক্ষ নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সঙ্গে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; ভাগবত, মনুসংহিতা, গীতা, ঊনবিংশ সংহিতা ও স্মার্ত রঘুনন্দন-কৃত তত্ত্বনব্যস্মৃতি পুঁথি-আকারে মুদ্রণ করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারকল্পে বিতরণ করেন। ভবানীচরণের সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা ও হিন্দুধর্ম সংরক্ষণপ্রয়াসেরই অপর দিক গদ্যচর্চা। যে তিনটি গ্রন্থের জন্য তাঁর খ্যাতি, সেগুলি সাময়িকপত্রের জন্য লিখিত, আচারভ্রষ্ট হিন্দুদের শিক্ষাদানচ্ছলে রচিত · (১) কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), (২) নববাবুবিলাস (১৮২৫), (৩) নববিবিবিলাস (১৮৩১)।

এই তিন গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য যৎসামান্য। প্রাক্-বিদ্যাসাগর পর্বের বাংলা

গদ্যে লঘুতা ও ক্ষিপ্রতা সঞ্চারে, ব্যঙ্গরস ও বিদ্রূপ প্রয়োগে, সরসতা ও লালিত্য সাধনে ভবানীচরণের কৃতিত্বের পরিচায়ক রূপেই এদের সার্থকতা। ব্যঙ্গপ্রধান গদ্যের তিনিই প্রথম শিল্পী।

গদ্যশিল্পী ভবানীচরণের এই নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

[১] বি. প্র (বিদেশীর প্রশ্ন) মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে অনেক ভাগ্যবান লোকের নিকট কতকগুলিন লোক নিয়ত যাতায়াত করে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যায় বেলা দশ এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে এবং বৈকালে যায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় কালযাপন করে আর ইহাদিগের কেবল এই কর্ম্ম যে অনবরত বাবুর হাঁই উঠিলে তুড়ি দেয় এবং আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় ২ করে, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল লোক কোন কর্ম্মে পারগ কি, না, আর কোন শাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে কি, না, আর ইহারা যে যেখানে গিয়া থাকে সে নিয়ত তাহারি নিকট গমানগমন করে, কি, সর্ব্বত্রই যায় এই তাহাদিগের কর্ম্ম, আমি ঐ সকল ব্যক্তির বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

ন, উ (নগরবাসীর উত্তর) আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অনেকের নিকটে লোক নিয়ত যাতায়াত করে বটে, যে সকল লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার লোক আছে কেহ ২ বাঙ্গালা পারসি ইংরেজি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হইয়া ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়, কোন বিষয়কর্ম্মের আশায় যাতায়াত করে, কেহ ভিক্ষা করতে অতি নিপুণ কন্যা ভগিনীর বিবাহের ভারাক্রান্ত হইয়া তদুদ্ধার উপলক্ষে যাতায়াত করিতেছে, কেহ বাবুর সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত নিয়ত যাইতেছে মনোনীত কথা কহিতে ও কর্ম্ম করিতে তাহারা বিলক্ষণ পারগ, তাহারদিগের সঙ্গে লইয়া বাবু স্থান বিশেষে গমন করেন, লোকে তাহাদিগের কহে ইহারা অমুক বাবুর মোসাহেব ইহাতে তাহারা মহা আনন্দিত থাকে এবং তাহার মধ্যে দুই চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন তাঁহারা কখন শাস্ত্রবিচার করেন, কখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও শুনেন, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারাও উপাসনার পারদর্শী হইবেন, কোন ২ ব্যক্তির গান বাদ্যাদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, বাবুর যখন তদ্বিষয়ে বাঞ্ছা হয় তখন তাহারা তদ্দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করেন কতকগুলিন লোক আছে তাহারা মিথ্যা গল্প করিতে ও লোকের কুৎসা প্রকাশ করতে বিলক্ষণ

নিপুণ তাহারা সময়ানুসারে বক্তৃতা করে, আর এ সকল লোক একজনার নিকট নিয়ত যাতায়াত করে এমত নহে পাত্র বিশেষে অনেকের নিকট যায়, এক্ষণে আপনকার ব্যাকুলচিত্তকে সুস্থ কবিয়া আমাকে অনুকূল হও।

[কলিকাতা কমলালয়]

[২] ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন [মন] খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি; খলিপা কহিলেন, কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব, কিন্তু পাঁচশত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সংপ্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল বাবুজী আমি তোমার নিকট যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকির করহ; খলিপা কাপ্তেনি আফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুইজন দালাল আনিয়া বাবুর নিকট নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন পাঁচশত টাকা; দালালেবা একে হনূমান, তাহাতে যদি আজ্ঞা পান, তবে তৎক্ষণাৎ মহাজনের বাটিতে হয়েন ধাবমান, মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন দালালেরা কহিলেক মহাশয় অভাগা অজা পাইয়াছি, পাঁচশত টাকা চাহে, মহাজন কহিলেক তাহার নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটি কোথা দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ও সকল কথার প্রয়োজনে নাই। আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই। ইহার নাম জগদ্দুর্ল্লভ বাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ। হরেক রকম সওদাগিরি আছে বেলেঘাটায় চুণের গোলা জক্সনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটিতে মুটের সরদারি প্রায় লক্ষ দুই টাকার সম্ভাবনা হইবেক।

[নববাবুবিলাস]

[৩] যদ্যপি নববাবুবিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয়

নাই ; এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে, প্রয়াসপূর্ব্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।

[নববিবিবিলাস]

প্রথম উদাহরণে বিরামচিহ্নের বিরলতা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু দূরান্বয়ের শৈথিল্য বিশেষ নেই, দুরূহ সমাসবদ্ধ পদ ও দুরুচ্চার্য তৎসম শব্দের দৌরাত্ম্যও নেই। অনুচ্ছেদ বিভাগের কোনো সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। "হইবেক", "তাহারদিগের", "আপনকার" প্রভৃতির প্রয়োগ প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে দেখা যায়। এতৎসত্ত্বেও গদ্যের ক্ষিপ্রচারিতা ও সাবলীলতা অবশ্যস্বীকার্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে লেখক বিরামচিহ্ন প্রয়োগে কিছুটা সচেতন। এই গদ্যাংশের ক্ষিপ্রচারিতা ও অনায়াসগামিতা প্রথম উদাহরণ অপেক্ষা উন্নততর। বাক্য রচনায় কবিগান ও আখড়াইয়ের প্রভাব অনায়াসলক্ষণীয়। এই উদাহরণের মধ্যাংশের দু'একটি ছত্রকে অনায়াসে এই ভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা যায়—

দালালেরা একে হনূমান,
তাহাতে যদি আজ্ঞা পান,
(তবে তৎক্ষণাৎ) মহাজনের বাটিতে হয়েন ধাবমান।

গদ্যসচেতনতা যে এখনো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তার প্রমাণ এই নমুনা।

তৃতীয় উদাহরণ অপেক্ষাকৃত উন্নততর।

ভবানীচরণ সেকালের জনপ্রিয় সমাজনেতা ও সাময়িকপত্রের লেখক। তাঁর গদ্যের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গপ্রবণতা, সরসতা ও পরিহাসকুশলতা পাঠমাত্রেই ধরা পড়ে। দূরান্বয়ের শৈথিল্য ও সমাস-পটলের দৌরাত্ম্য থেকে এই গদ্য মুক্ত। বিরতিচিহ্নের বিরলতা ও অনুচ্ছেদের অনুপস্থিতি এর ত্রুটি। বিদ্যাসাগরে এই ত্রুটির সংশোধন হয়। ভবানীচরণের গদ্যের ক্ষিপ্রতা ও সাবলীলতা প্রাক্-বিদ্যাসাগর যুগের গদ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ভবানীচরণ সমাজসংস্কারে গোঁড়া রক্ষণশীল, কিন্তু গদ্যচর্চায় মুক্ত মনের অধিকারী ও প্রগতিশীল। একারণেই সতীদাহ-সমর্থক সংস্কারবিরোধী ভবানীচরণকে আমরা মনে রাখব।

৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপী-মোহন ঠাকুর ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গোপীমোহনের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) সংবাদ-প্রভাকর (প্রথম প্রকাশ ২৮ জানুঅরি ১৮৩১) প্রকাশ করেন। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে সংবাদপ্রভাকরের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সংবাদপ্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে (২৮ জানুঅরি ১৮৩১ থেকে ২৫ মে ১৮৩২), তারপর বারত্রয়িক রূপে (১০ আগস্ট ১৮৩৬ থেকে তিন বৎসর), তারপর দৈনিক রূপে (১৪ জুন ১৮৩৯) ও মাসিক রূপে (১৮৫৩ থেকে) প্রকাশিত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ সংবাদপ্রভাকর বর্তমান ছিল। (দ্র —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩৩)।

(ঈশ্বর গুপ্ত কোনো বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ ছিলেন না। পরিবর্তমান মূল্যবোধ ও সমাজ-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। যখন তিনি কলকাতায় সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি (রক্ষণশীল) 'ধর্মসভা'র (১৮৩০) অন্যতম নেতা ছিলেন।) তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মতবাদের পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় (১৮৩৯) যোগ দেন। ফলে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মধর্মের উদার মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন; সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বিরাগ প্রশমিত হয় এবং সহানুভূতি দেখা দেয়। যে ধর্মসভার সঙ্গে পূর্বে তাঁর যোগ ছিল, সংবাদপ্রভাকরে তার প্রতিকূলে মন্তব্য লেখেন। সমাজ-চিন্তার দিক দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত মুক্ত চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু সাহিত্য-চিন্তায় তিনি রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। কবির দলে তিনি গান বাঁধতেন (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেও গান বেঁধেছিলেন), এবং মাসিক

সংবাদ-প্রভাকরে (১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫) কবিওয়ালাদের গান সংকলন ও জীবনী রচনা করেছিলেন। সেইসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায় ও রামপ্রসাদ সেনের জীবনী রচনা করেছিলেন।

বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। চারখানি সাময়িক-পত্রের সম্পাদকরূপে (সংবাদপ্রভাকর ১৮৩১, সংবাদ রত্নাবলী ১৮৩২, পাষণ্ড-পীড়ন ১৮৪৬, সংবাদ সাধুরঞ্জন ১৮৪৭) তিনি কলোল্লিত কলকাতার জীবন-তরঙ্গে ভাসমান ছিলেন। সম্পাদকরূপেই তিনি গদ্যচর্চা করেন। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার প্রধান লক্ষ্য—গদ্যকে সর্বকার্যে নিয়োগ ও সর্বজনের ব্যবহারযোগ্যতা অর্জন। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য এই লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর গদ্যভাষা আটপৌরে ; সে গদ্যের চাল হাল্কা, গতি দ্রুত। এই গদ্য সাহিত্যগুণবর্জিত ও সমকালের সেবায় নিযুক্ত। ঈশ্বর গুপ্তেব গদ্যকে এক কথায় বলা যায়, সাংবাদিকের গদ্য। সাহিত্যিক গদ্যের অব্যবহিত-পূর্বস্তর এই সাংবাদিক গদ্য। ঈশ্বর গুপ্ত তারই শিল্পী।

সংবাদ প্রভাকব উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদে বাংলা সাহিত্যের 'হর্তা কর্তা বিধাতা' ছিলেন। সেদিনের যে সকল প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখক সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের নাম : দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব মিত্র, গোসাঁইদাস গুপ্ত, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রামকমল মজুমদার, যাদবচন্দ্র রায়, শ্যামানন্দ গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বরাট, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বলদেব পালিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের অনেকেরই হাতেখড়ি হয় সংবাদ প্রভাকরে—সাংবাদিক গদ্যের অপরিহার্য স্তর উত্তীর্ণ হয়েই তাঁরা সাহিত্যিক গদ্যে উপনীত হয়েছিলেন—এই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা গদ্যের নির্মাণকারীদের অনেকেই ছিলেন সংবাদপত্রের লেখক। সাময়িকপত্রের পর্বে গদ্যভাষার নমনীয়তা, ক্ষিপ্র-চারিতা ও সাবলীলতা গুণ বেড়েছে, ভাষার নিজস্ব শক্তি ক্রমশঃ দেখা দিচ্ছে, নিত্য নোতুন শব্দ গৃহীত হচ্ছে, সংবাদপত্রের ব্যবহারিক প্রয়োজনে নোতুন শব্দ নির্মিত হচ্ছে, আভিধানিক অচলতা থেকে শব্দের ঘটছে মুক্তি, ঘুচে যাচ্ছে ভাষার আড়ষ্টতা। গদ্যভাষা মিশে গেল সংসারের স্রোতে, নিত্য চলাচলের

পথে, জীবনের তরঙ্গে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষা এই সাংবাদিক গদ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

সংবাদ প্রভাকরের কাছে বাঙালির ঋণের উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র :

"এই প্রভাকব ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পবিবর্ত্তন করিয়া যান।"

('ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব')

ঈশ্বর গুপ্তেব গদ্যভাষাব প্রকৃতি কি? এবিষয়ে আজও আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাবি নি বলেই বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের ইতিহাসে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের নামোল্লেখে দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে তিনটি অভিমত উদ্ধার করি।

(ক) "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন গদ্যে তাহার কিছুই পারেন নাই। ইঁহার গদ্যভঙ্গি ছিল নিতান্ত দীর্ঘায়ত ও যৎপরোনাস্তি অনুপ্রাসমণ্ডিত।" (ডঃ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' ৩য় সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ ৫০)

(খ) 'সমকালেব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (জানুঅরি ১৮৪৩) এবং ঈষৎ পরে প্রকাশিত দ্বারকানাথের সোমপ্রকাশের (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) ভাষা অতিশয় গুরুভার ছিল। গদ্যের জড়তা মুক্তির জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক-সুলভ লঘু ধরণের বাক্য গঠন অবশ্য প্রশংসনীয়। সাংবাদিক রচনা রীতির স্রষ্টা বলিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।" (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', ১ম সং, পৃ ১৮৫)

(গ) "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের স্টাইল বা রচনা-রীতিকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। নব্য বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে রামমোহনের স্থান অবশ্যই অনেক উপরে, কিন্তু সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগের প্রসঙ্গে রামমোহনের চেয়ে ঈশ্বর গুপ্তের মূল্য অধিক।…যে আটপৌরে ভাষা

সৃষ্টি কেরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের এবং সমসাময়িক সাংবাদিকগণের কলমে হ'ল তার পত্তন। তাঁর যে রচনাটি ('ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত') নিছক সাংবাদিকতা নয়, কিছু স্থায়িত্ব আছে যার, তার প্রধান গুণ অনাড়ম্বর আটপৌরে ভাষা।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'বাংলা গদ্যের পদাংক', ১ম সং, ভূমিকা, পৃ ৪৯-৫০, ৬১-৬২)

প্রথম অভিমতের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমতের কোনো সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুশকিল এই যে, সংবাদ প্রভাকরের প্রথম পনেরো-ষোল বৎসরের ফাইল পাওয়া যায় না। পরবর্তী বৎসরগুলির ফাইল জরাজীর্ণ, কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দুখণ্ড), শ্রীভবতোষ দত্ত ('ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবি জীবনী', ১৯৫৮), শ্রীবিনয় ঘোষ ('সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ১ম খণ্ড, ১৯৬২) --কেউই প্রথম দিকের সংবাদ প্রভাকর দেখেন নি। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ও সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার সংবাদ প্রভাকর নেই। সুতরাং ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সংবাদ প্রভাকর থেকে ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার নমুনা বিচার করে আমাদের সন্তুষ্ট হতে হয়।

তা বিচারের পূর্বে ভেবে দেখা দরকার, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষারীতির আদর্শ কি? সংস্কৃত গদ্য ও ইংরেজি গদ্যের আদর্শ ঈশ্বর গুপ্ত গ্রহণ করেন নি, করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শ ছিল বাংলার মৌখিক ভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাংলা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা'। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন, সাহিত্যিক গদ্যভাষার কাঠামোটা গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি গদ্যভাষা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র এখান থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষা বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত, তা সংস্কৃত গদ্য ও ইংরেজি গদ্য থেকে দূরবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার ভিত্তি বাংলা মৌখিক ভঙ্গি, তাকে তিনি সংবাদপত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কবির দলে গান বাঁধতেন, এই ঘটনার তাৎপর্য এখানেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। আলালী ভাষায় এই মৌখিক রীতিরই বিস্তার ঘটেছে

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথাই বলেছেন, সংস্কৃত ও

ইংরেজি প্রভাব-মুক্ত খাঁটি বাংলা অর্থাৎ মৌখিক ভঙ্গির বাংলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য :

"তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখেন নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমের এই অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষারীতি যে আর অনুসৃত হবে না, সেকথা বঙ্কিম বলেছেন। বাংলা গদ্য বিদ্যাসাগরের হাতে ইংরেজি গদ্যের আদর্শে গড়ে উঠল, এই ইতিহাস-সত্যের স্বীকৃতি এখানে পাই।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম গদ্য রচনার নিদর্শন পাই তৎসম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের "কালীকীর্ত্তন" (১৮৩৩) গ্রন্থের ভূমিকা। এই ভূমিকার গদ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই; তা আছে পরবর্তী কালের সংবাদ প্রভাকরে।

বঙ্কিমের উদ্ধৃত অভিমতে একটি মূল্যবান ইঙ্গিত আছে—ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য ও গদ্যের একই রীতি—খাঁটি বাংলা রীতি। তাঁর পদ্যভাষা কথ্যভঙ্গির রীতিতে গঠিত (পয়ারের অলঙ্ঘনীয় শাসন ছাড়া তার মধ্যে কাব্যভাষার নাম গন্ধ নেই), আসলে তা সংবাদপত্রের ভাষা—সাংবাদিকের কলমে লেখা পদ্য-ভাষা। এই পদ্যভাষার অনেক ছত্রই আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে, এখানেই এই ভাষা সার্থকতা লাভ করেছে—জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। যেমন,

কলকাতার বর্ণনা : রেতে মশা দিনে মাছি, / এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি॥

অথবা ঈশ্বর সম্বোধন : তুমি হে আমার বাবা, 'হাবা আত্মারাম'॥

বিবিদের সম্বন্ধে উক্তি : বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে॥

অথবা, বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে॥

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে স্মরণীয় উক্তি : এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥

আর দেশপ্রেম সম্বন্ধে উক্তি : কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, / বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতি—পদ্যের চরণবিভাগ তুলে দিলে একে গদ্যভাষা বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যায় : তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু, / শিখি নি শিং বাঁকানো, / কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস। / যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা, / গামলা ভাঙে না। / আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব, / ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার আদর্শ সম্পর্কে একটি নোতুন বক্তব্য উপস্থিত করেছেন শ্রীভবতোষ দত্ত ('বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড, ১৯৬১)। তাঁর মতে রামপ্রসাদের গানের ভাষা এর উৎস। "কোনো সাহিত্যের উদ্যান থেকে নেওয়া নয়, দেশের নিজের জল হাওয়ায় আপন নিয়মে যে ভাষা অঙ্কুরিত হয়েছে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পূর্বে তার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, একটি রামপ্রসাদের গানে আর-একটি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। অতিরিক্ত ব্যঙ্গপ্রবণতা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে খানিকটা স্বতন্ত্র করে তুললেও এই ভাষাই রামপ্রসাদের আমলের বাংলা বাগ্‌ভঙ্গি সমন্বিত ভাষা।" অভিমতটি ভেবে দেখার মতো।

এখন ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য ভাষার নমুনা উদ্ধার করি।

[১] বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনা করেন যে তাঁহারা ছাই ভস্ম যাহা পাইবেন তাহাই সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইবেক, এই অভিপ্রায়ে যাহার মনে যাহা উদয় হয় তিনি তাহাই লিখিয়া পাঠান, কিন্তু সম্পাদকেরা কত সাবধানে কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা বিবেচনা করেন না, ছাই ভস্ম সকল বিষয় প্রকাশ করণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় নাই, যে সমুদয় বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি, নিন্দা-জনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকটিত করি না, বিশেষতঃ পরগ্লানি প্রকাশে অতিশয় দুঃখ বোধ করিয়া থাকি, কোন ২ পত্র প্রেরক রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত কোন ২ প্রধান ব্যক্তির ব্যবহার দোষ লিখিয়া প্রেরণ করেন, সেই সকল পত্র সাধারণের স্বগোচর করাতে এক প্রকার উপকার আছে বটে, কারণ তদ্দারা রাজপুরুষেরা সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, ফলতঃ তাহার নিশ্চিতানিশ্চিত না জানিতে পারিলে আমরা কি প্রকারে তৎপ্রকটনে সাহসি হইতে পারি? আদৌ পত্র প্রেরকের প্রতি বিশ্বাস চাই, তাহা না হইলে কোন মতেই তাঁহার

প্রেরিত পত্রের প্রতি প্রত্যয় হইতে পারে না, অতএব বিদেশীয় অজ্ঞাতকুলশীল পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি তাঁহারা অনর্থক পরিশ্রম গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের বিপক্ষে বৃহৎ ২ পত্র রচনা করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন না, যিনি অস্মদাদির নিকট বিশিষ্টরূপে পরিচিত না হয়েন আমরা তাঁহার লিখিত এতদ্রূপ পত্র সকল কখনই পত্রস্থ করিব না। [সম্পাদকীয়। সংবাদ প্রভাকর। ২৩ ২. ১২৫৪। ৫. ৬. ১৮৪৭ খৃ। 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ১ম খণ্ড। শ্রীবিনয় ঘোষ-সম্পাদিত ও সংকলিত। পৃ ৪০৭-০৮]

[২] ...অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাব যে, তাঁহারা অল্প অর্থের মুখ দেখিতে পাইলেই বাবু হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বদা গোলবালিসে ঠেস্ দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, তাহারা যদি অর্থ পাইলে পরিশ্রমের কার্য্যে অনুরাগি হন তবে এই দেশ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও প্রধান হইতে পাবে, পরমেশ্বরের অনুকম্পায় স্বাভাবিক নিয়মে এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্ব্বত কান্তারে এবং রত্নাকরাদি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় আমরা যদি শিল্প কার্য্যের দ্বারা তত্তাবৎ নানাবিধ প্রকারে আহার ও ব্যবহারের অধীন করিতে পারি তবে আমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ উৎকৃষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ ইংরাজেরা এই দেশ হইতে রেশম লইয়া যান এবং শিল্পবিদ্যার অনুরাগে তদ্দ্বারা শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং আমরা প্রয়োজন মতে তাহাই ক্রয় করত দেহ শোভিত করি, এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা যদি ইংরাজদিগের ন্যায় শাটিন প্রস্তুত করিবার উপায় শিক্ষা করত এতদ্দেশে তাহা প্রস্তুত করেন তবে আমাদিগের বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু তাহাদিগের এমত বিবেচনা যে তাঁহারা শিল্পবিদ্যায় লিপ্ত হইয়া অপমান বোধ করেন, কি আশ্চর্য্য, যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্য্যের পরমোপকারক হন, তাঁহারা সেই বিদ্যার অনুশীলনকে অপমানের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, অতএব আমাদিগের নিতান্ত অভিলাষ দেশীয় মহাশয়েরা আমারদিগের এই আক্ষেপজনক সদুপদেশে বিরক্ত হইবেন না, আমরা তাঁহারদিগকে কেবল শিল্পবিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, এবং মিকানিক ইনষ্টিটিউশন নামক সভা পুনঃস্থাপন বিষয়ে মনোযোগিকরণার্থে এই বিষয়ে ক্রমশঃ লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। [সম্পাদকীয়। সংবাদ প্রভাকর। ২৬. ২. ১২৫৪। ৮. ৬. ১৮৪৭ খৃ। তদেব। পৃ ৬৮-৬৯]

[৩] বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন ভাষা দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিলে তাঁহারা কৃতবিদ্য হয়েন, সংপ্রতি এই প্রশ্ন লইয়া অনেকে আন্দোলন করিতেছেন, এবং মেং বি এচ হজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে বিবিধ প্রকার প্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগ করত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাতে আন্দোলনের স্রোতঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মেং হজসন সাহেব স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, এই বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের স্থানে ২ যে সকল ভিন্ন ২ ভাষা প্রচলিত আছে তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিতা করণাভিপ্রায়ে কতিপয় বিলাতীয় ব্যক্তি বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষা প্রচার নিমিত্ত রাজ-ভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাহারদিগের ঐ দুরাশা কখনই সিদ্ধ হইবেক না. এক-জাতির ভাষা পরিবর্ত্তন করা সামান্য কার্য্য নহে, যুগ যুগান্তর মন্বন্তরযোগে ঐশ্বরিক কোন ঘটনার দ্বারা এই জগতের সমুদয় শোভার বিশেষ ভাবান্তর ভিন্ন ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, কতিপয় শ্বেতকান্তি এই রাজ্যের রাজকার্য্যের ভার গ্রহণপূর্ব্বক ঐ অসাধ্য কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া পিপীলিকার সিন্ধু সন্তরণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন. ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট একাল পর্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, ঐ টাকা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এতদিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় ব্যক্তি-দিগের যথার্থ উপকারক বন্ধু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেন, যদি বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এই বৃহদ্রাজ্যের অসংখ্য মনুষ্য বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিরহে অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিলাতীয় বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তটস্থ মনুষ্যদিগের সভ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণকে লভ্য করিয়াছেন, অপিচ রাজপুরুষেরা যদ্যপি দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক এই দেশের ভাষা দ্বারা এই দেশের মনুষ্যদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদানের নিয়ম করিতেন, তবে সর্ব্বসাধারণে বিদ্যানুশীলনের অনুরাগি হইয়া অনায়াসে বিদ্যাধন লাভ করিতে পারিতেন। [সম্পাদকীয়। সংবাদ প্রভাকর। ১৯. ১২. ১২৫৪ । ৩১. ৩. ১৮৪৮ খৃ। তদেব। পৃঃ ২৯৪-৯৫]

[৪] রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে পদ, তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদ-নাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন না, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকুরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সংকল্পপূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়া ছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানবপ্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিগে দৃক্‌পাতো করিতেন না, প্রতিদিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন।

যথা।

''আমায় দেও মা তবিল্‌দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নাই শঙ্করী॥...''

[কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন। সংবাদ প্রভাকর। গুরুবার ১ পৌষ ১২৬০ সাল। ইংরেজি ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৩। শ্রীভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী'। ১৯৫৮। পৃ. ৪৮-৪৯]

এই চারটি নমুনা থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করা যায়।

বিশেষণ—অস্মদ্দেশীয়, অস্মদাদির, এতদ্দেশীয়, তাঁহারদিগের, আমারদিগের।

বহুবচন—মনুষ্যদিগ্যে, ব্যক্তিদিগ্যে, মহাশয়দিগ্যে।

ক্রিয়াপদ—বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি, তৎপ্রকটনে, শিক্ষা করত, মনোযোগিকরণার্থে, ইংরাজী ভাষা প্রচলিতা করণার্থে।

সন্ধিবদ্ধ পদ—নিশ্চিতানিশ্চিত, তত্ত্বাবৎ, বিশেষোপকার, পরমোপকারক বৃহদ্রাজ্যের. ভাষানুশীলনার্থে, এতদ্রূপ।

ইংরাজী শব্দ—মিকানিক ইনষ্টিটিউশন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট।

চলতি বাক্যাংশ—ছাইভস্ম, গোলবালিসে ঠেস, আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম।

অনুপ্রাস ও শ্লেষ—চতুর্থ উদাহরণে প্রথম অনুচ্ছেদের সর্বত্র, ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'দৃক্‌পাতো' (কবি দলের বাঁধনদার এখানে সক্রিয়)।

ঈশ্বর গুপ্তের এইসব গদ্যরচনায় পূর্ণ বিরতির অভাব, দীর্ঘবাক্যের বাহুল্য, তরল উচ্ছ্বাস, অনুপ্রাসের আধিক্য সহজেই চোখে পড়ে। চতুর্থ উদাহরণে ঈশ্বর গুপ্ত 'পদ' 'বিপদ' ও 'দ্বিপদ' শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। এ কেবল শব্দচাতুরী, গদ্যের বাঁধুনি ও সংযম এখানে নেই। এগুলি তাঁর ভাষারীতির দোষ। কিন্তু এই ভাষার গতি দ্রুত, চাল হাল্কা, প্রকৃতি আটপৌরে। আসলে এ হল সাংবাদিকের ভাষা। দ্রুত লিখনের দোষ গুণ এখানে সমভাবে বর্তমান।

ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক গদ্য বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক গদ্যের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। গদ্যভাষা নমনীয়তা ক্ষিপ্রচারিতা ও লঘুতার দ্বারা সর্বজনব্যবহারযোগ্যতা এবং শব্দের আভিধানিক অচলতা থেকে মুক্তি ও নিত্য নূতন শব্দ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সর্বকার্য্যে ব্যবহারযোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক ভাষার সার্থকতা।

"সাংবাদিকতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নয় সত্য, কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাংক, ভূমিকা)। এই সত্যের পরিচয়স্থল ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা। ঈশ্বর গুপ্ত না এলে সাহিত্যিক গদ্যের শিল্পী বিদ্যাসাগরের আগমন ত্বরান্বিত হ'ত না। "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী" বিদ্যাসাগরের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত।

৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২৯—১৮৯০) বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্য-শিল্পী। সংস্কৃত গদ্যরীতির সহিত তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। তবু তিনি সংস্কৃত গদ্যরীতির অন্ধ অনুসরণ করেন নি। সংস্কৃত গদ্যরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাণভট্টের কাদম্বরীর গদ্য। তা দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্য। বিদ্যাসাগর এই সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি পল্লবিত সমাসপটলযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ ছেদপ্রয়োজনহীন ধ্বনিতরঙ্গমুখরিত গদ্য লেখেন নি। তিনি সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষে এই আধুনিক শিল্পচেতনা কম কথা নয়।

বিদ্যাসাগরের সামনে সংস্কৃত গদ্যের দুটি রীতি ছিল,—গৌড়ীরীতি ও বৈদর্ভী রীতি। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে গৌড়ী রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে —'শ্লেষপ্রায়মুদীচোষু গৌড়েষক্ষরডম্বরম্'। শ্লেষ ও অক্ষরডম্বর গৌড়ী রীতির মূল কথা। আর বৈদর্ভী রীতির বর্ণনায় বলা হয়েছে—

'শ্লেষ প্রসাদঃসমতা মাধুর্যং সুকুমারতা, অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিঃ সমাধয়ঃ। ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণাঃ দশগুণাঃ স্মৃতা॥' বৈদর্ভী রীতির দশটি গুণ—শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, ঔদার্য, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যরীতির এই আদর্শ পরিহার করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ সমাসবহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করলেন, পদগুলির মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করলেন, ছেদচিহ্ন প্রয়োগ করে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশ (ক্লজ) সৃষ্টি করলেন, ক্রিয়ারূপে ও শব্দে সরলতা আনলেন, অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমণ্ডল সৃষ্টি করলেন।

বিদ্যাসাগর গদ্যরচনার আধুনিক আদর্শ কোথা থেকে আনলেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—ইংরেজি গদ্যের আদর্শ থেকে। ম্যাথু আর্নল্ড-কথিত

গদ্যের আদর্শ তাঁর লক্ষ্য—'The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance'. ঋজুতা, ভারসাম্য, যাথার্থ্য, শৃঙ্খলা গদ্যের অম্বিষ্ট: এই বিশ্বাসের দ্বারা বিদ্যাসাগর চালিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী এই অর্থে যে, তিনি বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো কী হওয়া উচিত তা স্থির করেন এবং চলতি গদ্যের সম্ভাবনা কতটা আছে তা নিয়ে পরীক্ষা চালান। বেনামীতে যে বইগুলি লেখেন তাতে তিনি প্রচুর দেশী-বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চরিত্র; তাঁর চরিত্রে ভারতীয় ও ইওরোপীয় জাতির যাবতীয় গুণের প্রকাশ ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনায় তার প্রতিফলন অনায়াসলক্ষণীয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক ইওরোপীয় মনোবৃত্তিসুলভ যুক্তিনিষ্ঠা ও পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা: এই দুয়ের মিলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরী স্টাইলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কান ও প্রাণের যে সাধনায় অমিতাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যাসাগর সে সাধনায় বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও গতিবেগ আবিষ্কার করেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠী যে ফরমায়েসি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, তা প্রাণহীন আড়ষ্ট গদ্য রচনা। তাঁদের সামনে কোনো আদর্শ ছিল না, নিজস্ব কথা কিছু ছিল না, কোনো অন্তরুদ্ধ সঞ্চিত আবেগ প্রকাশ-ব্যাকুলতায় তাঁদেরকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে নি। সমাজ ও সাহিত্যের এক বিশৃঙ্খল লগ্নে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের এক নোতুন অজানা রাজ্যে—গদ্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করলেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যে অনুবাদকর্ম বাংলা সাহিত্যে হয়েছিল, তা সবই পদ্যে,—পয়ার ও ত্রিপদীর ধীর মন্থরগতি ছন্দে তা বিধৃত। এই নোতুন পথে—বাংলা গদ্যপথে—অনভ্যস্ত লেখকরা পৌরাণিক পদ্যানুবাদের লাঠি হাতে নিয়ে চলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বহু-বিসর্পিত অনিয়ন্ত্রিত-বিস্তার সংস্কৃতানুগ বাক্যগঠনরীতির লম্বা কোঁচায় পা আটকিয়ে বারে বারে আছাড় খেলেন। তাঁদের রচনারীতিতে অপটু শব্দনির্বাচন, ভারসাম্যচ্যুত বাক্যবিন্যাস ও অনভ্যস্ত রচনাভঙ্গিতে দুর্গমপথযাত্রীর গলদ্‌ঘর্ম-সচেষ্টতাই প্রকটিত হয়েছে। পদ্যানুবাদের সাবলীল সোৎসাহ প্রথানুবর্তন গদ্যানুবাদের অন্তঃপ্রেরণার সমর্থনহীন আড়ষ্ট গতিভঙ্গিতে পর্যবসিত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর-পূর্ববর্তী এই তিন লেখক বাংলা গদ্যকে ভারবহনপটু, দুরূহ-চিন্তা-প্রকাশক্ষম ও বিন্যস্ত করে তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাংবাদিকসুলভ গদ্যে এলো নমনীয়তা ও ক্ষিপ্রচারিতা, সর্বকার্যে ব্যবহারযোগ্যতা ও সর্বজনব্যবহারযোগ্যতা। এর পর এলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর দেখালেন গদ্যচর্চা সাধনার বস্তু, শব্দনির্বাচন সতর্ক শিল্পচেতনা-নির্ভর। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্যকে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্যতা দিতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর দিলেন স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য।

সংস্কৃত শব্দ-চয়নে বিদ্যাসাগর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'ভাষার অন্তরে একটি প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। (বিদ্যাসাগর স্মৃতি, ১৩৪৬)

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তা করেছিলেন। অনন্যসাধারণ ধ্বনিবোধ ও ছন্দ বিচার-শক্তি দ্বারা তিনি বাংলা গদ্যের মূল রহস্যটি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাংলা গদ্য-ভাষায় একটি বাক্য কয়েকটি বাক্যাংশের (ক্লজ) সমষ্টি মাত্র, আবার এই বাক্যাংশগুলি শ্বাস-পর্ব (ব্রেথ-গ্রুপ) ও সার্থ-পর্বে (সেন্স-গ্রুপ) বিভক্ত। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক শ্বাস-পব বা সার্থ-পর্ব, বাক্যের পৃথক অঙ্গরূপে, সাধারণ আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত-যুক্ত হয় এবং পর্বের অন্য শব্দের স্বরাঘাত (স্ট্রেস্) বিলুপ্ত হয়। বাংলা ছন্দের মূলে এই সত্যই ক্রিয়াশীল।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সুষম, সাবলীল, শৃঙ্খলাবদ্ধ সাহিত্য-গদ্যে পরিণত করে তোলেন। এ নিয়ে তিনি যে অনেক ভেবেছিলেন, তার প্রমাণ, তদ্রচিত গ্রন্থগুলির সংস্করণগুলি। প্রতি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ সমূহে বিরাম-

চিহ্নের উত্তরোত্তর বহুল প্রয়োগ, সম্বোধনপদের পরিবর্তন, ক্রিয়ারূপের সরলতা ও পদান্বয়ের সংস্কার সাধনে তিনি শিল্পসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অধীন বাক্যাংশগুলির সংখ্যা হ্রাস করেন, সুদীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কমিয়ে ফেলেন, শ্বাস-পর্বানুসারে বাক্যাংশ ব্যবহার করেন, বাক্যাংশগুলি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ও অর্থ সাপেক্ষরূপে ব্যবহার করেন, অর্থানুসারে কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করেন, প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও গদ্যের সাবলীলতা বজায় রাখার জন্য সুললিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন।

গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।... বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা—উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" ('সাধনা' ভাদ্র ১৩০২, চারিত্র পূজা)

বিদ্যাসাগরের গদ্যগ্রন্থের তালিকা এই : (১) বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), (২) বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮), (৩) জীবনচরিত (১৮৪৯), (৪) মহাভারত উপক্রমণিকা ভাগ (১৮৪৯, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৬০), (৫) বোধোদয় (১৮৫১), (৬) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫১, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৫৩), (৭) শকুন্তলা (১৮৫৪), (৮) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫), (৯) কথামালা (১৮৫৬), (১০) চরিতাবলী (১৮৫৬), (১১) সীতার বনবাস (১৮৬০), (১২) আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৪), (১৩) ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), (১৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (প্রথম পুস্তক ১৮৭১, দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৭৩), মৃত্যুর পর প্রকাশিত— (১৫) প্রভাবতীসম্ভাষণ (১৮৬৪, প্রথম প্রকাশ ১৮৯২), (১৬) স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত (প্রথম প্রকাশ ১৮৯১); বেনামীতে—(১৭) অতি অল্প হইল (১৮৭৩), (১৮) আবার অতি অল্প হইত (১৮৭৩), (১৯) ব্রজবিলাস (১৮৮৪), (২০) বিনয়পত্রিকা (১৮৮৪), (২১) রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ক্রমবিবতন ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক উদাহরণ এবার গ্রহণ করা যেতে পারে।

[১] উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ জম্বু দ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

[বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭]

এখানে হ্রস্ব বাক্য, সরল তৎসম শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

[২] বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং

অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস এবং বড হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে। [বোধোদয়, ১৮৫১]

পাঠ্যপুস্তক রূপে এই গ্রন্থের অভূতপূর্ব সমাদর হয়েছিল। বত্রিশ বছরে একাশীটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এখানে বাক্য নির্মাণে, পদবিন্যাসে ও বিরতি-চিহ্ন প্রয়োগে লেখকের উন্নততর নৈপুণ্যের পরিচয় পাই।

[৩] কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া গোতমী লতা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, "বাছা! শুনিলাম, আজি তোমার অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে?" শকুন্তলা কহিলেন, "হাঁ পিসি। আজি বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।" তখন গোতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, "বাছা! সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবনী হয়ে থাক।" অনন্তর লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন, "এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই।" শকুন্তলা কহিলেন, "না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল।" তখন গোতমী কহিলেন, "বাছা। আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে এস কুটিরে যাই।" শকুন্তলা অগত্যা তাহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও 'আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি', এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। [শকুন্তলা ১৮৫৪]

এখানে সম্বোধনে ও প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব শব্দ ও সরল ক্রিয়া-রূপের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়।

[৪] সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এইস্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন।

রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, এই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন

লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

[সীতার বনবাস ১৮৬০]

এই অংশের স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ তৎসম শব্দাবলীর ধ্বনিরোলে কেবল কি পথের পাঁচালীর কিশোর অপু মুগ্ধ হয়েছিল! বাঙালিমাত্রেই শতাব্দীযাবৎ এই ধ্বনিলালিত্য ও শব্দঝংকারে মুগ্ধ হয়েছে।

[৫] স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল। [আখ্যান মঞ্জরী ১ম ভাগ, ১৮৬৩-৬৪]

এই অংশে হ্রস্ব সরল ও যৌগিক বাক্যগঠনে লেখকের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। কমাচিহ্নের বহুল প্রয়োগ থেকে অনুধাবন করা যায় বিদ্যাসাগর অধীন

বাক্যাংশগুলির পারস্পরিক ও অর্থসাপেক্ষ বিন্যাসে কতটা যত্নবান ছিলেন। অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমণ্ডল সৃষ্টিতে তাঁর প্রযত্ন এখানে লক্ষণীয়।

[৬] 'বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এব, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কিনা, জানিতে পারিতেছি না; আর, হয় ত, এত দিনে আমায সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ, কিন্তু, আমি তোমায়, কস্মিনকালেও, বিস্মৃত হইতে পাবিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। [প্রভাবতী সম্ভাষণ, ১৮৬৪]

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বিদ্যাসাগরেব বিশেষ স্নেহভাজন আত্মীয়। রাজকৃষ্ণের শিশুকন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। তার অকালমৃত্যুতে মর্মাহত শোকসন্তপ্ত বিদ্যাসাগরের হৃদয় থেকে যে বেদনা উত্থিত হয়, তারই সাহিত্যরূপ প্রভাবতী সম্ভাষণ। অসহ্য হৃদয়বেদনার বাহনরূপে বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্যকে ব্যবহার করে কতটা কৃতকার্য হয়েছিলেন, প্রভাবতী সম্ভাষণ তারই পবিচায়ক। এই রচনার প্রতিটি বাক্যে মর্মভেদী যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে।

[৭] ফাজিল চালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ বোদ্ধা যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগর লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবিচ্ছিন্ন আনাড়ি তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজী, অতি বিদকুটে, পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায় তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, একথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত তাহা সকলে স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।
['কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত ব্রজবিলাস ১৮৮৪]

এই অংশের স্টাইল চলিত ভাষার স্টাইল। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ প্রয়োগে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এখানে লক্ষণীয়। 'ফাজিল চালাকেরা', 'পছন্দসই', 'আনাড়ি', 'বাবুজী', 'বিদকুটে', 'বেয়াড়া', 'তাকত', 'মজাদার', 'দৌড় কত', 'লেজ নাড়িতেছেন'— প্রভৃতি অনভিজাত শব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগ অনুধাবনযোগ্য। চলিত গদ্যের লঘুরীতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, এই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। শব্দ ব্যবহারে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচায়ক রূপে এই অংশটি অনুধাবনীয়। বিদ্রূপে ঠাট্টায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এই অংশটি ঝক্‌ঝক্ করছে।

[৮] প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা-রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ ক্রোশ ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে ; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে ; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন। [স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত ১৮৯১]

এই অংশের বাক্যগঠন ও পদবিন্যাস পূর্বাপেক্ষা সহজতর। শব্দ প্রয়োগে লেখকের সংস্কারমুক্তি লক্ষণীয় ; ইংরেজী ও তদ্ভব শব্দের অনায়াস ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ে। বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি ও সাবলীলতা লক্ষণীয়।

বিদ্যাসাগর "বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী" : রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বারবার স্মরণযোগ্য। 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য' ও 'গ্রাম্য বর্বরতা' পরিহার করে বাংলা সাধু গদ্যের একটি মধ্যগা রীতির আবিষ্কারক রূপে বিদ্যাসাগর চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, পদবিন্যাসে সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা এনেছিলেন এবং গদ্যরীতির বিচিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। বোধোদয়-কথামালা, শকুন্তলা-সীতার বনবাস, বিতর্ক পুস্তক ও প্রভাবতী সম্ভাষণ : গদ্যের নানা রূপ ও রীতির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের একটি রাজপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন, সে পথে পরবর্তীকালে বহুতর পদাতিকের আগমন হয়েছে। বিদ্যাসাগরের এটাই প্রধান কীর্তি, রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা"।

তাই বলে কি বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি ত্রুটিহীন? তা নয়। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতিকে বলা যায় সৈনিক বা রাজেন্দ্রাণী। বিদ্যাসাগরী ভাষা অশ্রুবেগে আকুল হয়ে কখনও হোঁচট খায় না, প্রস্তর-মসৃণ রাজপথ দিয়ে ব্যূহবদ্ধ সৈনিক-শ্রেণীর মতো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যায়। মানসিক আবেগস্পন্দিত গদ্যের জন্যে আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। আবার তা রাজেন্দ্রাণীর মতো সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত। দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে তাকে ব্যবহার করা যায় না, তা সর্বত্রগামিনী নয়; তা স্থিতিস্থাপক নয়। বাংলা গদ্যভাষায় আবেগধর্মিতা ও স্থিতিস্থাপকতা এলো পরবর্তী পর্বে—বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বিদ্যাসাগরের গদ্যস্টাইলের উপাদান বাংলা ভাষাপ্রকৃতির অনুকূল সংস্কৃত শব্দ; তার বাক্যগঠনরীতি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি গদ্যের অনুসারী। দুয়ে মিলে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি; তা বাংলা গদ্যকে দিয়েছে সৌন্দর্য ও কল্পনাধর্মিতা, বিবরণাত্মক বস্তুনিষ্ঠতা ও সাবয়বতা, ধ্বনিরোল ও ছন্দঃস্পন্দ। বাংলা গদ্যের পরবর্তী ঐশ্বর্যের ভিত্তিভূমি বিদ্যাসাগরী গদ্য।

৮ অক্ষয়কুমার দত্ত

তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকার প্রথম বারো বৎসরের (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক (১৮৪০), নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫৫) অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) বাংলা গদ্যের একজন প্রধান লেখক। তাঁর জীবনদৃষ্টি ও গদ্যরীতির মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, অজ্ঞেয়বাদী। তিনি ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডকে বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নাস্তিক বলতেন।

অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ (সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য)। বিদ্যাসাগরেব সঙ্গে অক্ষয়কুমারের অনেক বিষয়েই মতের মিল ছিল।

অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনা তাঁর মানসিকতার দর্পণ। নিম্নধৃত বিবরণ তাঁর মানসিকতার পরিচায়ক।

"বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে দুইজন প্রতিভাবান্ পুরুষ এক নবযুগ আনিতেছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত—তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন।·· ···অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আবশ্যকতাই স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, 'কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনার দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্‌কালেও শস্যলাভ হয় নাই।' তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তাহা নিম্নলিখিত রূপে দেখাইয়াছিলেন—'পরিশ্রম = শস্য। পরিশ্রম ও প্রার্থনা = শস্য। অতএব, প্রার্থনা = ০।' ·····"

"একবার রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে লিখিতেছেন, (২৬ ফাল্গুন, ১৭৭৫ শক)—'এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।' " [অজিতকুমার চক্রবর্তী-রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', ১৯১৬, পৃ ২৪০-৪১ ॥ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', পরিশিষ্ট ৫৫, ৪র্থ সং, পৃ ৪১১-১২]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করার সময়ে অক্ষয়কুমার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার উপর দুটি ছাত্রপাঠ্য বই লেখেন। এই 'ভূগোল' (১৮৪১) ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথম সংখ্যায় অক্ষয়কুমার লেখেন :

"সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য ব্যক্ত করিবার জন্য সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক।"

অক্ষয়কুমার যুক্তি ও বিজ্ঞান-মনোভাবকে জীবনের প্রধান আশ্রয় বলে জেনেছিলেন। তাঁর গদ্যরীতি এই মনোভাবেরই প্রতিফলন মাত্র।

তাঁর সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

"ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয়সভা' (১৮৫২) বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।" (আত্মচরিত, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

"আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত

আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ! ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।" (তদেব, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

অক্ষয়কুমারের মানস-প্রকৃতির পরিচয় এই দুই মন্তব্যে পাই। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনোবিষয়েই মতের মিল হয় নি, তথাপি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকেই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর "রচনার সৌষ্ঠবে"র জন্য।

এই রচনাসৌষ্ঠব বা গদ্যরীতির পরিচয় গ্রহণ করা যাক। অক্ষয়কুমারের গদ্য কাব্যগুণসমৃদ্ধ ভাববাহী গদ্য নয়, সরস বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বনিসমৃদ্ধ গদ্য নয়, যুক্তিপ্রধান ভারবাহী টেকসই নীরস বস্তুসর্বস্ব গদ্য। তার প্রস্তরকাঠিন্য ও আবেগমুক্ত সত্যদিদৃক্ষা, যাথার্থ্য ও অতি সংহতি, মাধুর্যহীনতা ও শুষ্কতা পাঠকের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগায়। এই গদ্যরীতি পাঠককে দূরে ঠেলে দেয়, কাছে টানে না। তবু সেদিন এই গদ্যরীতির প্রয়োজন ছিল। বিষয়বস্তুর উপযোগিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা এই গদ্যরীতির ছিল; তা বাহুল্যবর্জিত ও যথাযথ, গুরুচিন্তার ভারবহনে সমর্থ। দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞান-চিন্তাকে সরল প্রাঞ্জল গদ্যে প্রকাশের নৈপুণ্য অক্ষয়কুমারের ছিল। তৎসমশব্দবাহুল্য তাঁর গদ্যকে দিয়েছিল প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছচিন্তা ও যুক্তিবিচার এনেছিল কঠিন সারল্য। বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের গদ্যে তাঁদের গদ্যরীতির মাধুর্য ও আবেগ, সরসতা ও নমনীয়তা সঞ্চারিত হয় নি। রাম-মোহন রায় ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিপন্থী গদ্যের গতিহীনতা ও পদান্বয়ের দুর্বলতা অক্ষয়কুমারের গদ্যে ছিল না, কিন্তু পরবর্তী কালের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গদ্যের বৈচিত্র্য, সরসতা ও লালিত্য ছিল না। তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞান-আলোচনার উপযোগী বাংলা গদ্য তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন।

অক্ষয়কুমারের প্রধান বইগুলি হচ্ছে—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই ভাগ ১৮৫১, ১৮৫৩), 'চারু পাঠ' (তিন ভাগ ১৮৫৩, '৫৪, '৫৯), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (দুই ভাগ ১৮৭০, ১৮৮৩)।

এখন অক্ষয়কুমারের গদ্যের কালানুক্রমিক পরিচয় গ্রহণ করি।

[১] নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করিলে যে

প্রকার পর্ব্বতশিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ুপ্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকর অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়াল ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এদেশ পুর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি— এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য্য; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। [শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, ১৮৪৫]

এই অংশের সাবলীলতা ও সারল্য লক্ষণীয়।

[২] বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে, পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধিচালনা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটার একমাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয় রূপ অগ্নিকণা মোহরূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্জলিত হইতে থাকে। [বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১৮৫১]

[৩] পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীকেই ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভে অধিকারী করিয়া

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়; সুখ যে এমন অনির্ব্বচনীয় পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধর্ম্মস্বরূপ মনুজ্যোতি তদপেক্ষা ও শতগুণে উৎকৃষ্ট। [ধর্মনীতি, ১৮৫৫]

[৪] চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদয়ই জড় পদার্থ।

জড় পদার্থ দুই প্রকার: সজীব ও নির্জ্জীব। যাহার জীবন আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস ও মৃত্যু হয় তাহাকে সজীব কহে; যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। আর যাহার জীবন নাই, সুতরাং যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাসাদি হয় না, তাহাকে নির্জ্জীব বলা যায়, যেমন, প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ ইত্যাদি।

যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নির্জ্জীব জড় পদার্থের গুণ ও গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পদার্থ-বিদ্যা। [পদার্থ-বিদ্যা, ১৮৫৬]

উপরিধৃত তিনটি (২, ৩, ৪ সংখ্যক) উদাহরণ অক্ষয়কুমারের যুক্তিপন্থী গদ্যরীতির প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। এই বাহুল্যবর্জিত, যথাযথ, বস্তুসর্বস্ব, গদ্যবর্ণনা বিজ্ঞান ও দর্শন-চিন্তাকে প্রাঞ্জল রূপে উপস্থিত করেছে। তা মাধুর্যবর্জিত হতে পারে, কিন্তু প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

[৫] আহা কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কখনও অনিমেষ ঊর্দ্ধ নয়নে পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোকসমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচন করতঃ ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

[স্বপ্নদর্শন—কীর্ত্তিবিষয়ক, চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৯]

রূপকাবরণের অন্তরালে মানব জীবনের সত্যকে উপস্থিত করার দুরূহ দায়িত্ব এখানে অক্ষয়কুমার অবহেলায় পালন করেছেন। চারুপাঠ

অক্ষয়কুমারের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত বই। বহু বৎসর ধরে এই গ্রন্থ ছাত্রসমাজের ভাষাশিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত চারুপাঠের অংশবিশেষ আমাদের কাছে দুরূহ ঠেকে নি, প্রাঞ্জল বলেই মনে হয়েছিল। এখানেই চারুপাঠের গদ্যরীতির সার্থকতা।

[৬] চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা, বিন্দুধারী ও অতিবড়ী

উৎকল দেশে বিন্দুধারী ও অতিবড়ী নামে দুই প্রকার বৈষ্ণব আছে। ঐ উভয়েই বিগ্রহ-সেবা, মচ্ছব-দান ও অপরাপর অনেক অংশে বাঙ্গলা-দেশীয় গৌড়-বৈষ্ণবদের ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। তিলক সেবা বিষয়ে পরস্পর কিছু বিভিন্নতা থাকাতেই, ঐ দুইটি নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুধারীরা ললাটদেশে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলের কিছু উপবিভাগে গোপীচন্দনের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুধারণ করে এই নিমিত্ত ইহাদের নাম বিন্দুধারী। অতিবড়ীরা নাসাগ্র হইতে কেশের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া থাকে। ইহারা ডোর-কপীন ধারণ করে, মঠধারী ও স্থাপিত বিগ্রহের পূজারী হয় এবং গুরুত্বপদ গ্রহণ পূর্ব্বক কায়স্থাদি নানাবর্ণকে মন্ত্রশিষ্য করিয়া থাকে। উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহারা প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

উৎকল-নিবাসী জগন্নাথ দাস নামে একটি বিরক্ত বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিলক-সেবা বিষয়ে চৈতন্য প্রভুর সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়। তিনি প্রভুর মতে সম্মত হন নাই, এই নিমিত্ত উল্লিখিত প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন, তুমি অহঙ্কার পরবশ হইয়া আমার মতের অন্যথাচরণ করিতেছ; তুমি অতি বড় লোক; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তদবধি ঐ জগন্নাথ দাস ও তাঁহার মতাবলম্বী বৈষ্ণব-দল অতিবড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি উৎকল-ভাষায় শ্রীভাগবত অনুবাদ করেন।

বিন্দুধারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, খণ্ডৈত, কর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক জাতি বিনিবিষ্ট আছে। এই সম্প্রদায়ে শূদ্রজাতীয়েরা ভেক লইয়া ডোর-কপীন ধারণ করে; তদনন্তর তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্যটন করে; করিলে পর, প্রকৃতরূপ বৈষ্ণবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া দেবতা-পূজা ও মন্ত্রোপদেশ-প্রদানে অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণ বিন্দুধারীদের ব্যবহার কিছু ভিন্ন। তাহাদের উক্তরূপ তীর্থভ্রমণাদি করা তাদৃশ আবশ্যক নয়। খণ্ডৈত প্রভৃতি

শূদ্র বিন্দুধারীরা ব্রাহ্মণ শূদ্র নানা জাতিকে শিষ্য করে। [ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, ১৮৭০ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৮, গ্রন্থাংশ, পৃ ২৩১-৩০]

প্রবন্ধ-গদ্যের সবকটি গুণই এখানে বর্তমান। যথাযথ, আবেগবর্জিত, পরিমিত; অলংকার-বিশেষণ-বর্জিত এই গদ্যরীতির আভিধানিক স্পষ্টতা ও ঋজুতা লক্ষণীয়। এই গদ্যাংশের শিরোনাম-বিভক্ত বিষয়বিন্যাস ও অনুচ্ছেদ-রচনাপদ্ধতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমগ্র গ্রন্থটিই এইভাবে বিন্যস্ত। চিন্তার সুশৃঙ্খল বিস্তার ও নির্মোহ যুক্তি-অনুসৃতি প্রবন্ধ-গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য অক্ষয়কুমারকে বাংলায় প্রবন্ধ-গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী বলা যায়।

[৭] এ বিষয়ের বৈদিক প্রমাণ যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, তাহার ফলিতার্থ এই যে, ঋগ্বেদসংহিতানুসারে, আদিত্য-বিশেষ বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য উদয়-কালে উদয়গিরিতে, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্ত-কালে অস্ত-গমন-স্থলে পদ-বিক্ষেপ করেন; আর শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে, যজ্ঞ-স্বরূপ বামন-রূপী বিষ্ণু কৌশলক্রমে অসুরগণকে ছলনাপূর্ব্বক অবনিমণ্ডল অধিকার করিয়া লন। এই সৌর-কীর্ত্তি ও যজ্ঞ-মহিমা-প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বৈকুণ্ঠ-বাসী পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতার-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাখ্যানই উদ্ভাবিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে তাহা সুপ্রসিদ্ধই আছে, অতএব বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর লিখিত হইল না। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তদশ অবধি ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের আটচল্লিশ ও উনপঞ্চাশ অধ্যায় এবং বামনপুরাণের পঁচাত্তর অধ্যায় পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। সেই উপাখ্যানের মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিষ্ণুর অভেদ প্রতিপাদন উদ্দেশে একটি কৌশলও প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক বিষ্ণু আদিত্য-বিশেষ। বামন-রূপী পৌরাণিক বিষ্ণু অদিতির পুত্র; সুতরাং তিনিও আদিত্য। ইহা হইলে, উভয় বিষ্ণুতে এ অংশে সুন্দর ঐক্য রহিয়া যায়। [ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৮৩ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৭, উপক্রমণিকা-অংশ, পৃ ২৫৩]

এখানে বৈদিক বিষ্ণু ও পৌরাণিক বিষ্ণুর স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করা হয়েছে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব বিচারে অক্ষয়কুমারের নৈপুণ্য এখানে প্রকাশিত; সেইসঙ্গে দুরূহ বিষয়কে সরল ও যথাযথরূপে উপস্থাপনের কৃতিত্বও ব্যক্ত

হয়েছে। যুক্তি ও বিচারপদ্ধতির অনুসরণ করে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার একাগ্রতাও লক্ষণীয়। এই অংশের গদ্যরীতি এই বিচারপদ্ধতির যোগ্যবাহন। গাণিতিক যুক্তিবদ্ধতা, আভিধানিক স্পষ্টতা ও বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা এই গদ্যের মূল কথা। সে-কারণেই এই গদ্য আতিশয্যবর্জিত, অনলংকৃত, দ্ব্যর্থহীন ও ঋজু। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ-গদ্যের এই সব গুণ লেখকের বিজ্ঞানী মনেরই প্রতিফলন।

অক্ষয়কুমারের গদ্য ইন্‌টেলেক্‌টের গদ্য, ইমোশনের গদ্য নয়। বিদ্যাসাগরের গদ্যকে বলা যায় কথা-গদ্য, তাতে আছে আবেগ, সরসতা, সাহিত্যগুণ। তাতে লেগেছে ব্যক্তিগত হৃদয়বেদনা ও কল্পনার ছোঁয়াচ। ধ্বনিরোল ও ছন্দঃস্পন্দ, অলংকার ও বিশেষণ বিদ্যাসাগরের গদ্যে আছে, কারণ কথাসাহিত্যের গদ্যের তা আবশ্যকীয় উপাদান। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে (বিদ্যাসাগর চরিত, ১৩০২) এই সত্যেরই ইঙ্গিত পাই (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অক্ষয়কুমারের গদ্যকে বলা যায় চিন্তার গদ্য বা প্রবন্ধ-গদ্য। তা অলংকার ও বিশেষণ বর্জিত ; তা বস্তুসর্বস্ব, যথাযথ, আবেগবর্জিত ও পরিমিত। অক্ষয়-কুমারের গদ্যে আভিধানিক স্পষ্টতা ও সারল্য অনায়াসলক্ষণীয়। যুক্তি ও বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করে অক্ষয়কুমার প্রবন্ধ লিখেছেন। 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত চতুর্থ উদাহরণে গাণিতিক শৃঙ্খলা ও যুক্তিবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে ভাষা দ্ব্যর্থহীন, আতিশয্যবর্জিত, অনলংকৃত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের শিরোনাম-বিভক্ত বিষয়বিন্যাস ও অনুচ্ছেদ রচনার পদ্ধতি অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক মনের পরিচায়ক, চিন্তার সুশৃঙ্খল বিস্তারের দ্যোতক। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বিশেষণ অক্ষয়কুমারকে আকৃষ্ট করে নি। নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক নির্বিকার আবেগহীন ভঙ্গিতে অক্ষয়কুমার দুরূহ দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তাকে সরল ও যথাযথরূপে উপস্থাপনেই রচনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রবন্ধ-গদ্য পরবর্তী সকল প্রবন্ধলেখককে প্রভাবিত করেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তার শিষ্যবৃন্দ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রবন্ধ-গদ্যকে আশ্রয় করে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ব্যক্তির চিন্তাকে বিশ্বনীতির সঙ্গে, সমাজের গতিকে প্রাকৃতিক নীতিনিয়মের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ার ইচ্ছা এই প্রবন্ধ-গদ্যরীতির অন্তরালে ক্রিয়াশীল। অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতিতে তার সূচনা। পরবর্তী অনুসৃতিতেই তার সার্থকতা।

৯ | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু কলেজের ছাত্র, মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার লেখক, আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় কর্মী রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' নামধেয় পুস্তকে (১৮৭৮) লিখেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই একই সময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।" (পৃ ৬৫)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকা প্রকাশে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) অক্ষয় কীর্তি। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্র-নাথ—এই তিনজন আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম বিশিষ্ট লেখক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে (পঞ্চ সদস্য বিশিষ্ট গ্রন্থাধ্যক্ষ সমিতি) এঁরা ছাড়া কোনো-না-কোনো সময়ে সদস্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ রায়। তত্ত্ববোধিনী সভার অধি-বেশনে দেবেন্দ্রনাথ যে-সকল ভাষণ দেন, সেগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের বেদী থেকে তিনি সে সকল উপদেশ-ভাষণ দেন, সেগুলিও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বসুর যে গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

"বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষু সমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত, তাহা বলা যায় না।" (পৃ ৬৫)

দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত গ্রন্থের তালিকা: ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ (১৮৪৯), আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা (১৮৫১), ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), দুভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে বক্তৃতা (১৮৬৯), কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬০, ১৮৬৬), তাৎপর্য-যুক্ত সমগ্র 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ (১৮৬৯), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), আত্মজীবনী (১৮৯৮; রচনা ১৮১৬ শক, ১৮৯৪ খৃ)। বাংলা গদ্যে ঋগ্বেদের অনুবাদে সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর কয়েকটি বাক্য বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত হয়েছে। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ"—এই বাক্যটি বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থে (১৮৫১) স্থান দেন। 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়'—এই বাক্যটি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে (১৮৫৭) প্রথম ব্যবহার করেন।

দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনা কালবিচারে দুটি ভাগে বিভক্ত—ধর্ম ব্যাখ্যান-মূলক রচনা ও আত্মজীবনী। ধর্মব্যাখ্যানমূলক রচনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি এগুলি লেখেন। আত্মজীবনী প্রায় সমগ্র বঙ্কিমরচনা প্রকাশের পরে রচিত ও প্রকাশিত তথাপি বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের (১৮৭৫) রচনাগুলি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৩-৭৫ খৃষ্টাব্দ)। কমলাকান্তের দপ্তর আত্মভাবনামূলক রচনা, এর ভঙ্গি আত্মকথনের ভঙ্গি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই আত্মকথন ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মব্যাখ্যান ও আত্মজীবনী, উভয়ত্রই আত্মোপলব্ধি ও আত্মমগ্নতার সুরটি লক্ষণীয়, যদিচ ধর্মব্যাখ্যান নিভৃতচিন্তা নয়, সরব প্রকাশ্যচিন্তা, কারণ বক্তার উদ্দিষ্ট ছিল উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলী। তবুও একথা স্বীকার্য, দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনায় আত্মমগ্নতার সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে।

দেবেন্দ্রনাথের দুই প্রধান সহযোগী অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর। অক্ষয়-কুমারের মানসিকতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বিদ্যাসাগরের

অনেক রচনাই সমাজ কল্যাণে উদ্দিষ্ট—কথামালা, বোধোদয় বা বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের দৃষ্টি বহির্মুখী ও সুর নৈর্ব্যক্তিক, প্রভাবতী-সম্ভাষণ বা স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিতের আত্মমগ্নতার সুরটি তাঁর রচনায় গৌণ স্থান অধিকার করেছে। আর বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সচেতন সাহিত্যচর্চার ফল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি স্বকীয় পদ্ধতি, কিন্তু তা বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির কাঠামোকে আশ্রয় করেছে। ভাবমগ্নতা বা আত্মকথনভঙ্গি দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বিদ্যাসাগর যুক্তি তর্ক বিচারের মধ্যে জীবনমূল্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, অক্ষয়কুমার নৈতিকতা ও বিজ্ঞানসত্যে তাকে পেতে চেয়েছেন, আর দেবেন্দ্রনাথ গভীর ধর্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে জীবনসত্যে উপনীত হয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের হাতে সাধু বাংলা গদ্য যে নিশ্চিত রূপ লাভ করেছিল, তারই উপর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মভাবনাশ্রয়ী রচনাকে দাঁড় করিয়েছেন। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-গদ্যের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের লেখায় নেই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করেছেন। নিসর্গরূপবর্ণনায়, ভ্রমণ-আনন্দের শব্দচিত্র অংকনে ও গভীর আত্মোপলব্ধির ভাষারূপদানে ভাবুক দেবেন্দ্রনাথ উৎসুক ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর রচনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, তাঁর ধর্মব্যাকুলতার কাছে সচেতন শিল্পভাবনা গৌণ হয়ে গেছে।

এবার দেবেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি ও আত্মমগ্ন রূপটি আমরা উদাহরণের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারি। সহজ সরল ধর্মব্যাকুল ব্যক্তিত্বের নিরাভরণ প্রকাশ রূপেই দেবেন্দ্রনাথের রচনা বিচার্য। এই রচনারীতি সাবলীল, আবেগধর্মী, বেগবতী ও কাব্যগুণসমৃদ্ধ। ধ্যানমগ্ন মহর্ষি ও হাস্যোজ্জ্বল পরিহাসরসিক ভ্রমণকারী—এ দুয়ের মধ্যে কোথাও ব্যবধান নেই,—আত্মজীবনীই তার পরিচয়স্থল। আর ব্রাহ্মধর্মোপদেষ্টা দেবেন্দ্রনাথ শ্রোতৃ-মণ্ডলী থেকে দূরবর্তী নন, কোমল ধর্মবিশ্বাস ও সহজ যুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি আপন ঈশ্বর-ব্যাকুল হৃদয়কেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি শুষ্ক উপদেষ্টা নন, সুরসিক বন্ধু রূপে দেখা দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনাভঙ্গি প্রত্যক্ষ, খুঁটি-নাটিতে পূর্ণ; বৈচিত্র্যে তা মনোরম, হাস্য পরিহাসে তা কোমল ও স্নিগ্ধ।

মাত্র চারটি উদাহরণেই দেবেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পরিচয়টি আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

[১] ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীবেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরযুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতি দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়।...... ..সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়। সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়! তাহা হইতে উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই 'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।' তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? 'যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি।' যিনি

চন্দ্রতারকে থাকিয়া—চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না; চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর, তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়। [ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ১৮৬০, প্রথম প্রকরণ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যান]

এখানে ছন্দঃস্পন্দী আবেগধর্মী গদ্যরীতিতে আত্মমগ্ন লেখক-হৃদয়ের ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

[২] এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, একমাত্র অনাদ্যন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল, তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞানজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন! সেই সময়কার কি গহন গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক দর্শন করি—তখন একটি গ্রহ, একটি তারাও তার নয়ন-গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ; কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভূ সনাতন পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভব করি, কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্যজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন। সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা সর্বম-সৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চিররজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধ চির-রজনী ভেদ করিয়া নবপ্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল। কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্বিদিক উজ্জ্বল করিল। [তদেব, ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান]

বিষয়-গাম্ভীর্য অনুযায়ী এখানে ভাষাও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মূলতঃ বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির কাঠামোকে আশ্রয় করে দেবেন্দ্রনাথ এই গাম্ভীর্যপূর্ণ তৎসম শব্দের ধ্বনিরোল-মুখরিত গদ্যরীতি গড়ে তুলেছেন। সাধু গদ্যকে এখানে তিনি আপন প্রয়োজনে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। গদ্যশিল্পীর পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

[৩] গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে; তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ

আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম; এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। তখন আমি জানিলাম যে, আমি অসহায় নহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়। যখন তাঁহাকে আমি না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া ঘুরিতেছিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার ভাল চক্ষু, জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিলেন। এত দিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে আমি জানিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম। [আত্মজীবনী, ১৮৯৮, একাদশ পরিচ্ছেদ; ৪র্থ সং, ১৯৬২, পৃ' ৫৭-৫৮]

দেবেন্দ্রনাথের আত্মভাবনাধর্মী গদ্যের অন্তরালে যে গভীর জ্ঞান ও ধর্মোপলব্ধি ক্রিয়াশীল, তা তাঁর গদ্যকে অসংযত বল্গাহীন হতে দেয় নি। মনে হয় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি সাধু গদ্যরীতির শব্দঝংকারে বেজে উঠেছে।

[৪] আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান এলোমেলো গাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতলায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখনো কখনো তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভালবাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কে কোথায় উড়িয়া যাইত। একজন একদিন আমাকে বারণ করিল, 'অমন করিবেন না, উহারা বড় দুষ্ট। যদি ঠোকর

আরে তো একেবারে চোকে ঠোকর মারিবে।' একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবিরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে: নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা। এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে।

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল। [তদেব, দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ ১৮৭-৮৯]

এখানে দেবেন্দ্রনাথের গদ্য গীতিকবিতার চূড়াকে স্পর্শ করেছে—নিসর্গ-সৌন্দর্যের শিল্পরূপ আত্মভাবনাধর্মী গদ্যে শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। বনভূমির বসন্ত-আমন্ত্রণ যে লেখকের অন্তরোত্থিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা সাধুগদ্যে নিসর্গ সৌন্দর্য সম্ভোগের আনন্দ প্রকাশে দেবেন্দ্রনাথ বিরল দক্ষতা দেখিয়েছেন।

আর-একটি কথা গদ্যশিল্পী দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের পূর্বসূত্র দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ও 'আত্মজীবনী'তে সন্ধান করলে তার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না।

১০ | দুটি অবজ্ঞাত লেখক

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে কিছু কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য বাংলা গদ্যের রীতিমত চর্চা শুরু হল। কোনো অন্তঃপ্রেরণা থেকে গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয় নি, নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে এর শুরু। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ ছাড়া মাত্র কয়েকজন গদ্যলেখকের নাম করা সম্ভব। ১৮০১ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ : এই তিরিশ বছরের উল্লেখ্য বাঙালি গদ্যলেখক হলেন : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায়, গৌরমোহন বিদ্যালংকার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষোক্ত জন ছাড়া বাকি সকলেরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত থেকে বাংলায় গদ্যানুবাদ। এই অনুবাদকর্মে তাঁরা খুব-একটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ গদ্য ও গদ্যানুবাদের কোনো আদর্শ তাঁদের সামনে ছিল না। সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণের গদ্যানুবাদে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের না ছিল অন্তঃপ্রেরণা, না ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা। ফলে অনুবাদ হয়েছিল আড়ষ্ট, স্বভাববিরুদ্ধ ও হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-জাতীয় মন্থরগতি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম গদ্যলেখক যিনি বাংলা গদ্যকে ইংরেজি গদ্যের আদর্শে নির্মাণ করেন ও সংস্কৃত বাক্যরচনাদর্শ বর্জন করেন। তাঁর হাতেই অপটু গদ্যচর্চার অবসান ঘটে এবং বাংলা গদ্যভাষা বহিঃসৌষ্ঠব ও অন্তঃসামঞ্জস্য লাভ করে সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্য লেখকরূপে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের নাম উল্লেখ্য। এঁরা দুজনেই পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁদের পরই বিদ্যাসাগর—এ কথাই আমরা জেনে এসেছি। এঁরাই বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন।

কিন্তু মাঝে আর-একজন অবজ্ঞাত লেখক আছেন, যিনি কলকাতা থেকে দূরবর্তী পূর্ব-শ্রীহট্টের অধিবাসী ও ইংরেজী ভাষা স্পর্শমুক্ত। তাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র

শিরোমণি। তাঁর একখানি গ্রন্থ "পুরাণবোধোদ্দীপনী" (১৮২৭) কিছুকাল পূর্বে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য আবিষ্কার ও ও সম্পাদন করেছেন। গ্রন্থটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শেষাংশের সারসংকলন ও ভাবানুবাদ। এই গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে আরো তিনখণ্ড অনুবাদ প্রকাশিত হবার সংবাদ লেখক দিয়েছেন, কিন্তু বাংলা গদ্যের দুর্ভাগ্য ঐ তিনখণ্ড আজো অনাবিষ্কৃত। যতীন্দ্রমোহন-সম্পাদিত চতুর্থখণ্ড "পুরাণবোধোদ্দীপনী" বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান ধাপ, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর লেখকদের ও রামমোহন রায়ের ব্যবহারিক কর্মসাধন আর বিদ্যাসাগরের শিল্পজ্ঞানের মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির গদ্যভাষা সংযোজক সেতুরূপে বর্তমান।

বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) গ্রন্থে যে সুষম সুবিন্যস্ত বিরামচিহ্নযুক্ত সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত করলেন, তার ভূমিকারূপে কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির 'পুরাণবোধোদ্দীপনী' (১৮২৭) গ্রন্থকে গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রন্থের পদবিন্যাসকৌশল, ভারসাম্যপটুতা ও বাক্যনির্মাণে পরিমিতিবোধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যভাষার এইসব বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে: বাক্যের পরিধি সংকোচ ও প্রকাশভঙ্গির সুস্পষ্টতার দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, আশ্রিত ক্লজ বা বাক্যাংশের সংখ্যা হ্রাস ও সমগ্রতার মধ্যে তাদের যথাযথ স্থাননির্দেশ, ভারসাম্যবিধান ও বাক্যের সামগ্রিক ঐক্যসাধন। সমস্তটা মিলিয়ে এই ধারণা জন্মে যে, রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পসুষমা-বোধের উপরেই কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির গদ্যের প্রতিষ্ঠা।

তবে একথা স্বীকার্য, বিদ্যাসাগরী গদ্যের শিল্পবোধ ও সাহিত্যিক সুষমা, বহিঃসৌষ্ঠব ও অন্তঃসামঞ্জস্য কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। বাংলা গদ্যের প্রকৃতি অনুধাবনে বিদ্যাসাগর যে শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল না। শ্বাসপর্বানুসারে বাক্যাংশের ব্যবহার ও সেগুলিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অর্থসাপেক্ষ করে তোলা এবং অর্থানুসারে বিরামচিহ্নের সুপ্রচুর প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের গদ্যেই প্রথম দেখা গেল। কৃষ্ণচন্দ্রে যার আভাস, বিদ্যাসাগরে তার প্রতিষ্ঠা।

এখন কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণির গদ্যভাষার নমুনা চয়ন করি। গ্রন্থরচনাশেষে লেখক বিনয় সহকারে যা নিবেদন করেছেন, তা থেকেই এই গদ্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণ অন্তর্গত তিনখণ্ড গৌড়ীয় ভাষায় পুরাণবোধোদ্দীপনী নামে প্রকাশিত হইয়াছে সে গ্রন্থের সহায়ক আমি ছিলাম সমাপন সমুদয় না হওনে আপন নাম লিখি নাই এক্ষণ অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড সমুদয় আমার শ্রমে সমাপন হইল ইহার নাম পূর্ব্ববিধান মতে পুরাণবোধোদ্দীপনী চতুর্থ খণ্ড রাখা গেল অধ্যায় বিজ্ঞগণের গোচর জন্য বিশেষ নিবেদন এই যদিস্যাৎ মদীয় লিবি ভাষায় রচিত বিধায় পণ্ডিতদিগের প্রিয় না হয় তথাচ ভরসা করি যে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ তাঁহার লীলা বর্ণন এ গ্রন্থে প্রচুর ইহা শ্রবণ অবলোকন ও মননে অবশ্য পরমহিতসূচক"।

বিরামচিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও এই অংশের মর্ম সহজেই অনুধাবন করা যায়।

॥ দুই ॥

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : "১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের [এপ্রিল বা মে, ১৮৪৫] একদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, 'গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ্ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সে বার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলাম যে, "আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীস্টান করিবেন না।" কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।" এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল।

ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।"

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে একটি 'তেজস্বী প্রবন্ধ' লেখালেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উত্তেজিত করতে লাগলেন এবং এ-বিষয়ে একটা কিছু করার জন্য আবেদন করলেন। তার ফলে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ শক (২৫শে মে, ১৮৪৫, রবিবার) এক মহতী সভা হল। সেই সভায় হিন্দুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হল। খৃষ্টানদের বিদ্যালয়ে ছেলে না পাঠিয়ে হিন্দুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত হল। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সভাতেই চল্লিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, ব্রজনাথ ধর, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোটা অংকের চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

"এই সভা হইতে হিন্দুহিতার্থী নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত করিল।" (আত্মজীবনী, পরিচ্ছেদ ১৩, পৃঃ ৬২-৬৫, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২)।

আত্মরক্ষার তাগিদে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল হিন্দু, ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভা, এই প্রথম ঐক্যবদ্ধ হল। এই শেষ নয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালযে কলকাতার নাগরিকদের আর-একটি বিরাট সভা হয় (১৫মে, ১৮৫১)। হিন্দু কলেজের অষ্টম শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ও কলেজের (স্কুলের) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র গুরুচরণ সিংহ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের এই দুটি ঘটনা এই সভা আহ্বানের কারণ।

সুতরাং ১৮৪৫-৫৫: এই সময়টি ছিল হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার ও মিশনারীদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের কাল।

এই সময়েই "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। লেখিকা শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স (Hannah Catherine Mullens) ছিলেন লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির কর্মী, তাঁর পিতা পাদ্রি ফ্রাঁসোয়া লাক্রোয়া ছিলেন লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির প্রচারক, স্বামী মিঃ জে ম্যালেন্সও ঐ

সোসাইটির কর্মী। বইটি প্রকাশ করেন ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি। "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নিঃসন্দেহে মিশনরীদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের অঙ্গ। সুতরাং হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এই গ্রন্থকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। মিশনরীদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের দৃঢ় মনোভাব তাঁদের এই গ্রন্থের তাৎপর্য বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-কারণেই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছে। "ফুলমণি ও করুণা" একটি নীতিমূলক কাহিনী, পাত্র-পাত্রীরা বাঙালি খৃষ্টান, কাহিনীর মধ্যে বহুবার বাইবেলের গল্প ও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের একটি নোতুন সংস্করণ (১৯৫৭) প্রকাশ করেছেন। লঙ্ সাহেবের বাংলা গ্রন্থ তালিকায় (১৮৫৫) ও মারডক সাহেবের ক্রীশ্চান বাংলা গ্রন্থ তালিকায় (১৮৭০) এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের "ওয়েস্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গলী লিটারেচার" (১৯৩২) গ্রন্থে এবং যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-পত্রিকা'য় (১৩২২ বঙ্গাব্দ) 'ফুলমণি ও করুণা'র উল্লেখ আছে।

"একমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সে যুগে গল্প রচনার রীতি ছিল না। 'নববাবুবিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখকদের সামনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। 'ফুলমণি ও করুণা' ও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রীমতী ম্যলেন্স পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রকাশককে লিখছেন যে, দেশীয় খ্রীষ্টান নারীদের নীতিশিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন: 'It is a book specially intended for Native Christian women. I have endeavoured to show in it the practical influence of Christianity on the various details of domestic life.'

লেখিকার উপরোক্ত উদ্দেশ্যের মধ্যেই উপেক্ষার কারণ পাওয়া যাবে।" (শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', নব সংস্করণ, ১৯৫৭)।

শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স (১৮২৬-৬১) 'বিশ্বাস বিজয়' অর্থাৎ 'খ্রীষ্টধর্মের গভির রীতি প্রকাশার্থ উপাখ্যান' নামে আর একটি বাংলা বই লিখেছিলেন। লেখিকার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'ফুলমণি ও করুণা'র বারোটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। ইংরেজী অনুবাদ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

লেখিকার মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (২৮ নভেম্বর ১৮৬১) শ্রীমতী ম্যালেন্সের মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে মন্তব্য করেছেন :

"Her 'Phulmani and Karuna' has been translated from its exquisite Bengali into every vernacular of India, and has become to the Native Church what "The Pilgrim's Progress' of Bunyan has been to the masses of England." (তদেব)।

বাংলা খ্রীষ্টান প্রচার সাহিত্যে এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বারোটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য ও সহজ সরল সুখপাঠ্য গদ্যরীতির ব্যবহার সত্ত্বেও ধর্মীয় বিরোধের জন্য এই গ্রন্থ গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' যে সমাদর লাভ করেছিল তার চেয়ে বেশি সমাদর 'ফুলমণি ও করুণা'র প্রাপ্য ছিল।

খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বাইবেলের অনুবাদের মাধ্যমে যে বাংলা গদ্য রচনা করতেন, তা বিশেষরূপে আড়ষ্ট ও কৃত্রিমতাপূর্ণ ছিল। তার প্রধান কারণ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ বিদেশী মিশনরীদের বাংলা রচনার প্রয়াস ; দ্বিতীয় কারণ, বাংলা গদ্যভাষার প্রকৃতি না বুঝে বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থের মূল অ-বাংলা ভাষার অন্ধ অনুকরণ। ফলে যে কৃত্রিম ও স্বচ্ছন্দগতিবিহীন বাংলা গদ্য এক শ্রেণীর খৃষ্টান বাংলা রচনায় ব্যবহৃত হত, তা "খৃষ্টানী বাংলা" বলে উপহসিত হত।

খৃষ্টানী বাংলা গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে উদ্ধার করি :

[১] "Forth come and seperate be : and unclean thing touch not : and I will accept you : and you shall be my sons and daughters : thus says the Almighty God"

কেরীর অনুবাদ (মদনাবাটি থেকে লিখিত পত্র, ১৩ আগস্ট ১৭৯৫)—

"বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্বশক্ত ভগবান"। (বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৯, ১৯৬৩, পৃ ৮২)

[২] "অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে

তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমারদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।" —কেরী কৃত নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ, ১৮০১ (তদেব, পৃ ৯৭)।

শ্রীমতী ম্যলেন্স 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থে পাত্রপাত্রীর মুখে বাইবেলের যে-সব অংশের অনুবাদ বসিয়েছেন, এইবার তার নমুনা গ্রহণ করি। সত্যবতী ও সাধু নামক দুটি বাঙালি ক্রীশ্চান ভাই-বোন মেমসাহেবের নিকট আপন আপন বাইবেল-চর্চার পরিচয় দিয়েছে।

[১] "তখন সত্যবতী শুদ্ধরূপে এই ২ পদ সকল মুখস্থ বলিতে লাগিল, যথা :

'বালকের গন্তব্য পথে তাহাকে শিক্ষা দেও, তাহাতে সে প্রাচীন হইতে তাহা হইতে বিমুখ হইবে না।' হিতোপদেশ ২২।৬।

'বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে, কিন্তু শাসনদণ্ড দ্বারা তাহা তাহা হইতে দূরে যায়।' হিতোপদেশ ২২।১৫।

'হে বালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তোমার পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা ইহা উপযুক্ত।' ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র ৬।১।*

'যীশু শিশুগণকে দেখিয়া কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তাহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা এমত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী।' মার্ক ১০।১৪।**" (ফুলমণি ও করুণা, পৃ ৯৩)

[২] তখন সাধু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিল, যথা :

'পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয়, সেই জ্ঞানের আরম্ভক, কিন্তু অজ্ঞানেরা বিদ্যা ও উপদেশ তুচ্ছ বোধ করে।' হিতোপদেশ ১।৭।✝

'হে আমার পুত্র, পাপিগণ তোমাকে কুপথে লওয়াইলে তুমি সম্মত হইও না। তাহাদের সহিত সে পথে যাইও না, তাহাদের পথ হইতে তোমার চরণ ফিরাও।' হিতোপদেশ ১।১০, ১৫।

---

* The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesions.

** The Gospel according to St. Maik, New Testatment.

✝ The Proverbs, Old Testament.

'মূর্খ পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও মাতার দুঃখজনক হয়।' হিতোপদেশ ১৭।২৫। [হিতোপদেশ = দি প্রোভার্বস্, ওল্ড টেস্টামেণ্ট]

'আমিই প্রকৃত মেষপালক ; যে জন প্রকৃত মেষপালক, সে মেষের নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করে। আমার মেষগণ আমার রব শুনে ; আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাৎ গমন করে। আমি তাহাদিগকে অনন্ত পরমায়ু দি ; তাহারা কখনো বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে হরণ করিতে পারিবে না।' যোহন ১০।১১, ২৭, ২৮। [যোহন = দি গস্‌পেল অ্যাকর্ডিং টু সেণ্ট জন, নিউ টেস্টামেণ্ট]

'আমি দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তোমরা শাখাস্বরূপ, যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলেতে ফলবান্ হয় ; কিন্তু আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।' যোহন ১৫।৫।" (ফুলমণি ও করুণা, পৃ' ৯৪)

অর্ধ শতাব্দে খ্রীষ্টান মিশনরীদের বাইবেল-অনুবাদ-কর্মে কত উন্নতি হয়েছে, তার পরিচয় কেরী ও শ্রীমতী ম্যালেন্সের অনুবাদকর্মের ভাষার তুলনায় অনুধাবন করা যায়। উইলিয়ম কেরী, জন টমাস জোশুয়া মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়ম ইয়েট্স, জেমস্ ষ্টিওয়ার্ট, জন ম্যাক বাইবেল অনুবাদেব যে ধারা পরিপুষ্ট করেন, শ্রীমতী ম্যালেন্স তা সমৃদ্ধ করেন। পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা শ্রীমতী ম্যালেন্সের অনুবাদের ভাষা নিঃসন্দেহে উন্নত। বাক্যের পরিধি সংকোচ ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতাসাধন, আশ্রিত বাক্যাংশের সংখ্যাহ্রাস ও সমগ্রতার মধ্যে তাদের যথাযথ স্থাননির্দেশ, ভারসাম্য বিধান ও বাক্যের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষা, অর্থানুসারে বিরামচিহ্নের সুপ্রয়োগ, ক্রিয়াপদ ও বিশেষণপদের সরলীকরণে শ্রীমতী ম্যালেন্স কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যস্বীকার্য। তবে এ কথাও স্বীকার, বিদ্যাসাগরের হাতে সাধুবাংলা গদ্য যে স্থায়ী কাঠামো লাভ করে, শ্রীমতী ম্যালেন্সের গদ্যভাষা তারই আশ্রয়ে রচিত। বিদ্যাসাগরের গদ্যের শিল্পবোধ ও সাবলীলতা এখানে অনুপস্থিত, এ কথাও স্বীকার্য।

শ্রীমতী ম্যালেন্সের আসল কৃতিত্ব তাঁর স্বাধীন গদ্যরচনায়। 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থের উপাখ্যান-অংশেই তা পাওয়া যায়।

কলকাতায় জন্ম, কর্ম ও মৃত্যু বলে বাংলা ভাষায় শ্রীমতী ম্যালেন্সের সহজাত অধিকার ছিল। বাংলা ভাষার সযত্ন অনুশীলন তাঁকে দিয়েছিল বাংলা ব্যবহারের যোগ্যতা। খৃষ্টধর্মান্তরিত হিন্দু বাঙালি পরিবারকে নিয়ে সৃজ্যমান

একটি নোতুন সমাজের উপাখ্যান 'ফুলমণি ও করুণা'। শ্রীমতী ম্যালেন্স এই সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছিলেন, এদের সুখদুঃখে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সমাজের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি ছিল। গ্রন্থরচনায় এই মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল; তাই ভাষায় অনাবশ্যকভাবে বৈদেশিকতা আনায় তাঁর উৎসাহ ছিল না।

এই গ্রন্থের ভাষা সাধু ভাষার ছাঁচে ঢালা। এর আধার এক শ বছর পূর্বেকার বাংলা ভাষা। কলকাতার কথ্যভাষার বিশিষ্ট রূপ তিনি গ্রন্থে রক্ষা করেছিলেন। গোঁড়া খৃষ্টান ধর্মপ্রচারিকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙালি সমাজ ও ভাষারূপের বিকৃতি সাধন করেন নি। 'ফুলমণি ও করুণা'র প্রধান গুণ লেখিকার সহানুভূতি; তাঁর ভাষায় এই সহানুভূতির পরিচয় অনায়াসলক্ষণীয়। খৃষ্টান সমাজের ধর্ম ও অনুষ্ঠানগত কতকগুলি শব্দের ব্যবহার এখানে অপরিহার্য, কিন্তু তা পরিবেশের স্বভাবগুণকে বিনষ্ট করে নি। ঘটনাবর্ণনে ও চরিত্রচিত্রণে লেখিকার সহজ কুশলতা দীর্ঘপর্যবেক্ষণ ও সহানুভূতির ফলরূপেই এখানে দেখা দিয়েছে। অভিজ্ঞতানির্ভর ঘটনা ও চরিত্র বিবরণ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী ম্যালেন্সের ভাষায় এই প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতা-গুণ বর্তমান। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষা ফার্সী-শব্দ কণ্টকিত; বাইবেলের অনুবাদ ও পূর্বসূত্র ব্যতীত সমগ্র 'ফুলমণি ও করুণা' কোথাও বিদেশী শব্দ কণ্টকিত নয়। বরং তা সহজ, সরল, অনায়াসগতি। পাঠককে একটি দীর্ঘ মৌলিক উপাখ্যানের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার মতো বেগবান সাবলীল ভাষা লেখিকা ব্যবহার করেছেন। প্রাক্-বঙ্কিম যুগের বাংলা গদ্যে এই কৃতিত্ব পাঠকের প্রশংসা ও বিস্মিত মনোযোগ দাবি করে।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত কাহিনী। গল্পের আকর্ষণ ও ভাষার সাবলীলতা গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। এইবার শ্রীমতী ম্যালেন্সের রচনাকৌশলের পরিচয় গ্রহণ করি।

(১) গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমে চারি পাঁচখানা কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলাম। তাহাদের উঠান অপরিষ্কার এবং তাহাদের সম্মুখে উলঙ্গ বালকেরা কাদা ও ধূলা দিয়া খেলা করত পুত্তলাদি গড়িতেছিল। সেই সকল ঘর যে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের বাসস্থান তাহার একটিও চিহ্ন দেখিলাম না, বরং হিন্দু লোকদের বাটী তাহাদের অপেক্ষা পরিষ্কার ও শোভিত ছিল। এই কারণ আমি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অগ্রে চলিয়া গেলাম।

কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া একটি অতি পরিষ্কার ও পরিপাটী খোলার ঘর দেখিয়া বড় সন্তুষ্টা হইলাম, এবং ঐ ঘর নিবাসিদের পরিচয় লইতে উত্তম সুযোগ পাইলাম; অর্থাৎ আমি দেখিলাম যে ঐ ঘরের নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষের ডালের উপরে এক লোহার ভাঁড ঝুলিতেছে, তাহাতে একটি হরিদ্বর্ণ টিয়া পাখী শিকল দ্বারা বাঁধা থাকাতে কাক সকল তাহাকে চঞ্চুদ্বারা অতিশয় ক্লেশ দিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র আমি পাখিকে ভাঁড় সহিত নামাইয়া উঠানের মধ্যে উপস্থিতা হইলাম। আমার আগমনের শব্দ শুনিয়া এক জন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আইল। তাহার মাথার চুল সুন্দররূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় পরিষ্কার ছিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো এটা কি তোমার পাখী? কাক সকল ইহাকে বড় দুঃখ দেতিছিল, এজন্যে আমি ইহাকে বাটীর ভিতরে আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর করিল, বিবি সাহেব, আপনকার বড় অনুগ্রহ। এ আমার পাখী বটে, আমার পুত্র ভুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে। ইহা বলিয়া সে পক্ষির সকল এলোমেলো পালখগুলিতে হাত বুলাইয়া সমান করিল, এবং বোধ হইল যে পক্ষী তাহার কর্ত্রীকে ভালরূপে চিনিত, কারণ সে তাহাকে না কামড়াইয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করিল। [প্রথম অধ্যায়]

এই অংশের গদ্যরীতি কাল-বিচারে খুবই আধুনিক বলে মনে হয়। আশ্রিতবাক্যাংশেব সংখ্যাহ্রাস ও সমগ্র বাক্যের মধ্যে তাদের যথাযথ নির্দেশ, বাক্যের ভারসাম্য বিধান ও সামগ্রিক ঐক্যরক্ষা ও বিরামচিহ্নের সুপ্রয়োগ এই অংশকে দিয়েছে সাবলীলতা ও সারল্য। সাধু গদ্যভাষার যে কাঠামো বিদ্যাসাগর তৈরি করেছিলেন, তারই আশ্রয়ে লেখিকা বাক্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্যের চাল হাল্কা, গতি দ্রুত, কথ্যভাষার টান অনায়াসলক্ষণীয়।

সহজবোধ্যতা ও বাস্তবানুগামিতা এই ভাষার বৈশিষ্ট্য।

[২] করুণা উত্তর করিল, মেম সাহেব বলি, শুনুন। আজি আমি তাবৎ দিন কিছু খাইতে না পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে ফুলমণির নিকটে দুইটি পয়সা চাহিয়া আনিলাম; পরে তদ্দ্বারা কতকগুলিন ছোট ২ মাছ কিনিয়া রাত্রিতে ইহা রান্ধিব এমত মনে করিয়া সেই মাছ কুটিয়া ধুইয়া রাখিতেছি; এমত সময়ে আমার স্বামী আর দুইজন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে আইল। তাহারা সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে আমার স্বামী বড় রাগান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওগো, ভাত তৈয়ারি আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, চারিটার সময়ে কি ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছ, তুমি তাহা জান না; আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাহিতে আসিয়াছ? খরচের নিমিত্তে তুমি কি পয়সা দিয়াছিলা? সে এই কথা শুনিয়া কোটা মাছের চুপ্‌ড়িকে মাছ সুদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দমাতে ফেলিয়া কহিল, তুই এমত কথা বলিস? আমি যদি পয়সা না দিই, তবে এই মাছ কি প্রকারে আপনার জন্যে যোগাইয়া রাখিয়াছিলি? আমাকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া সে আপন মাতওয়ালা সঙ্গিদের প্রতি ফিরিয়া কহিল, চল ভাই, আজি আমাদের পয়সার অভাব নাই; অতএব এ বেটি যদ্যপি খাইতে না দিল, ভাবনা কি? অন্য স্ত্রীলোকদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি না? এই কথা কহিয়া সে আমাকে অত্যন্ত মারিল, পরে তাহারা সকলে চলিয়া গেল।

আমি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলাম, করুণা, তোমার স্বামী মাছ ফেলিয়া দিলে তুমি কি তাহাকে কিছু কহিলা না? করুণা উত্তর করিল, হাঁ মেম সাহেব, কহিব না কেন? আমি তাহাকে যথেষ্ট গালি দিলাম। এমত কর্ম ও এমত কথা কি সহ্য করা যায়? যে দিনে তাহার কাছে কিছু টাকা কড়ি না থাকে, সে দিনে আমি যাহা দিই তাহা সে চুপ্‌ করিয়া খায়; কিন্তু যখনি চারি পাঁচ আনা উপায় করে, তখনই আমার এই প্রকার দশা হয়। কল্য প্রাতে তাহার নিকটে একটিও পয়সা থাকিবে না, রাত্রের মধ্যেই মদ্যপান ও বেশ্যাগমনাদি দ্বারা সকলি ব্যয় করিবে। [পঞ্চম অধ্যায়]

এই অংশে সংলাপের প্রত্যক্ষতা ও স্বচ্ছন্দতা বিশেষ লক্ষণীয়। সাধু গদ্যাশ্রয়ী সংলাপ প্রায়শই কথ্যভাষার দিকে ঝুঁকেছে। তার পরিচয়, কথ্যভঙ্গিম ক্রিয়াপদ ও তদ্ভব-দেশী শব্দের ব্যবহার। 'আইল'—আসিল; লেখিকা 'এল' থেকে 'আইল' লিখেছেন, 'আসিল' লেখেন নি। করুণার মত্ত স্বামী "কোটা মাছের চুপ্‌ড়িকে মাছ সুদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দমাতে ফেলিয়া দিল"—এই বর্ণনা প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, এবং তদ্ভব-দেশী শব্দ প্রয়োগে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

[৩] তাহার চতুর্দিগের বেড়া নূতন দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল, এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙা লতা উঠিয়াছিল। উঠানের এক পার্শ্বে গোরুর একখানি ঘর দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি গাভি ও বৎস ধীরে ২ জাওনা খাইতেছে। গোশালার ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম।

উঠানের অন্য দিকে পাকশালা ছিল, এবং তাহার দ্বার খোলা থাকাতে আমি দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে তিন চারিটি সুমার্জ্জিত থালা ও ঘটি এবং কএকখান পরিষ্কার পাথরও রাশীকৃত আছে। উঠান সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায় সকল ঘরে রীতি আছে তেমন কোন কোণে জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না; সকল স্থান পরিষ্কার ছিল। দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচির নীচে দশ বারটি চারা গাছ গাম্‌লাতে সাজান দেখিলাম; তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গাঁদা তুলসী গন্ধরাজ ইত্যাদি। একটি অতিসুন্দর চীন গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কুঁড়ি ও ফুল ধরিয়াছিল। [প্রথম অধ্যায়]

ছোট ছোট বাক্য, বিরামচিহ্নযুক্ত নাতিক্ষুদ্র বাক্য, সরল ক্রিয়াপদ, ঋজু বর্ণনাভঙ্গি এই অংশের শব্দচিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

শ্রীমতী ম্যালেন্স যে-সময়ে এই সরল সাবলীল গদ্য লিখেছেন, সেদিন স্থূল গ্রাম্যতা ও দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য গদ্যভাষার স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেছিল। সহজ সরল সুখপাঠ্য ভাষা ব্যবহার করে লেখিকা গদ্যভাষার প্রাণশক্তিকে মুক্তি দিয়েছিলেন, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একথা অবশ্যস্বীকার্য।

১১ তারাশংকর তর্করত্ন

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন তিনি ঐ কলেজের বহু ছাত্রের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারাশংকর ভট্টাচার্য ঐ স্নেহভাজন ছাত্রদের একজন। তারাশংকর সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, পাঁচ-ছয় বৎসর সিনিয়র বৃত্তি ভোগ করেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি পঁচিশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। তারাশংকর তর্করত্ন (১৮৩০-৫৯) অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনুকূল্যে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ (লাইব্রেরিয়ান)-পদ লাভ করেন। পাঁচ বৎসর এই কাজের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই আনুকূল্যে নদীয়া জিলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তিন-চার বৎসর এই চাকুরি করার পরই তাঁর মৃত্যু হয়।

অল্পায়ু জীবনে তারাশংকর তর্করত্ন বাংলা গদ্যের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি মাত্র চারখানি বই লেখেন: 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০। হেয়ার পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ), 'পশ্বাবলী' (১৮৫২। ইংরেজির অনুবাদ), 'কাদম্বরী' (১৮৫৪। সংস্কৃতের অনুবাদ), 'রাসেলাস' (১৮৫৭। ইংরেজির অনুবাদ)। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ তারাশংকরের গদ্যরচনার কাল। এই কালের বাংলা গদ্যচর্চার পরিচয় জানা থাকলে তারাশংকরের কৃতিত্ব বিচার করা সহজ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), মহাভারত উপক্রমণিকা ভাগ (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬)।

অক্ষয়কুমার দত্ত : ভূগোল (১৮৪১), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১৮৫১-৫৩), চারুপাঠ (১৮৫৩-৫৪), ধর্মনীতি (১৮৫৫), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৪৯), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫১)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭)।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়।

১৮৪৭-৫৭ : এই সময় সীমার মধ্যে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের এই তালিকা থেকে প্রমাণ হয়, তারাশংকর তর্করত্ন বিদ্যাসাগরী রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মানসিক ও ব্যক্তিগত নৈকট্য ও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে মানসিক দূরত্বের কারণেই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তারাশংকরের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাঁর গদ্য রচনায় সে-পরিচয় বিধৃত আছে। তারাশংকরের গদ্যরীতির মূল এখানেই।

তারাশংকরের প্রধান কীর্তি কাদম্বরী-অনুবাদ। তাঁর গদ্যরীতিকে বলা হয় কাদম্বরীর রীতি অর্থাৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী গদ্যরীতি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত গদ্যরীতির আশ্রয়ে মানুষ হয়েছিলেন এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বহু সংস্কৃত পণ্ডিতের ধ্যানধারণা ও সাহিত্যচর্চার আশ্রয়ভূমি ছিল সংস্কৃত সাহিত্য। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য এইখানে যে বিদ্যাসাগর কেবল ভাষা নিয়ে চিন্তা করেন নি, তার সঙ্গে কল্পনা যোগ করেছেন। তিনি সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। সে রূপের আদর্শ পেয়েছিলেন ইংরেজি গদ্য থেকে। সংস্কৃত গদ্যের ঐশ্বর্যকে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন কালের উপযোগী করে উপস্থিত করলেন, তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ও গদ্যরীতিটি নিজস্ব।

সংস্কৃত গদ্যরীতি বললে কি বোঝায়? বিদ্যাসাগর-অধ্যায়ে পূর্বেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দেখেছি, সংস্কৃত গদ্যরীতির একটি বিশিষ্ট রূপ দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্য। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টের কাদম্বরী কথাকাব্যে (খৃ ৭ম শতাব্দ) তার সার্থক পরিচয় পাই। কাদম্বরী সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের অতুলনীয় রত্ন; যদি এই একটিমাত্র সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ

থাকত তাহলেও ভারতবর্ষ গদ্যরচনায় গর্ব করতে পারত। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের মতে, 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি', গদ্যরচনাতে কবিদের রচনাশক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় বাণভট্ট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বাণের শব্দ-সম্পদ ও অলংকারশাস্ত্রে পারদর্শিতা দ্বিতীয়রহিত। বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থ একদা ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজের একান্ত প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ এই উক্তি—'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে'। বর্তমান কালের রুচিতে বাণভট্টের দুরূহশব্দবহুল অতিদীর্ঘ সমাসাড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কৃত বর্ণাঢ্য গদ্যরীতি সমর্থনীয় না হতে পারে, কিন্তু সপ্তম শতকের ভারতে এই গ্রন্থ জনসমাদর লাভ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ওয়েবর কাদম্বরী কথাকাব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, বাণের গদ্য একটি মহারণ্য। এতে পথিককে অলংকার-রূপ ঝোপ ঝাড় কেটে কেটে অগ্রসর হতে হয়। এবং এভাবে কিছুদুর এগিয়ে পথিক দুরূহ শব্দরূপ হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়ে ভয়ার্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান কালের এই কটাক্ষ বাণভট্টের যথার্থ মূল্যায়ন নয়। দণ্ডীর মতে, 'ওজঃসমাসাভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্' (কাব্যাদর্শ ১৷৮০)। এই বিচারে বাণভট্ট প্রশংসার্হ। সেদিন শব্দঝংকার, কল্পনাগৌরব, অলংকার-গরিমা, বর্ণ ও ধ্বনি-সমারোহ বাণভট্টের কাদম্বরীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বিদ্যাসাগর-শিষ্য তারাশংকর তর্করত্ন যখন কাদম্বরী অনুবাদ করেন, তাঁকে সেকাল ও একালের রুচিবৈষম্য ও রসভেদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়েছিল, এবিষয়ে সংশয় নেই।

সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে আলোচনা করেছেন, তারমধ্যে প্রধান 'প্রাচীন সাহিত্য'। বিদ্যাসাগর ও তারাশংকর তর্করত্নের পর 'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যের ঐশ্বর্যকে পরীক্ষা করলেন, বিদ্যাসাগরী সাধুভাষার চরমৈশ্বর্য সৃষ্টি করলেন। সংস্কৃত গদ্যের শিল্পী গদ্যচর্চা করতেন আর্টের খাতিরে। আর্ট হিসাবে সে গদ্যের তুলনা নেই। এক একটি বাক্য রচনায় যে নিষ্ঠা ও শিল্পবোধের পরিচয় সংস্কৃত গদ্যকার দিতেন, তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থভুক্ত কাদম্বরীচিত্র-প্রবন্ধে সংস্কৃত গদ্যভাষার এই শিল্পনৈপুণ্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ধ্বনিগাম্ভীর্য, দীর্ঘান্বিত ছন্দঃস্পন্দ, ধ্বনিসজ্জা, স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিকল্লোল, অলংকার, চিত্ররস, ধ্বনিবিস্তার কীভাবে গদ্যকে

শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছিল, বাণভট্টের কাদম্বরী থেকে রবীন্দ্রনাথ তার দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি বিচার করেছেন। তারাশংকর তর্করত্নের গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যরীতির তুলনাত্মক বিচারে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি কাদম্বরীচিত্র প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করি।

"সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই।"

"কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না। তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত; একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরক-হারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

"তা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্‌সর্ট বাজিয়া উঠে—তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবিপণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়; বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়।"

"সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশি; গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—এই জন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহুশোভার বাহুল্য তাহার অঙ্গ নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই

বোধ হয় সর্বদা চলা-ফেরার জন্য সে হয় নাই ; বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক, কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।

সেইজন্য বাণভট্ট যদিও স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই।"

সংস্কৃত গদ্যভাষা, দৈনন্দিন জীবনে তার অব্যবহার ও সর্বজনের আয়ত্তের বাইরে তার স্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা ছিল না এবং সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারে নিযুক্ত ছিল না : এই দুটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গদ্য সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তার দ্বারা সংস্কৃত গদ্যের বিচার করা যায় না : রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য অনুবাদক তারাশংকর তর্করত্নের মনে জাগরূক ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তারাশংকর তর্করত্ন আর একটি বিষয়ে সচেতন ছিলেন—সেকাল ও একালের প্রকৃতি-ভেদ। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন :

"আমরা যে কালে জন্মিয়াছি এ বড়ো ব্যস্ততার কাল ; এখন সকল কথার সমস্তটা বলিবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি কথা-বিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এখন আমাদিগকে কথাসংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন ছিল এখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উল্টা বিদ্যা আবশ্যক হইয়াছে।" (মাঘ, ১৩০৬, প্রদীপ, ১৯০০ খৃ)

সম্রাট হর্ষবর্ধনের (খৃ সপ্তম শতক) সভাপণ্ডিত বাণভট্ট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপনিবেশের (খৃ ঊনবিংশ শতক) প্রজা তারাশংকর তর্করত্ন—এ দুজনের মধ্যে যে বারো শতাব্দীর ব্যবধান, তা কেবল কালগত নয়, রুচিগত ; কেবল বস্তু পরিবেশগত নয়, তা মানসিক ব্যবধান। সেদিন বাণভট্ট গদ্যকে জীবনে সর্বদা-ব্যবহারার্থ নির্মাণ করেন নি, সর্বজনবোধগম্যতাও তাঁর অভিষ্ট ছিল না। তারাশংকর তর্করত্নের গদ্য ও সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্যতা এবং সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি বলেই বাংলা গদ্যে তার অনুসৃতি ঘটল না। অব্যবহিত পরবর্তী গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য

এই দুই যোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং পরবর্তী লেখকদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে সার্থকতা লাভ করেছিল।

তারাশংকর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর জীবদ্দশায় চার বৎসরের মধ্যে চারটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৬ সালে, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৭ সালে, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১, ১৮৭০ ও ১৮৯২ সালে ইহার সপ্তম, একাদশ ও অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই শতকে আরো কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত তারাশংকর তর্করত্নের কাদম্বরী গ্রন্থের ভূমিকা, ১৯৬৩)।

অনুবাদক তারাশংকর সচেতন সদা-অসন্তুষ্ট গদ্যশিল্পী ছিলেন. তার পরিচয় কাদম্বরী-অনুবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের 'বিজ্ঞাপন' (১ম সং—সংবৎ ১৯১১, খৃ ১৮৫৪/২য় সং—সংবৎ ১৯১৩, খৃ ১৮৫৬)। এই 'বিজ্ঞাপন' দুটি অনুবাদক তারাশংকরের অনুবাদ-চিন্তার পরিচায়ক।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে তারাশংকর লিখেছেন .

"সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্যগ্রন্থ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটিমাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে। সংস্কৃত কাদম্বরী পাঠে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার বর্ণনা শুনিলে অথবা পাঠ করিলে সাতিশয় চমৎকৃত হইতে হয়। এই বাঙ্গালা অনুবাদ যে সেইরূপ প্রীতিদায়ক ও চমৎকারজনক হইবেক ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, যে সকল মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এক একবার পাঠ করিলেই সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব ॥ ৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১ ॥"

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে ভাষার সংস্কার সাধনান্তে তারাশংকর লিখেছেন :

"কাদম্বরী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এইবারে কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল স্থান অসংলগ্ন অথবা দুরূহ বোধ হইয়াছিল ঐ সকল স্থান সংলগ্ন ও সহজ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না ॥ ১৫ই বৈশাখ, সংবৎ ১৯১৩ ॥"

তারাশংকর তর্করত্নের গদ্যরচনার কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। অনুবাদকর্মের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় পাই। বাক্যনির্মাণ, পদবিন্যাস ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বাক্যের, বিশেষত দীর্ঘ বাক্যের পদান্বয়-রীতি স্থির করে দিয়েছিলেন। তিনি ছেদচিহ্নের ব্যবহার ও পদান্বয় অনুযায়ী বাক্যের বিশ্লেষণ এমনভাবে করেছেন যাতে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে দূরস্থিত পদের সম্পর্ক সহজে অনুধাবন করা যায়। আর সে-কারণেই তিনি বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থে অজস্র কমা, কোলন, সেমিকোলন ব্যবহার করেন। যতিচিহ্নের আদর্শ ব্যবহার ও পাঠভেদে যতিচিহ্নের কম ও বেশি ব্যবহার বিদ্যাসাগরের রচনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গ্রন্থসমূহের সংস্করণগুলিতে পবিবর্তন ও পরিমার্জন তাঁর শিল্পসচেতনতার স্বাক্ষর বহন করে। বিদ্যাসাগরের সহযোগী অক্ষয়কুমাব দত্ত এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ব্যবহার তাঁর রচনায় প্রথম লক্ষ্য করা যায়। তিনিই নিয়মিতভাবে ছেদচিহ্ন ব্যবহাব করেছেন। তরাশংকর তর্করত্ন পদান্বয় ও ছেদচিহ্নের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করেছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা গদ্যে যতিস্থাপনের পূর্ণতা দেখা গেল বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের রচনায়। তারাশংকর পূর্ণচ্ছেদ, কমা, সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা সুষ্ঠু নয়। পূর্ণচ্ছেদের ভারেই পংক্তিবিন্যাস অনেকক্ষেত্রে দুর্বল হয়েছে। তার ফলে অনুবাদেব ভাষাপ্রবাহে উপলখণ্ডের বাধা দেখা দিয়েছে। ভাষা-স্রোতকে সে-ক্ষেত্রে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছে। সংস্কৃতের দীর্ঘসমাসবদ্ধতা ও পংক্তির সম্পূর্ণতা বাংলা গদ্যভাষায় রক্ষা করা বিপজ্জনক। সে ক্ষেত্রে অনুবাদের মোড় ফিবিয়ে দিতে হয়। তারাশংকর এ কথা জানতেন এবং কাদম্বরীর ভূমিকায় (বিজ্ঞাপনে) তা স্বীকার করে বলেছেন, তাঁর অনুবাদ সংস্কৃত পংক্তি-অনুসারী নয়, ভাবানুসারী। সেজন্য তিনি অনেক বর্ণনার বিস্তৃতিকে ছেঁটে দিয়েছেন, এবং বহু ক্ষেত্রে মূলের সৌন্দর্যকেও ব্যাহত করেছেন। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, তিনি মূলের অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সময় অনুবাদকে দুর্বল করে ফেলেছেন। ফলে যতিস্থাপনের ক্ষেত্রে রীতিমত বিশৃংখলা ঘটেছে, বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটবার পূর্বেই পূর্ণচ্ছেদের উদ্যত দণ্ড তার গতিকে অর্ধসমাপ্তিতে অসহায়ের মতো থেমে যেতে বাধ্য করেছে। নিম্নধৃত গদ্যাংশে এই অসহায়তা ও দুর্বলতা লক্ষণীয় :

"অবন্তিদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভুবনত্রয়ের সর্গস্থিতি-সংহারকারী মহাকালাভিধান ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থিতি করেন। যে স্থানে শিপ্রা নদী তরঙ্গ রূপ ভ্রুকুটী বিস্তারপূর্ব্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। তথায় তারাপীড় নামে মহাযশস্বী তেজস্বী প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন।" (শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত তারাশংকরের কাদম্বরী, কথারম্ভ, পৃ ১৮)।

ক্রিয়াপদের অসংবদ্ধতাও তারাশংকরের অনুবাদে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বাহুল্য বাক্যকে দুর্বল করেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার বহু-আবর্তনে বাক্যের মাধুর্য ও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। যেমন এই অংশে—

"একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকার রূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" (তদেব, উপক্রমণিকা, পৃ ৭)।

এই অংশে একটিমাত্র দীর্ঘবাক্যে পাঁচবার 'হইলে' ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

তারাশংকর সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গী সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। বোধ করি তা সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষণ পদে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়। যেমন,—'প্রীতি অবিচলিত ও চিরস্থায়িনী হউক' (পৃ ১০২), 'রজনী সমাগতা' (পৃ ৩৭), 'নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়' (পৃ ৪০), 'নৃশংসা রাক্ষসী' (পৃ ১৪৮), 'ছিন্নমূলা লতা' (পৃ ১৪২), 'এতাদৃশী দেশকালজ্ঞতা' (পৃ ১২১) [দ্রষ্টব্য শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণ, সম্পাদকের ভূমিকা]।

অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার : অগমন (না যাওয়া-অর্থে), অপবর্গ (মুক্তি অর্থে), অমৃতদীধিতি (চন্দ্র অর্থে), উজ্জলিত (যাহা জলিয়া উঠিয়াছে —এই অর্থে), করেণুকা (হস্তিনী অর্থে), জীবিততৃষ্ণা (জীবনের আকাঙ্ক্ষা অর্থে), ধ্বান্ত (অন্ধকার অর্থে), নির্ম্মমা (অনাসক্তা অর্থে), নিষণ্ণ (উপবিষ্ট অর্থে), বেশবনিতা (বেশ্যা অর্থে), পর্য্যাণ (পশুর পৃষ্ঠে বসিবার আসন

অর্থে), পোতক (শিশু অর্থে), প্রণয় পরিগ্রহ (প্রার্থনা স্বীকার অর্থে), পদবী (পথ অর্থে), মদারোপিত (আমার পোঁতা অর্থে), হসিতচ্ছবি (হাসির শোভা অর্থে) [শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত সংস্করণের 'বিশিষ্ট শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য]।

বর্ণবিন্যাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাক্যাংশ, অধুনা অপ্রচলিত শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে তারাশংকরের রক্ষণশীলতার উদাহরণ অনুবাদে অবিরল [দ্রষ্টব্য তদেব, সম্পাদকের ভূমিকা]।

যতিসংস্থাপন, পদবিন্যাস, শব্দবিন্যাস ও ভাষায় প্রসাদগুণ সৃষ্টিতে তারাশংকরের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের কাদম্বরীকে বলেছেন চিত্রশালা। তারাশংকরের কাদম্বরীকে তা বলা যায় না, কারণ তাঁর অনুবাদ, কাহিনীকে বড়ো করে দেখেছে, বাদ দিয়েছে মূল কাদম্বরীর চিত্রসৌন্দর্য, স্বরবৈচিত্র্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য। তবু তারাশংকরের কাদম্বরীর চিত্রলতা তুচ্ছ নয়। একথা সত্য, কাহিনীত্ব রক্ষাই অনুবাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, মূলের ভাব ও রঙ রাখাই অনুবাদকের প্রধান কাজ, তবু দৃশ্য ও ঘটনাবর্ণনায় তারাশংকর মাঝে মাঝে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্ষাকাল ও শরৎকালের বর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার্য। ছোট ছোট বাক্যে তিনি বর্ষার ছবিটি অংকন করেছেন :

"পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকার। দিবারাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি।"

এই বর্ণনায় মূলের চিত্রসৌন্দর্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য নেই; আছে প্রকাশের সাবলীলতা। দুর্বহ অলংকার ও দীর্ঘ সমাসাড়ম্বর থেকে মুক্ত এই বর্ণনা স্বচ্ছন্দ ও সরল।

মূলের অনুবাদে তারাশংকরের কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব অনুধাবন করা যাবে প্রাসঙ্গিক অংশের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের সঙ্গে তুলনাত্মক বিচারে।

মূল কাদম্বরী, কথামুখ অংশ :

একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি রাজানমাস্থানমণ্ডপগতমঙ্গনাজনবিরুদ্ধেন বামপার্শ্বলম্বিতা

কৌষেয়কেণ সন্নিহিতবিষধরেব চন্দনলতা ভীষণরমণীয়াকৃতি: অবিরলচন্দনা-
নুলেপনধবলিতস্তনতটা উন্মজ্জদৈরাবতকুম্ভমণ্ডলেব মন্দাকিনী চূড়ামনিসংক্রান্ত-
প্রতিবিম্বচ্ছলেন রাজাজ্ঞেব মূর্তিমতী রাজভি: শিরোভিরুহ্যমানা শরদিব
কলহংসধবলম্বরো জামদগ্নপরশুধারেব বশীকৃতসকলরাজমণ্ডলা বিন্ধ্যবনভূমিরিব
বেত্রলতাবতী রাজ্যাধিদেবতেব বিগ্রহিণী প্রতীহারী সমূপসৃত্য ক্ষিতিতল-
নিহিতজানুকরকমলা সবিনয়মব্রবীৎ—দেবদ্বারস্থিতা সুরলোকমারোহতাস্ত্রিশ-
ঙ্কোরিব কুপিত শতমুখহুঙ্কারনিপাতিতা রাজলক্ষ্মীর্দাক্ষিণাপথাদাগতা চণ্ডাল-
কন্যকা পঞ্জরস্থং শুকমাদায় দেবং বিজ্ঞাপয়তি—সকলভুবনতলসর্বরত্নানামুদা-
ধিরিবৈক ভাজনং দেব বিহঙ্গমশ্চায়মাশ্চর্যভূতো নিখিলভুবনতলরত্নমিতি কৃত্বা
দেবপাদমূলমেনমাদায়াগতাহামিচ্ছামি দেবদর্শনসুখমনুভবিতুম ইতি। এতদাকর্ণ্য
দেব: প্রমাণমিত্যুক্ত্বা বিররাম। উপজাতকুতূহলস্তরাজা সমীপবর্তিনাং
রাজ্ঞামবলোক্য মুখানি কো দোষ · প্রবেশ্যতাম্ ইত্যাদিদেশ। অথ প্রতীহারী
নরপতিকথনানন্তরমুত্থায় তাং মাতঙ্গাকুমারীং প্রাবেশয়ৎ॥

তারাশংকরের সংক্ষেপিত পরিবর্জিত ভাবানুবাদ ·

"একদা প্রাতঃকালে আপন অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী আছে। কহিল, মহারাজ সকল রত্নের আকর, এই নিমিত্ত এই পক্ষিরত্ন তদীয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্তী সভাসদগণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, কি হানি আছে লইয়া আইস। প্রতীহারী যে আজ্ঞা বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল।"
(চিন্তাহরণ-সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ ১)

এই অনুবাদ থেকে দেখা যায়, তারাশংকরের লক্ষ্য ছিল কাহিনী অংশে ধারাবাহিকতা রক্ষা। মূলের চিত্রসৌন্দর্য ও ধ্বনিসৌন্দর্য রক্ষায় তিনি যত্নবান হন নি। মূলে বাণভট্ট 'প্রাতঃকাল' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেন নি, 'একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনীদলসম্পূটাভিদি কিঞ্চিন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনী'—এই শ্রুতিসুখকর ধ্বনিরোলসমৃদ্ধ বর্ণবিচিত্র বাক্যাংশে

প্রাতঃকালের ভাবটিকে চিত্ররূপে উপস্থিত করেছেন। তারাশংকর এটিকে পুরোপুরি বর্জন করে একটিমাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করেছেন। এখানে তারাশংকর আমাদের সৌন্দর্য-সৌকুমার্য দেন নি, দিয়েছেন কেবল কাহিনীর স্থূলতা—তথ্য বিবরণ। মূলাংশ চিত্র, অনুবাদ-অংশ নীরস তথ্যবিবৃতি। সংস্কৃত ভাষার স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, বর্ণ বৈভব—কিছুই এখানে নেই।

এই অংশের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ

"তখন ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই, নূতন পদ্মগুলির পত্রপুট একটু খুলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহার আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে।" (কাদম্বরীচিত্র, প্রাচীন সাহিত্য)

মূলাংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"এই বর্ণনার আর-কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়া দেওয়া এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন ডুলাইয়া দেওয়া। একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি—কথার কী মোহ! অনুবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু মাত্র ব্যক্ত হয় যে. তরুণ সূর্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম; কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে কেবলমাত্র ঐ বিশেষ্য-বিশেষণের বিন্যাসে, একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল অনতি-বিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে।····· সকালের বর্ণনায় ·· ·· কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকু বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।' (তদেব)

দ্বিতীয় উদাহরণ : বাণভট্টের কাদম্বরী থেকে—

"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধহংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশচক্রবালে, গজরুধিররক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ, আতপ্তলাক্ষিকতন্তুপাটলাভিঃ, আয়ামনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, পদ্মরাগশলাকাসম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমাণে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে—"

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ :

"একদিন আকাশ যখন প্রভাতসন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মতো রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকিনীপুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে

অবতরণ করিতেছেন, দিক্‌চক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্কুমৃগের মতো একটু পাণ্ডুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে; আর গজরুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত এবং ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্যরশ্মিগুলি ঠিক যেন পদ্মরাগ-শলাকার সম্মার্জনীর ন্যায় গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।"

তারাশংকরের সংক্ষিপ্ত চিত্রবর্জিত ঘটনাবিবৃতিমূলক অনুবাদ:

"একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকার রূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণ রূপ সম্মার্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" (চিন্তাহরণ-সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ ৭)

এই অনুবাদে অসমাপিকাক্রিয়ার বাহুল্য আগেই লক্ষ্য করেছি। বাণভট্টের বর্ণসৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতার পরিচয় তারাশংকরের অনুবাদে নেই। মূলে ভাষার ইন্দ্রজালে প্রভাতের রঙে কবিত্বের রঙ ভাবের রঙ ব্যক্ত হয়েছে। তারাশংকর বর্ণসমারোহ বর্জন করেছেন।

বাণভট্ট কেবল বর্ণসৌন্দর্যবিকাশক্ষমতার অসাধারণ পরিচয় দেন নি, সেইসঙ্গে তার ভাবের রঙ, হৃদয়ের অনুভূতি উপস্থিত করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। নিষ্ঠুর ব্যাধ গাছের উপর চড়ে নীড় থেকে পক্ষিশাবক গুলিকে পাড়ছে।

বাণভট্ট সেই শাবকগুলির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

"কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্‌ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্-বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্‌বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়তইব, প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ:

"কেহ-বা অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটল কান্তি যেন শাল্মলিকুসুমের মতো; কাহারও পদ্মের নূতন পাপড়ির মতো অল্প-অল্প ডানা

উঠিতেছে; কাহারও-বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ, কাহারও-বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ-উন্মুক্ত-মুখ কমলের মতো; কাহারও-বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে—এই-সমস্ত প্রতিকারে-অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক একটি ফলের মতো গ্রহণপূর্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।" (কাদম্বরীচিত্র, প্রাচীন সাহিত্য)।

এই অংশের চিত্রসৌন্দর্য ও ভাবসৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: "ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে, তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে; অথচ কবি তাহা স্পষ্টত হাহুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই। বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।" (তদেব)

এই অংশের তারাশংকর-কৃত অনুবাদ:

"[নৃশংস ব্যাধ] কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিয়া প্রাণসংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।" (চিন্তাহরণ-সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ ৯)

তারাশঙ্করের অনুবাদে শুকশিশুদের বর্ণনায় বর্ণসৌন্দর্য বা করুণার ভাব—কিছু নেই, কেবল সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবৃতি। আসলে তারাশংকর কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন, বর্ণসৌন্দর্য ও ভাবসৌন্দর্য রক্ষায় কিছুমাত্র মনোযোগী ছিলেন না।

তারাশংকর অনুবাদের ভাষার সুগমতা ও সাবলীলতা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। অনুবাদের ভাষাকে "সংলগ্ন ও সহজ" করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত কাদম্বরী পাঠে "অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ" হয়, তা জানতেন, কিন্তু তার উৎস যে বর্ণসৌন্দর্য-ও ভাবসৌন্দর্যময়ী সংস্কৃত ভাষা, তাকে তিনি বর্জন করেছিলেন। হয়ত তিনি অনুভব করেছিলেন, কাদম্বরী কথাকাব্যের ভাবের রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী আধার সংস্কৃত ভাষা; সাধু বাংলা গদ্যে তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেছিলেন, তাই মূল গ্রন্থের ভাষাচিত্রগুলিকে বাদ দিয়ে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সাধু বাংলা গদ্যও যোগ্য ভাষাশিল্পীর হাতে কল্লোলমুখর সমুদ্রের বন্যার মতো উদ্বেল ও বাধাবন্ধমুক্ত হতে পারে, পূর্ণবর্ষা নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হতে পারে, স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষ কাদম্বিনীর মতো বিদ্যুচ্চমকে সুনীল গগনাঙ্গনকে উদ্ভাসিত করে দিতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস

করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের হাতে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু সেদিন (১৮৫৪ খৃ) তারাশঙ্কর তা করেন নি। হয়ত সে সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। তবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সাধু বাংলা গদ্যের কোনো ঝংকার যদি আমরা শুনে থাকি, তা শুনেছি তারাশংকর তর্করত্নের গদ্যে। তারাশংকর বিদ্যাসাগরের দীপ্ত প্রতিভাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, একথা যেমন সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে সংস্কৃতানুসারী গদ্যের চরম উদাহরণরূপে দেখা দিয়েছিল, এও তেমনি সত্য। মূল কাদম্বরীর ধ্বনিসৌন্দর্য ও চিত্রসৌন্দর্যের অনেকটাই তারাশংকরের অনুবাদে বাদ গিয়েছে, কিন্তু সহজ সরল ভাষায়, মূলের আভাস তিনি দিয়েছিলেন; কোনো কোনো স্থানে মূলের গাম্ভীর্য ও শাস্তশ্রী রক্ষা করেছিলেন।

বৈশম্পায়ন শুকের আত্মকাহিনী-বর্ণনায় তারাশংকর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন —প্রথম পরিচ্ছেদ (উপক্রমণিকা) থেকে উদ্ধৃত নিম্নধৃত অংশে তার পরিচয় পাই:

"এমন সময় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড অংশসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পাদক্ষেপ করা কাহার সাধ্য? সেই উত্তপ্ত বালুকায় আমার পা দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে মরিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে, বিধাতার নিকট বারম্বার মরণের প্রার্থনা করিতে হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ হইল।" (চিন্তাহরণ সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ ১১-১২)

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত এই সাবলীল গদ্য তারাশংকরের গদ্যরীতির শিল্পসম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সে সম্ভাবনার সুফল তারাশংকর তর্করত্নের রচনায় দেখা যায় নি, তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব-মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়।

১২ | প্যারীচাঁদ মিত্র

বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির ভিত্তিতে তারাশংকর তর্করত্নের কাদম্বরী অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে তা সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্য ছিল না, এবং সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরী রীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা বিদ্যাসাগরী রীতির সীমাবদ্ধ সামর্থ্যক অতিক্রম করে সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে, সর্বজনবোধগম্যতা ও সর্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা মুখ্যত সমাজহিতায়। তাঁর পাঠ্যপুস্তক, সমাজ সংস্কার-মূলক প্রবন্ধ ও অনুবাদ-কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজকল্যাণ। তবু রস-সাহিত্যের ছিটে-ফোঁটা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। আর এ-কথাও সত্য, বঙ্কিমের উপন্যাস প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির শিক্ষা ও সাহিত্যসম্ভোগের অবলম্বন ছিল বিদ্যাসাগরের রচনা। সৌন্দর্যসৃষ্টি অপেক্ষা সত্য প্রকাশই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 'বোধোদয়' 'সীতার বনবাস' পড়ে সেদিনের বাঙালি মাত্রেই তৃপ্তি পেয়েছিল। 'সীতার বনবাস'-এর ভাষা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ভাষার সাক্ষাৎ পূর্বসূরী, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সংবাদপ্রভাকরে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করছেন, তখনি তারাশংকর তর্করত্ন কাদম্বরী অনুবাদ প্রকাশ করছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলা অনুবাদ প্রকাশ করছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত চারুপাঠ লিখছেন। সেই সময়েই প্যারীচাঁদ মিত্র তৎ-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'য় (১৮৫৫ খৃ) ধারাবাহিক কিস্তিতে 'আলালের ঘরের দুলাল' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৮৫৮) প্রকাশ করছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬) তখনো প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১৮৪৯) ও 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫১) বেরিয়েছে। গদ্যচর্চার নানা বিচিত্র প্রয়াস একই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। এই

সব বিচিত্র প্রয়াসের পটভূমি বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে-গদ্য লিখতেন, তা বিদ্যাসাগরী গদ্য-রীতির পূর্বকার গদ্যরীতি, সে রচনা উৎকট, দুরুচ্চার্য, পণ্ডিতী গদ্য—এমন-কি তাঁর সাহিত্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুপ্রাসপ্রিয়তাকে তা ছাড়িয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কালের (১৮৫৩-৫৬) গদ্যের নমুনা পাই ললিতা তথা মানস, গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তকে (দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)। বঙ্কিমের হাতে সাহিত্যগুণমণ্ডিত গদ্য দেখা গেল দুর্গেশনন্দিনী-তে (১৮৬৫) ; তা বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি-আশ্রয়ী।

বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি, তারাশংকরের কাদম্বরী (১৮৫৪) ও প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে-আলোচনা করেছেন, তা এখানে বিবেচ্য। এই আলোচনা থেকেই আলালী রীতি ও বঙ্কিমী রীতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে তুলে নিতে পারব।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি বক্তব্য এখানে উদ্ধার করি।

[১] "প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।· · · · · যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। · · · · আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতে প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানু-সারিণী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরী অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় উপযুক্ত ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা

দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।"

[২] এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত। ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ণ করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।...

...অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায় অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদ বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয় আরো উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" ['বাঙ্গালা ভাষা'' 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ]

[৩] "অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবে না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী

থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।" [বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, 'প্রচার', মাঘ ১২৯১, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনটি বক্তব্য প্রণিধান করলে দেখা যায়, সরলতা ও স্পষ্টতা রচনার তথা গদ্যরীতির চরম লক্ষ্য বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী ধারণ করেন। সৌন্দর্যসৃষ্টি লেখকের অভিষ্ট হতে পারে। কিন্তু সরলতা ও স্পষ্টতাকে খর্ব করে নয়, তাও বঙ্কিম বলেছেন।

বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত—এই সূত্রটিও বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত করেছেন। প্রয়োজনে আপত্তি নেই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। ভাষা কথ্যভঙ্গিনির্ভর হবে, না, সংস্কৃতবহুল হবে, তা নির্ভর করবে বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনের উপরে। বঙ্কিমের এই বক্তব্য সমর্থনীয়।

কিন্তু টেকচাঁদী বা আলালী গদ্যরীতির অত্যুৎসাহ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরী রীতির অন্যায় নিন্দা করেছেন। বঙ্কিমের মতে বিদ্যাসাগরী রীতি নিন্দার্হ, কেন না তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুসারী, আর টেকচাঁদী ভাষা-রীতি প্রশংসার যোগ্য, কেন না তা চলতি ভাষা, মুখের ভাষা।

বঙ্কিমের এই উক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়, কারণ টেকচাঁদী রীতি চলতি সহজ-বোধ্য কথ্যভাষা রীতি নয়, তা ফারসীবহুল ভাষারীতি। এই রীতিতে ১৮৫৫-৬০ সালে বাঙালি কথা বলতো কিনা বলা কঠিন। টেকচাঁদী ভাষারীতি অপরিচিত ফারসী শব্দে পরিপূর্ণ। পদে পদেই পাঠককে হুঁচোট খেতে হয়। বোধোদয়, শকুন্তলা, কথামালা সীতার বনবাস ও আখ্যানমঞ্জরী (১৮৫১-৬৪) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ও সমকালে সর্বজনসমাদৃত হয়েছিল, বহুসংস্করণমুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। যে সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুসারিতার জন্য বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেই অভিযোগে বঙ্কিমকেও অভিযুক্ত করা যায়। গদ্যশিল্পী বঙ্কিম তাঁর শিল্পবুদ্ধিতে জানতেন যে ফারসি-প্রভাব-বর্জনেই বাংলা গদ্যের মুক্তি, সংস্কৃত ভাষার ছন্দঃস্রোত ও ইংরেজি বাক্যাদর্শ-

স্বীকরণেই তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। তাই প্রশংসাসত্ত্বেও তিনি টেকচাঁদী রীতিকে গ্রহণ করেন নি, নিন্দা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরী রীতি আত্মসাৎ করেছিলেন। টেকচাঁদী গদ্যরীতির কোনো উত্তরপুরুষ নেই, বিদ্যাসাগরী রীতি উত্তরপুরুষের মধ্য দিয়ে নিজেকে সফল করে তুলেছে। বঙ্কিমীরীতি তার কীর্তিমান উত্তরপুরুষ।

আলালী গদ্যরীতির সাময়িক খ্যাতি ও বঙ্কিম-প্রদত্ত প্রশংসার কারণ তার কাহিনী। গদ্যরীতির উৎকর্ষ নয়। এই সত্যটি মনে রাখলে আমরা অনেক ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাব। বাংলায় উপন্যাসের পূর্বপুরুষ রূপে আলালের ঘরের দুলালের খ্যাতি, গদ্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষ সৃষ্টিতে সে ব্যর্থ।

এইবার আলালী ভাষারীতির চরিত্র বিচার করা যেতে পারে। প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) নামে বারো পৃষ্ঠার এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রতি সংখ্যার সূচনায় এই মন্তব্যটি মুদ্রিত হতো :—'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৬১, ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) থেকে প্রতি সংখ্যায় প্রস্তাব-রূপে মুদ্রিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৬৪ বঙ্গাব্দে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এটিই প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম পুস্তক। গদ্যরীতি সম্পূর্ণ সাধু নয় বা চল্‌তি নয়, গুরুচণ্ডালী।

তিনি আরো কয়েকটি বই লেখেন—'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)—গদ্যরীতি সাধুভাষা-ঘেঁষা; 'রামারঞ্জিকা' (ভাদ্র ১২৬১, ১৮৫৪, 'মাসিক পত্রিকা' প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত) বিশুদ্ধ সাধুভাষা সম্মত রচনারীতি; 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), সাধুভাষায় লেখা, 'অভেদী' (১৮৭১), সাধুভাষায় লেখা; 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), সাধুভাষায় রচিত, কিন্তু মাঝে মাঝে কথ্যভাষার ছাঁদ আছে; 'বামাতোষণী (১৮৮১) কথ্যভাষায় লেখা।

এই তালিকা থেকে জানা যায়, প্যারীচাঁদ কেবল কথ্যভঙ্গিতে লেখেন নি, সাধু গদ্যরীতির চর্চাও করেছেন। কথ্যরীতি তাঁর কাছে এক্সপেরিমেণ্ট, শেষ কথা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন, আলালী ভাষা আদর্শ ভাষা নয়, কিন্তু "বাঙ্গালা গদ্য উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ।" এই উক্তি মেনে নেওয়া কঠিন।

কথ্যরীতি নিয়ে লেখা আগে থেকেই চলে আসছে। উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, ও পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ব্রজবিলাস, অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল) কথ্যরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রর আলালী রীতি তারই একটি ধাপ, তবে অন্যতম প্রধান ধাপ। সর্বজনবোধগম্যতা ও সরসতা আলালী গদ্যরীতির প্রথম ও প্রধান গুণ।

কাহিনীর উপভোগ্যতা ও সরসতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষার সরলতা ও সর্বজনবোধগম্যতা। তারই জন্য আলালের ঘরের দুলালের (সাময়িক) জনপ্রিয়তা।

আলালী ভাষার বৈশিষ্ট্য : সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের বহুল প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, ফারসী শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশ (ইডিয়ম) ও আভাণকের (প্রবাদবাক্য) প্রয়োগ। এই ভাষারীতির দোষ : ক্রিয়াপদের গুরুচণ্ডালী রূপ—একই সঙ্গে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপের ব্যবহার [দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, শ্রীসুকুমার সেন, ৩য় সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬]

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর আগাগোড়া কথ্যরীতি ব্যবহার করেন নি, উপদেশাত্মক অংশে সাধুভাষার ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়। বিশুদ্ধ কথ্যরীতি বা সাধুরীতি না বলে আলালী ভাষারীতিকে বলা যায় সংকর ভাষা-রীতি। আলালী ভাষারীতির এইসব দোষগুণের পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নধৃত অংশগুলিতে।

[১] রজনী ঘোরা। ভূচর জলচর খেচর নিস্তব্ধ। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ুর সংহারক ভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্যমান। নদীর সলিল কল ২ রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু চূড়ার প্রায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন— মধ্যে ২ তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝম্ ২ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে যাইতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময় ঘটে?

[রামারঞ্জিকা, নারীপাঠ্য গ্রন্থ. 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে (ভাদ্র ১২৬১ বঙ্গাব্দ ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত, এ হিসেবে প্যারীচাঁদের প্রথম রচনা]

[২] বাবুরাম বাবু চৌ গোঁপ্পা—নাকে তিলক—কন্তাপেড়ে ধুতি পরা, ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—'অরে হরে, শীঘ্র বালী যাইতে হইবে, তুই চার পয়সায় একখানি চল্‌তি পান্সী ভাড়া কর্ তো!' বড় মানুষের খান্‌সামারা মধ্যে মধ্যে বে-আদব হয়। হরি বলিল, 'মহাশয়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বস্‌তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্‌তেচি—ভেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টানিতে ও ঝিঁকে মার্‌তে মাঝিদের কালঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে দুইচার পয়সায় হতে পারে—চল্‌তি পান্সী চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা? [আলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮]

[৩] অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল, আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল, আর প্রকাশ বা না পায়! তিনি মনোমধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া একদিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—'বাবু সাহেব! তোমার ছোট লেড়কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গম্মি হচ্ছে। মোর মালুম হয়, ওনা দেওয়ানা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজদিকে বলে, মুই তোমাকে খারাপ কর্‌লাম—এ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে, বাবু সাহেব! এ বহুত বুরা বাত—এজ এসমাফিক মোরে বল্‌লে—কেল তোমাকেও শক্ত শক্ত বল্‌তে পারে। লেড়কা ভাল হবে—মরদ হবে—বেতামিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোসাহেব। আর যে রবক সবক পড়ে, তাতে যে জমিদারি থাকে, এত্‌না মোর এক্কেলে মালুম হয় না। [তদেব]

[৪] দে পাক—দে পাক—ভেডাং ভেড়াং ভেং ভেং। চড়ুকের পিট চর ২ করে তবুও পাছুটি নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক ২ বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গল গলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল কর্‌ছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে ২ এদিক ওদিক পড়ছে, তবু বলে—ঢাল্ ২। চড়কের পর চড়ুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এক্সে বৎসর আর সন্ন্যাস করব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড় ২ করে।

সেইরূপ মাতালও মদ খেয়ে বড় চলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটু ২ লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ট ভৎ র্সনায় মনে ২ শপথ করে দূর কর এ কর্ম্ম আর করব না। কিন্তু লাল জল দেখ্‌লেই প্রাণটা অম্‌নি লাফিয়া উঠে—বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম—প্রথম ২ আমড়াগেছে রকম এক ২ বার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপথ পাঁদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকে। [মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ১৮৫৯ ?]

প্যারীচাঁদ মিত্র সাধু ও চলিত, দুই রীতিতেই লিখেছেন। কথ্যরীতি তাঁর কাছে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট মাত্র, শেষ কথা নয়, এটি অবশ্যস্মর্তব্য।

১৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ

উনবিংশ শতকের মধ্যবিন্দুতে বাংলাদেশে রেনেসাঁসের সুফল সমাজে ও সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। চিরায়ত সাহিত্যচর্চায় ঐতিহ্যপ্রীতি ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে আধুনিক মনোভাবের প্রতি আনুগত্য এই সময়কার বাঙালিদের জীবনে দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০ খৃ) নামটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্ন গৃহে ইংরেজি শিক্ষক ও সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে পাঠ গ্রহণ করে রেনেসাঁসের সুফল অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি নিজ গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৬) স্থাপিত হয় ও বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদক রেভারেণ্ড লং, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি মধুসূদন দত্ত ও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি এল রিচার্ডসনকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে কালীপ্রসন্ন সংবর্ধিত করেন (১৮৬১)। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ও বহুবিবাহনিরোধ আন্দোলনের তিনি প্রবল সমর্থক ছিলেন। কলকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও 'জাষ্টিস অফ্ দি পীস' রূপে (১৮৬৩) কালীপ্রসন্নের কর্মদক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রাচীন ও আধুনিক, দুইকালের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বাবু নাটক (১৮৫৪), বিক্রমোর্ব্বশী নাটক (১৮৫৭, সাবিত্রীসত্যবান নাটক (১৮৫৮), মালতীমাধব (১৮৫৯), হুতোম প্যাঁচার নক্শা (প্রথম ভাগ ১৮৬২, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহযোগে 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৬০-৬৬) নামে সতেরো খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারতের বাংলা গদ্যানুবাদ তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

কালীপ্রসন্ন চারখানি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৫), সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (মাসিক, ১৮৫৬), বিবিধার্থ-সংগ্রহ (মাসিক, ১৭৮৩ শকাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন সম্পাদনা করেন) ও পরিদর্শক (দৈনিক ১৮৬১ ; ১৮৬২ থেকে কালীপ্রসন্ন কয়েক বৎসর দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন)—এই চারখানি পত্রিকা কালীপ্রসন্ন পরিচালনা করেছিলেন। (দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ')। ইংরেজি ও সংস্কৃত : দুই বিপরীত ধারার আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হন নি, পরন্তু নোতুন যুগের সংস্কৃতিবান বাঙালিরূপে দেখা দিয়েছিলেন। মাত্র তিরিশ বৎসরের জীবনকালে তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন, তা বিস্ময়কর।

(কালীপ্রসন্ন কথ্যভাষা ও সাধুভাষা, দুয়েরই চর্চা করেছিলেন। খাঁটি কল্‌কাত্তাই উপভাষার ছাপ তাঁর কথ্যভাষায় (হুতোমী ভাষা) সুস্পষ্ট। প্যারী-চাঁদের আলালী ভাষাব মতো সাধুভাষার অযথা মিশ্রণ হুতোমী ভাষায় নেই। নিছক কথ্যভাষার শক্তি কতটা তার পরীক্ষা তিনি করেছেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২) গ্রন্থে। এই কথ্যভাষার প্রধান গুণ সরসতা, লঘুতা এবং অদম্য প্রাণশক্তি।)

খাঁটি কল্‌কাত্তাই ভাষার শিল্পীরূপে কালীপ্রসন্ন স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের পূর্বসূরী। কলকাতার লোকের নিত্যব্যবহার্য ভাষাকে এঁরা আপন উদ্দেশ্য সাধনে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

(আলালী ভাষা মূলত ফারসীবহুল রীতি। বঙ্কিমচন্দ্রে এই রীতির অস্বীকৃতি ও সংস্কৃতভিত্তিক বিদ্যাসাগরী রীতির অনুসৃতি অনায়াসলক্ষণীয়। আলালী ভাষার কোনো উত্তরপুরুষ নেই। আর হুতোমী ভাষা পরবর্তী অনুসৃতি ও রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে একটি নোতুন রীতির সূচনাস্থলরূপে মর্যাদা লাভ করেছে। এই বিচারে আলালী রীতির উপরে হুতোমী রীতিকে স্থান দিতে হয়।)

বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষাকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিলেন ও হুতোমী ভাষাকে প্রাপ্যের অধিক নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।' (বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ দুটি—হুতোমী ভাষার অশালীনতা ও শব্দ-দারিদ্র্য। প্রথম অভিযোগটি সত্য, দ্বিতীয়টি সত্য নয়। হুতোমী ভাষার আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়। অশালীনতা-দোষকে ছাপিয়ে উঠেছে হুতোমী ভাষার সরসতা, লঘুতা, ধাবৎশক্তি ও অদম্য প্রাণশক্তি।

"বিদ্যাসাগরের, বঙ্কিমচন্দ্রের এমন কি আলালের ভাষার তুলনায় হুতোমের ভাষা নিঃসন্দেহে অশালীন। পূর্বোক্তগণের ভাষায় সর্বদা একটা শৃঙ্খলা আছে, আর শৃঙ্খলা থাকলেই কিছু মন্থরতা অপরিহার্য। সুসংবদ্ধ সৈন্যদল যত দ্রুত চলুক নিঃসঙ্গ পথিকের গতির চেয়ে তা দ্রুত নয়। হুতোমের ভাষায় এই দুটি গুণেরই অভাব, তা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, আর তা অত্যন্ত দ্রুত। এভাষা যেন শব্দের ভিড়। কে কার গায়ে পড়ছে, কে কখন আসছে যাচ্ছে, কে কি বলছে ঠিক নেই, সবশুদ্ধ মিলে একটা জনতার হট্টগোল। আর সমস্তটাই অত্যন্ত দ্রুত, অনেক সময়ে মনে হয় অনাবশ্যক দ্রুত, এমন দ্রুত যে সব সময়ে বাক্য-গুলি শেষ করবার অবকাশ ঘটে নি লেখকের। জনতার বাক্য শেষ হয়েও শেষ না, কারণ তার অনেকটাই কানে পৌঁছয় না। একটা উদাহরণ দি।

'অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ করচে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম করে ন'টার তোপ পড়ে গ্যালো।'

এ হচ্ছে—'A young man in a hurry'-র ভাষা! প্রত্যেক পদের শেষে ড্যাশ চিহ্নগুলো যেন তার দ্রুত গতির তালে উড়ন্ত উড়ুনীর প্রান্ত। লেখক ছুটছেন, ভাষা ছুটছে বর্ণনীয় বিষয় একটা আর একটার ঘাড়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, ঘনায়মান আকাশের নীচে ভাষার সঙ্গে পাঠক ছুটছে—হঠাৎ সম্বিৎ হলো যখন 'গুড়ুম করে ন'টার তোপ পড়ে গ্যালো।'" [বাংলা গদ্যের পদাংক, ১ম সং, ১৩৬৭, ভূমিকা পৃ ৮৪-৮৫, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী]

কালীপ্রসন্ন সিংহ কেবল কথ্য ভাষার চর্চা করেন নি, বিদ্যাসাগরী সাধু ভাষারও চর্চা করেছেন। 'পুরাণ সংগ্রহ' (সাতেরো খণ্ডে প্রকাশিত মহা-ভারতের গদ্যানুবাদ) তার পরিচয় স্থল।

এইবার কালীপ্রসন্নের হুতোমী ভাষা ও সাধু ভাষায় কয়েকটি নিদর্শন উপস্থিত করি।

[১] আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারান্দায় ঘুচ্চে—পূজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদেব নাম কাটচেন ; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না ; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখে জেলেডিঙ্গীর মত তাদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন ; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। (হুতোম প্যাঁচার নক্শা, ১৮৬২)

[২] ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্লো, পূজোবাড়িতে ক্রমে 'আন্ রে' 'কর্ রে' এটা কি হলো কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে, সেই সঙ্গে সহরের চারিদিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠ্লে, নবপত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্লো, যেন সপ্তমী কোরমাথান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন। (তদেব)

[৩] আজ নবমী ; আজ পুজোর শেষ দিন, এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁঠা, সুপারি আক, কুমড়ো, মাগুর মাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে, কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য, উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিণমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো। ভোবাও ওক্তে ভয়রোঁ

রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো,—আজ নিরঞ্জন। (তদেব)

[৬] যাহাতে এদেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত গ্রন্থের সমস্ত মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যস্তব মর্য্যাদা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধ্য ও চিরসঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।...... ...

স্বদেশের জ্ঞানোন্নতি সংসাধন ও জ্ঞান গৌরব রক্ষা করাই তাহার প্রকৃত হিতসাধন করা। সুদূরপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘীকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমশঃ নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে, এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করতঃ স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি। ......

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবন-সেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধান করতঃ হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। (মহাভারত-অনুবাদ ভূমিকা, ১৮৬০)।

কালীপ্রসন্নের বাংলা গদ্যচর্চার এই দুটি দিক ভাষাশিল্পী কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে।

১৪ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রকর্মা বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর (১৮৬৫-৯০ খৃ)। এই সময়কার সকল সাহিত্য-কর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই সময়সীমার মধ্যে যে কটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিকা লক্ষ্য করা যাক্ :

বঙ্গদর্শন। মাসিক। বৈশাখ ১২৭৯। এপ্রিল ১৮৭২। প্রথম চার বছরের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৭২-৭৬)। পরবর্তী পাঁচ বছরের সম্পাদক বঙ্কিম-অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৭৭-৮১)।

অমৃতবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক। ২০ ফেব্রুআরি ১৮৬৮। সম্পাদক : শিশিরকুমার ঘোষ

সাধারণী। সাপ্তাহিক। ১১ কার্তিক ১২৮০। ১৮৭৩। সম্পাদক · অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ভ্রমর। মাসিক। বৈশাখ ১২৮১। ১৮৭৪। সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়।

আর্যদর্শন। মাসিক। বৈশাখ ১২৮১। ১৮৭৪। সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বান্ধব। মাসিক। আষাঢ় ১২৮১। ১৮৭৪। সম্পাদক : কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ভারতী। মাসিক। শ্রাবণ ১২৮৪। ১৮৭৭। সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক। বৈশাখ ১২৮৫। ১৮৭৮।

বীণা। মাসিক। বৈশাখ ১২৮৫। ১৮৭৮। সম্পাদক : রাজকৃষ্ণ রায়।

বালকবন্ধু। পাক্ষিক। ২০ বৈশাখ ১২৮৫। ১৮৭৮।

তত্ত্ব-কৌমুদী। পাক্ষিক। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। ১৮৭৮। সম্পাদক : শিবনাথ শাস্ত্রী।

পঞ্চানন্দ। মাসিক। ভাদ্র ১২৮৫। ১৮৭৮। সম্পাদক: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাসী। সাপ্তাহিক। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮। ১৮৮১। সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র।

সখা। মাসিক। জানুঅরি ১৮৮৩। সম্পাদক: প্রমদাচরণ সেন।

সঞ্জীবনী। সাপ্তাহিক। ৩ বৈশাখ ১২৯০। ১৮৮৩। সম্পাদক: দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নব্যভারত। মাসিক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০। ১৮৮৩। সম্পাদক: দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

নবজীবন। মাসিক। শ্রাবণ ১২৯১। ১৮৮৪। সম্পাদক: অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বালক। মাসিক। ১২৯২। ১৮৮৫। সম্পাদক: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। কার্যাধ্যক্ষ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রচার। মাসিক। শ্রাবণ ১২৯৬। ১৮৮৯। সম্পাদক. রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য। মাসিক। বৈশাখ ১২৯৭। ১৮৯০। সম্পাদক: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

হিতবাদী। সাপ্তাহিক। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮। ১৮৯১। সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

পৃষ্ঠপোষক: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য-সম্পাদক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[উত্তরসূরী: নবম বর্ষ চতুর্থসংখ্যা, ১৩৬৯]

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখতেন। প্রথম তিনটি (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) ও শেষ (সীতারাম) উপন্যাস বাদে বাকি দশটি উপন্যাস বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। সীতারাম প্রকাশিত হয় প্রচারে। লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য ও বিবিধ প্রবন্ধ—এই তিনটি গ্রন্থের অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে, বাকি অংশ প্রচারে প্রথম প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচরিত্র প্রচারে ও ধর্মতত্ত্বের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয়।

ভারতী, বালক ও হিতবাদী ছাড়া বাকি সকল সাহিত্যপত্রই বঙ্কিম-ভাষারীতি ও মনন-রীতি প্রভাবিত। সুধীন্দ্রনাথ ও পরে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত

'সাধনা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৮।১৮৯১) বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের প্রভাব এখানেই শেষ হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-পত্রিকা প্রকাশিত হলে বাংলা দেশের ভাবের জগতে যে বিপুল আলোড়ন ও পরিবর্তন দেখা গেল, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

'নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।' [বাংলাভাষা-পরিচয়, ৬]

বঙ্গদর্শনের ভাষায় বাঙালির মনকে মুক্তি দানের বিশ বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে হাত পাকাচ্ছিলেন। এই বিশ বছরে (১৮৫২-৭২) বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তারাশংকর তর্করত্নের গদ্যচর্চার নানা পরীক্ষা দেখে এসেছেন।

অল্পকথায় বঙ্কিমের এই শিক্ষানবিশী পর্বের বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

"রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।"

সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে তার একটা নমুনা দিই—

'গগনমণ্ডল বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহ-রহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত

রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে।'*

তারপরে বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষার চেহারায় শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।"

[বাংলাভাষা পরিচয়, ১০]

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে [বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত] প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিদ্যাসাগরী ভাষারীতির নিন্দা ও আলালী রীতির প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি নিন্দার্হ, কেন না তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুসারী, আর টেকচাঁদী (আলালী) রীতি প্রশংসার যোগ্য, কেননা তা চলতি ভাষা, মুখের ভাষা।

বঙ্কিমের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ টেকচাঁদী রীতি চলতি সহজবোধ্য কথ্যভাষারীতি নয়, তা ফারসীবহুল ভাষারীতি। এই রীতিতে ১৮৫৫-৬০ সালে বাঙালি কথা বলতো কিনা বলা কঠিন। টেকচাঁদী ভাষারীতি অপরিচিত ফারসী শব্দে পরিপূর্ণ, পদে পদেই পাঠককে হুঁচোট খেতে হয়। বোধোদয় (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), সীতার বনবাস (১৮৬০) ও আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৪)—বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ-পঞ্চক বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ও সমকালে সর্বজন-সমাদৃত হয়েছিল, বহু সংস্করণ মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। যে 'সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুসারিতা'র জন্য বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেই অভিযোগে বঙ্কিমকেও অভিযুক্ত করা যায়।

সীতার বনবাস (১৮৬০) ও দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে নিম্নধৃত দুটি অনুচ্ছেদে এই বক্তব্য প্রমাণিত হয়।

"সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা

* সংবাদপ্রভাকর, ২৩ এপ্রিল, ১৮৫২।—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৬৮।

কহিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষণ বলিলেন, আর্য্যে। ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নব জলধরমণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব্ব অবস্থা, স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক, আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রাম ভবনে গমন করুন।"

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বরোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বরোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

এই দুটি উদাহরণেই 'সংস্কৃতপ্রিয়তা' অনায়াস লক্ষণীয়। কিন্তু কোনোটিই অন্ধ সংস্কৃতানুকারী নয়। ইংরেজি বাক্য ও পদবিন্যাসের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর বাংলা বাক্য ও পদবিন্যাসের যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, উভয়ত্রই তা অনুসৃত।

আসল কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পবুদ্ধিতে জানতেন যে ফারসী-প্রভাব বর্জনেই বাংলা গদ্যের মুক্তি, সংস্কৃত ভাষার ছন্দঃস্রোত ও ইংরেজি বাক্যাদর্শ-

স্বীকরণেই তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। তাই প্রশংসাসত্ত্বেও তিনি টেকচাঁদী (আলালী) রীতিকে গ্রহণ করেন নি, নিন্দা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরী রীতি আত্মসাৎ করেছিলেন। টেকচাঁদী গদ্যরীতির কোনো উত্তরপুরুষ নেই বিদ্যাসাগরী রীতি উত্তরপুরুষের মধ্য দিয়ে নিজেকে সফল করে তুলেছে। বঙ্কিমী রীতি তার কীর্তিমান উত্তরপুরুষ।

বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার যৌবনশ্রী ফুটে উঠল। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি-ভিত্তিভূমির উপর গড়ে উঠলো বঙ্কিমী গদ্যরীতি। তার প্রথম লক্ষ্য – গদ্যের ভারসাম্য অর্জন, শেষ লক্ষ্য—সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জন। দুয়ে মিলে বঙ্কিমী ভাষারীতির পূর্ণতা। প্রথম লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর প্রায় উপনীত হয়েছিলেন। সেখান থেকে যাত্রা করে শেষ লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপনীত হলেন শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রয়োগে। দেখা গেল বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক স্টাইল,—আসলে তা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ভাষারূপ। শব্দ, ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অলংকার ও অনুচ্ছেদ ব্যবহারে বঙ্কিমের নিজস্বতা তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্য সাধনায় বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য দিল।

বঙ্কিমের গদ্য আলোচনায় দুটি কথা সর্বদা স্মরণযোগ্য : এক, বঙ্কিমী ভাষা-রীতির আদর্শ – সরলতা ও স্পষ্টতা। দুই, তিনি বঙ্গদর্শনে উপন্যাস ও প্রবন্ধ একই সঙ্গে রচনা করছিলেন ; উভয়ের গদ্য মূলতঃ একই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কল্পনাধর্মী কথা-গদ্য ও প্রবন্ধের যুক্তিধর্মী গদ্যের আলোচনায় বঙ্কিমী গদ্যের রূপ-গুণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের উপন্যাস প্রবন্ধ—সব-কিছুই বঙ্গদর্শন, নবজীবন ও প্রচারে প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থভুক্ত হয়। সকল রচনাই সাময়িক পত্রের পাঠক সচেতন হওয়ায় বঙ্কিমী গদ্যে স্পষ্টতা ও ধাবৎশক্তি এসেছিল। কথা-গদ্যে কল্পনাকে দৃষ্টি-গ্রাহ্য রূপ দেওয়া হয়েছিল ; তাকে সাবয়ব ও সালংকাররূপে বঙ্কিম উপস্থিত করেছিলেন। তার ফলে কথা গদ্যে বিশেষণ ও অর্থালংকার ব্যবহারে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় ; সেই সঙ্গে ছিল বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ মনন—যা কথা-গদ্যকেও করে তুলেছিল বাহুল্য-বর্জিত, পরিচ্ছন্ন, ও সংহত। আর প্রবন্ধ-গদ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন, ব্যাখ্যান ও প্রতিপাদনের তাগিদে এসেছিল পরিমিতিবোধ, ঋজুতা, প্রাঞ্জলতা ও শব্দ প্রয়োগে অব্যর্থতা। এর জন্য বঙ্কিম ব্যবহার করেছিলেন হ্রস্বকায় সরল বাক্য।

বঙ্কিমী গদ্যে শব্দচয়নে উদারতা ও পরিমিতিবোধ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই শব্দমোহ ও শ্রুতিমাধুর্যের বিপদ থেকে আত্মরক্ষাপ্রবণতাও অনায়াস-লক্ষণীয়। দুরুচ্চার্য শব্দ, বৃথা অনুপ্রাস, অস্পষ্টতা ও অর্থাভাস বঙ্কিম বর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমী গদ্যে প্রশ্নাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের ঔৎসুক্য ও সংশয় জাগ্রত রাখার কৌশল প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়। সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাস ও সমাপিকা ক্রিয়াপদের অধিক ব্যবহারের দ্বারা বাক্যে এসেছে দ্রুততা। অন্তরঙ্গ বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা পাঠকের সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পর্ক স্থাপন ও নাটকীয় আকস্মিকতা দ্বারা পাঠকমনকে সচকিত করা বঙ্কিমী রীতিব দুটি প্রধান লক্ষণ। "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে (প্রচার, মাঘ, ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি নবীন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কথা-গদ্যের বিববণাত্মক বস্তুনিষ্ঠতা, শবীরী কল্পনার বর্ণাঢ্যতা, ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিত্রাঙ্কনপ্রবণতার ফলে যে গদ্যরীতি বঙ্কিম উপন্যাসে ব্যাবহার করলেন, তাকে বলা যায় বর্ণনাধর্মী স্টাইল। সেদিন এটাই উপন্যাসে প্রধান অবলম্বন ছিল, কাবণ চবিত্রের মনোবিশ্লেষণ সেকালীন উপন্যাসে দেখা দেয় নি। রূপ বর্ণনায়, নাটকীয় আকস্মিকতা, কৌতুক সৃষ্টি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও অন্তরঙ্গ সম্ভাযণের সাহায্যে মনোবিশ্লেষণের দায়িত্ব নিবাহ কবতে হতো। ফলে বঙ্কিমী উপন্যাসে গতিবেগ, বর্ণাঢ্যতা ও নাটকীয়তা অনায়াসলক্ষণীয়।

প্রবন্ধ-গদ্যে ফরাসি এনসাইক্লোপীডিস্টদের উত্তরাধিকারী অষ্টাদশ শতকীয় ইংবেজি চিন্তামূলক গদ্যসাহিত্যের বক্তব্যসর্বস্বতা অনুসৃত হয়েছিল। তার ফলে প্রবন্ধ-গদ্যে এসেছিল নৈর্ব্যক্তিকতা, যুক্তিধর্মিতা, তত্ত্বপ্রতিপাদনের নিষ্ঠা ও দায়িত্ব। গদ্যবীতিতে দেখা গিয়েছিল বক্তব্যবিন্যাসকারী নিটোল অনুচ্ছেদ নির্মাণে ঝোঁক, শব্দের ব্যবহারে পরিমিতিবোধ ও নিশ্চয়াত্মক বাক্যের প্রয়োগ।

॥ দুই ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথম স্তরের (প্রাক্-বঙ্গদর্শন যুগের) সংস্কৃতনির্ভর গদ্য অতিরিক্ত গুরুগাম্ভীর্য পরিহার করে দ্বিতীয় স্তরে (বঙ্গদর্শন যুগে ক্রমশঃ সহজ সরল সাবলীল দেশী গদ্যে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। দুর্গেশনন্দিনী,

কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত। বঙ্গদর্শনের যুগের আরম্ভে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। প্রথম তিনটি উপন্যাসে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, সমাসের আড়ম্বর, সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন, বিশেষণ পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের আধিক্য অনায়াস-লক্ষণীয়। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী উপন্যাসে এবং শেষের দিকের সীতারাম উপন্যাসে বিদ্যাসাগরী রীতির উদাহরণ বিরল নয়। চন্দ্রশেখর, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস এবং কমলাকান্তের দপ্তর লিখিত হয়েছে বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের মধ্যবিন্দুতে (১২৮০-৮১ বঙ্গাব্দে)। এখানে বঙ্কিমের কথা-গদ্যের স্টাইল পূর্ণপ্রতিষ্ঠ। আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৩), সীতারাম (১৮৮৬), ইন্দিরা (সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ ১৮৯৩) ও রাজসিংহ (সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৩) উপন্যাসে বঙ্কিমের কথা-গদ্যের স্টাইল শিল্পসাফল্যের চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে।

শব্দ-সম্ভার, ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, স্ত্রীপ্রত্যয় ও অর্থালঙ্কার ব্যবহার এবং অনুচ্ছেদ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাস থেকে আমরা বিচার করতে পারি। উপন্যাসে নায়িকারূপবর্ণনা থেকে তাঁর গদ্যরীতির বিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা সম্ভব বলে মনে হয়। এবার সেই আয়াসে প্রবৃত্ত হই।

[ক] তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতঃ প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাবপ্রকাশক, তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনো-রঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত, তাহাতে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণচকিত কটাক্ষনিক্ষেপ হইত না, চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ উষাকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ। [দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫]

[খ] সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না। [কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬]

[গ] মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভরস্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার চঞ্চল লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিতান্ত স্থির গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদরদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিংবা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে; মনোরমার রূপরাশি অতুল—কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। [মৃণালিনী ১৮৬৯]

প্রাক্‌-বঙ্গদর্শন-যুগের এই তিনটি উদাহরণে বঙ্কিমী স্টাইলের প্রথম যুগের

পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। অন্তরঙ্গ পাঠক সম্ভাষণ, নিশ্চয়াত্মক বাক্যের পরিবর্তে প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহারে চমক সৃষ্টি, সমাপিকা ক্রিয়াপদের আধিক্য, অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংখ্যাহ্রাস; যতিচিহ্নের পর্যাপ্ত ব্যবহারের দ্বারা হ্রস্ব বাক্যগুলির সংস্থাপন অনায়াসলক্ষণীয়। এগুলি বঙ্কিমের নিজস্বতা। আর বিদ্যাসাগরী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এইসব ক্ষেত্রে—তৎসম শব্দ ও দীর্ঘ সমাসের বহুল ব্যবহারে, নামধাতু ও সংস্কৃত সন্ধির ব্যবহারে, বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগে ও বিশেষণীয় বিশেষণের ব্যবহারে।

॥ তিন ॥

এরপর বঙ্গদর্শনের যুগ। আগেই বলেছি, ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩-৭৫ খৃষ্টাব্দে) চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই চারখানি গ্রন্থে বঙ্কিমের কথা-গদ্যের স্টাইল পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার সূচনা হল বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে—প্রথম বর্ষে (১২৭৯ বঙ্গাব্দ। ১৮৭২ খৃ) প্রকাশিত বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। এই চারখানি উপন্যাস ও কমলাকান্তের দপ্তরে'নারীরূপবর্ণনা লক্ষ্য করা যাক। সংস্কৃতগন্ধী ধ্বনিরোলসমৃদ্ধ কথা গদ্য ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পরিবেশ থেকে গার্হস্থ্যজীবনের বর্ণবিরল পরিমণ্ডলে অবতরণ করেছে। প্রতিবেশের বর্ণসমারোহ ও ঘটনার রোমাঞ্চকর অসাধারণত্ব থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়িকাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। আর সামাজিক উপন্যাসের মন্থরগতি জীবনস্রোতে নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতি থেকে উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ তার আননে শান্তশ্রী দান করে। এবং সে-কারণে প্রাক্-বঙ্গদর্শন ও বঙ্গদর্শন যুগের নায়িকা-রূপবর্ণনায় পার্থক্য ঘটেছে। তা সত্ত্বেও এ সত্য স্বীকার্য যে গদ্যশিল্পী বঙ্কিমের নিজস্বতা বঙ্গদর্শন যুগের কথা-গদ্যেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। নিম্নধৃত উদাহরণ-গুলিতে এই সিদ্ধান্তে সমর্থন পাওয়া যায়।

[ঘ] কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর, তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না।

এই কুন্দের সরলতা চমৎকার : সে কিছুই বুঝে না।……বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে। …আমার বোধ হয় যেন, এ পৃথিবীর সে চোখ নয়।· ···কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে। রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাতে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্ত-ভাব-ব্যক্তি—যদি শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে স্বচ্ছ সরোবরের ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভব করিতে পারিবে। [বিষবৃক্ষ ১৮৭৩]

উপমা ব্যবহারে, চিত্র নির্মাণে লেখকের স্বাতন্ত্র্য এখানে প্রকট হয়েছে। এখানে শব্দ বা উপমার আড়ম্বর নেই, সংস্কৃত রূপবর্ণনার ঐতিহ্যানুস্মৃতি নেই, নারীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো বর্ণনাই নেই। কুন্দ চরিত্রের আত্মবিস্মৃত সারল্য ও সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাব প্রকাশের জন্য লেখক কুন্দর বৃহৎ নীল চক্ষু দুটির উপর সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এই রূপবর্ণনায় ব্যবহৃত উপমাগুলি শরীরী রূপ বর্জন করে অশরীরী ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই গদ্যভাষার প্রবাহও শান্ত, নিস্তরঙ্গ। বাক্যের দৈর্ঘ্য কমেছে। বিশেষণ সরল হয়েছে—কুন্দর চক্ষুদুটি 'বৃহৎ' ও 'নীল' মাত্র। সরোবর 'স্বচ্ছ', চন্দ্র 'শরচ্চন্দ্র' মাত্র। 'চক্ষু' ও 'চোখ'—দুটি শব্দই ব্যবহৃত। কুন্দের সরলতা বর্ণনাকারী এই গদ্যের প্রধান গুণ—সরলতা। সরলতাই গদ্যশিল্পী বঙ্কিমের অন্বিষ্ট।

[ঙ] মুক্ত বাতায়ন-পথে কৌমুদী-প্রফুল্ল-প্রকৃতির শোভার প্রতি (চন্দ্রশেখরের) দৃষ্টি পড়িল। বাতায়ন-পথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ-সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া. দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বিচিত্র ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়-কৃষ্ণ ভ্রূযুগলতলে মুদ্রিত পদ্মকোরক-সদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়ন পল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন ক্ষুদ্র

কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপর কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে সুকুমার রসপূর্ণ-তাম্বুল-রাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্‌ভিন্ন করিয়া মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তি-সুস্থির হইল। সেই বিলাসচাঞ্চল্য-শূন্য সুষুপ্তি-সুস্থির বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল। [চন্দ্রশেখর ১৮৭৫]

নিদ্রিতা শৈবলিনীর সুষুপ্তি-সুস্থির রূপবর্ণনায় বঙ্কিম অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই বর্ণনায় শৈবলিনীর জীবনের বেদনা শিল্পরূপ লাভ করেছে। আর বঙ্কিমের ভাষা এই বেদনার শিল্পরূপ দানে সর্বথাযোগ্য রূপে দেখা দিয়েছে। এখানে বাক্যবিন্যাস ও পদবিন্যাস কৌশল লেখকের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। কর্তৃপদের ('চন্দ্রশেখর') অনুল্লেখে ও একই ক্রিয়াপদের (দেখিলেন) পুনরুল্লেখে বাক্য-পরম্পরায় এসেছে গতি। যে উপমা ও বিশেষণ-বিরলতা বিষবৃক্ষে লক্ষ্য করেছি, তার স্থানে এসেছে পর্যাপ্ত উপমা ও বিশেষণ, কোথাও তা অনাবশ্যক ভার হয়ে ওঠে নি। "চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগলতলে মুদ্রিত পদ্মকোরক-সদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি", "সুকুমার রসপূর্ণ-তাম্বুল-রাগরক্ত ওষ্ঠাধর"—এই সব উপমাচিত্র সজীব ও প্রাণোচ্ছল রূপ লাভ করেছে। মনোরমার বর্ণনায় লেখক "অধরৌষ্ঠ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন (মৃণালিনী), এখানে ব্যবহার করেছেন "ওষ্ঠাধর"। ক্রিয়ার কালব্যাপ্তি অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন—"দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া"। সন্ধিযুক্ত পদ—"কিঞ্চিন্মাত্র"; বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার—"সুকোমলা সমগামিনী রেখা" : এ দুটি বিদ্যাসাগরী প্রভাবের ফল।

[চ] রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ-তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, বর্ণ উদ্ভিদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজল-পূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই

স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ন-নির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। [রজনী ১৮৭৭]

অন্ধ যুবতী রজনীর বর্ণনায় বঙ্কিমের কথা-গদ্যের স্টাইল পূর্ণপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি নির্মাণে ভাস্করের নৈপুণ্য রজনীরূপবর্ণনায় লেখক স্মরণ করেছেন। বস্তুত বাংলা সাধু গদ্যের এক ভাস্কর্য-প্রতিমা রজনী-র গদ্য। নিপুণ ভাস্করের ছেদনীমুখে যেমন প্রস্তর সাবয়ব হয়ে ওঠে, তেমনি গদ্যশিল্পী বঙ্কিমের লেখনীমুখে গদ্য সাবয়ব হয়ে উঠেছে। বাক্যগুলি হ্রস্ব, সমাস, বিশেষণ ও উপমা-অলংকার নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহৃত হয় নি। বর্ণনীয় বিষয়ের উপর লেখকের দৃঢ় অধিকারবশতঃ তা বাহুল্যবর্জিত। শব্দ ও অলংকার ব্যবহারে লেখকের সংযম ও নৈপুণ্য বিশেষ লক্ষণীয়। গদ্যের চাল খুব দ্রুত নয়, গতিহীনও নয়; বলা যায় প্রত্যয়ব্যঞ্জক দৃঢ় পদক্ষেপ।

[ছ] রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি পরা আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী সুন্দরী সরোবর-পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল। [কৃষ্ণকান্তের উইল, ১৮৭৮]

বঙ্কিমের কথাগদ্যের স্টাইল এখানে পূর্ণবিকশিত। তার নিজস্বতা-লক্ষণগুলি এখানে প্রকাশিত। কৌতুক, তারল্য, সাবলীলতা, লঘুতা, দ্রুতগতি, নাট্যধর্মিতা ও চলমানতা এই গদ্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বিশ্লেষণে বিশেষণে কৌতুকে তারল্যে উচ্ছলিত এই স্টাইল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সহায়করূপে দেখা দিয়েছেন গদ্যশিল্পী বঙ্কিম। রোহিণীর রূপের প্রধান কথা তার লীলাচঞ্চল গতিচ্ছন্দ। এই গতিচ্ছন্দ ভাষায় তরঙ্গিত হয়েছে। রোহিণীর অঙ্গসৌষ্ঠবের তটদেশকে বেষ্টন করে আছে রূপ-নদীর প্রবাহধর্মী

চলমানতা। এই গদ্যের অঙ্গসৌষ্ঠবকে ঘিরে আছে সাবলীলতা ও লঘুতা।

কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা-গদ্য বঙ্কিমী স্টাইলের পূর্ণতা লাভ করেছে। তার প্রমাণ এখানেই পাই। বঙ্কিমের গদ্যভাষা কী অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞানের সঙ্গে সরল (তদ্ভব) ও গুরুগম্ভীর (তৎসম) শব্দাবলীর সমন্বয়-সাধন করতে পারে, তার প্রমাণ এই রোহিণীরূপবর্ণনা। "অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে-ধুতিপরা আর কাঁধের উপর"—লিখতে লিখতে বঙ্কিমের অবদমিত কবি-প্রতিভা জেগে উঠল, এবং তিনি বাক্যটি শেষ করলেন অসাধারণ শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে—"চারুবিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলীকৃতা, লোলায়মানা, মনোমোহিনী কবরী"। বঙ্কিম-প্রতিভা এখানে আমাদের সমস্ত হিসাবকে বিপর্যস্ত করে এক অসাধারণ শিল্পগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[জ] দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা —একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী — মৃত্তিকারূপিণী – অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-

বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা! [কমলাকান্তের দপ্তর : ৮৭৫]

বঙ্গদর্শন-পর্বে বঙ্কিমের কথা-গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কমলাকান্তের দপ্তর। উপন্যাসের নায়িকারূপবর্ণনা থেকে উদ্ধৃত অংশে আসি দেশমাতৃকারূপ-বর্ণনায়। বিদ্যাসাগরী রীতিকে আশ্রয় করেই এই গদ্যরীতির উদ্ভব ; এখানে বঙ্কিম-প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে। ভাষায় এসেছে কাব্যগুণ ও বেগ, গাম্ভীর্য ও ধ্বনিরোল, অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা। সবটা মিলিয়ে লেখক-ব্যক্তিত্বের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। তৎসম শব্দ ও পূর্ণ ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বঙ্কিমের নৈপুণ্য এখানে স্বপ্রকাশ। পূর্ববর্তী [ঙ] উদাহরণে (চন্দ্রশেখর) আমরা "দেখিলেন" ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার ও তার এফেক্ট লক্ষ্য করেছি ; তার ফলে বাক্য-পরম্পরায় এসেছে গতি ও ধাবৎশক্তি। এখানেও "দেখিলাম" ও "দেখিব" ক্রিয়াপদদুটি যথাক্রমে চারবার ও পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব ক্রিয়াপদের পৌণঃপুনিক ব্যবহারে রচনা এখানে শ্রুতিকটু হয় নি, পরন্তু বর্ণনায় এসেছে গতি। তার ফলে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদ ও সন্ধিযুক্ত পদ ঠিকমতো খাপ খেয়ে গেছে, এবং একটি ধ্বনিরোল সৃষ্টি হয়েছে, দেবীর আগমনে শব্দসংগীতবাদ্যে পাঠকের কর্ণরন্ধ্র পূরিত হয়েছে ; দেশভক্তের হৃদয়ে মাতৃবন্দনার আবেগতরঙ্গ তুলেছে।

॥ চার ॥

বঙ্কিমের কথাগদ্যের শেষ পর্বের—বঙ্গদর্শন-পরবর্তী পর্বের—কালসীমা দশ বছর (১৮৮২-৯৩)। এই পর্বের উপন্যাস : আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৩-৮৪), সীতারাম (১৮৮৬-৮৭), ইন্দিরা (সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ ১৮৯৩) রাজসিংহ (সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ১৮৯৪)। কথাগদ্যের স্টাইল এখানে শিল্পসাফল্যের শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করেছে। ত্রয়ী-উপন্যাসে রচনাভঙ্গিতে কিছু কিছু শৈথিল্য চোখে পড়ে, কিন্তু সংশোধিত ইন্দিরা ও রাজসিংহ নিখুঁত। এই পর্বে নায়িকারূপবর্ণনা সংক্ষিপ্ত সংহত, সরল, স্পষ্ট। লেখকের ইচ্ছায় তাতে দেখা গেছে উপযুক্ত ভাবগাম্ভীর্য বা প্রয়োজনীয় কৌতুকতারল্য।

ভাষা এখানে লেখকের আজ্ঞাবাহী দাসী। সরলতা ও স্পষ্টতা বজায় রেখেই তা সৌন্দর্য সৃজন করেছে। হ্রস্ব ক্রিয়াপদের ব্যবহার বেড়েছে, বিশেষণের বহর কমেছে, রূপবর্ণনার দৈর্ঘ্য কমেছে, কাব্যগুণের স্থান দখল করেছে নাট্যগুণ। দুটি উদাহরণেই এই অভিমত প্রতিপন্ন করা যাবে।

[খ] এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথবা স্থূলাঙ্গী বলিলেও ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই, স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে, নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা।·· ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝকমক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত, জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্না-পুলকিত স্থির নদীজলের মত সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি—ঝিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝেমাঝে তেমনই হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনই অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে; কোঁকড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে, একছড়া যূঁইফুলের গোড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে। [দেবী চৌধুরাণী ১৮৮৪]

তদ্ভব শব্দ ও অনুকার শব্দের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, দেশী ইডিয়মের ব্যবহার এখানে সহজেই চোখে পড়ে। দেবী-চৌধুরাণীর রূপকে উদ্বেলিত নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই রূপ পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। নদীর উদ্বেলতা যেমন তটে সংযত,

এখানে তৎসমপ্রধান ধ্বনিরোলসমন্বিত অলংকৃত ভাষাপ্রবাহ তেমনি বাক্য-বিন্যাসতটে সংযত। এই ইমেজের স্বাতন্ত্র্য এই যে, চঞ্চল লাবণ্যপ্রবাহের মধ্যে লাবণ্যময়ীর নির্বিকারতা দেখানো হয়েছে। দেবীর সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে নদীর সঙ্গে সমধর্মিতায় ও জ্যোৎস্নালোকে নদীজলের মতো তার অঙ্গ-বিন্যস্ত অলংকারের মুহুর্মুহুঃ দীপ্তি-বিচ্ছুরণে। এই দীপ্তি-বিচ্ছুরণের বর্ণনায় লেখক অনুকার শব্দ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন; নদীজলের চিকিমিকি, রত্নালংকারের চিকিমিকি; জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি, রত্নালংকারের ঝিকিমিকি। সমস্তটা মিলে আছে নাটকীয়তা; এই গুণেই বর্ণনা প্রত্যক্ষ, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘ; আসলে তা বিরতিচিহ্নের সুপ্রয়োগে গ্রথিত হ্রস্ব বাক্যের সমবায়মাত্র। পূর্ণক্রিয়াপদের সংখ্যা যথাসম্ভব কম, অনেকক্ষেত্রে বর্জিত; যেমন—"নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই।" বা, "সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা।" মনে হয় বঙ্গদর্শন-পর্ব থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ক্রিয়াপদব্যবহারের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। [ঙ] ও [জ] উদাহরণে এই সমস্যার সমাধানের একটি পরিচয় পেয়েছি, এখানে পাই আর-এক পরিচয়।

[ঞ] মানুষটি (সুভাষিণী) আমারই বয়সী হইবে, রঙ্গ আমা অপেক্ষা যে ফরসা, তাও নয়। বেশ-ভূষা এমন কিছু নয়। কানে গোটাকতক মাকড়ি, হাতে বালা, গলায় চিক, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরা। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারিদিক্ হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। ঠোঁট দুখানি পাতলা, রাঙ্গা টক্‌টকে; ফুলের পাপ্‌ড়ির মত উলটান, মুখখানি ছোট; সর্ব্বশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন-পিটন কি রকম, তাহা ধরিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্ব্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে তেমনই কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে, আমি পুরুষমানুষ নহি—মেয়েমানুষ—নিজেও একদিন একটি সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত ছিলাম। [ইন্দিরা, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ ১৮৯৩]

এই রূপবর্ণনার ভাষা তারল্যে কৌতুকে উচ্ছলিত। এর লঘুতা ও সাবলীলতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিবর্তনের ফলে বঙ্কিমের কথাগদ্য যে সরলতা, লঘুতা ও স্বচ্ছতা অর্জন করেছিল, এই বর্ণনা তারই উদাহরণ। অন্তরঙ্গ পাঠক সম্ভাষণ ও নাটকীয় আকস্মিকতার চমক, এই দুটি কৌশলের সফল প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়। তৎসম শব্দ ছেড়ে লেখক তদ্ভব শব্দ অবলম্বন করেছেন। কাটা কাটা হ্রস্ব বাক্য ব্যবহারে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। রোহিণী ও দেবীচৌধুরাণীর রূপবর্ণনা, [ছ] ও [জ] উদাহরণ, আমরা লক্ষ্য করেছি। এখানে ঐ দুই বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে রূপবর্ণনায়, স্বাতন্ত্র্য আছে বর্ণনার ভাষায়। রোহিণীরূপ বর্ণনায় লেখক তদ্ভব শব্দ থেকে অলংকৃত ধ্বনিরোলসমৃদ্ধ বর্ণাঢ্য তৎসমশব্দযুক্ত বর্ণনায় চলে গেছেন, দেবীচৌধুরাণীর রূপ বর্ণনায় বর্ণনাকে কাব্যগুণ ও সঙ্গীতগুণে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এখানে তার কিছুই নেই। সরলতা ও স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও দ্রুততাই এখানে লেখকের অবলম্বন। বঙ্কিমী কথাগদ্যের শিল্পসম্ভাবনা এখানে চরমে উপনীত হয়েছে। বর্ণাঢ্য অলংকার প্রয়োগে নয়, নিরাভরণ সৌন্দর্য সৃজনেই শিল্পকর্মের চরমোৎকর্ষ : এই সত্য এখানে প্রমাণিত হয়েছে।

তিরিশ বছরে (১৮৬৫-৯৪) বঙ্কিমের কথা-গদ্যের স্টাইল যে-সব স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছে, এতক্ষণ তারই আলোচনা হল।

॥ পাঁচ ॥

বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যের কালসীমা বিশ বছর (১৮৭২-৯২)—বঙ্গদর্শন থেকে নবজীবন ও প্রচার পত্রিকা পর্যন্ত। প্রবন্ধ-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি আলোচনার পূর্বে একবার স্মরণ করি বঙ্কিমের রচনা-নির্দেশ :

"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হইবে।" ['বাঙ্গালাভাষা', বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ]।

"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।" ['বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন, প্রচার, মাঘ ১২৯১, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ]

বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮), বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ ১৮৮৭, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২), কৃষ্ণচরিত্র (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯২) : এই কয়খানি বঙ্কিমের প্রধান প্রবন্ধ-গ্রন্থ। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা (১৮৭২) এক সীমা, বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ ও কৃষ্ণচরিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৯২) অপর সীমা। বঙ্কিমের প্রবন্ধ গদ্যের বিবর্তন এই বিশ বছরের গদ্যের ইতিহাস।

বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যের লক্ষ্য—বক্তব্যপ্রাধান্য, নৈর্ব্যক্তিকতা, যুক্তিধর্মিতা, বিশ্লেষণপ্রবণতা। তাই দেখা গিয়েছিল বক্তব্যবিন্যাসকারী নিটোল অনুচ্ছেদ নির্মাণে ঝোঁক, শব্দের ব্যবহারে পরিমিতিবোধ ও নিরাভরণতা, নিশ্চয়াত্মক বাক্যের প্রয়োগ। তার ফলে ভাষা হয়ে উঠেছিল ঋজু, সরল, স্পষ্ট ও সংহত। পাঠককে অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের চমক প্রবন্ধ-গদ্যে এনেছে বৈচিত্র্য! নৈয়ায়িকের যুক্তিধর্মীতা ও পত্রিকা-সম্পাদকের প্রয়োজনধর্মিতা : এই দুটি গুণই প্রবন্ধ-লেখক বঙ্কিম আত্মসাৎ করেছিলেন। বিষয়গৌরব তাঁর প্রবন্ধের প্রধান গৌরব, সে-কারণে তাঁর প্রবন্ধ-গদ্য চিন্তানির্ভর বক্তব্যপ্রধান, নৈর্ব্যক্তিক, ব্যবহারিক, নিরাভরণ, সংহত ও যুক্তিধর্মী। সেই সঙ্গে পাই যুক্তি ও তথ্য-বিন্যাসনির্ভর নিটোল অনুচ্ছেদ। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যে ভাবালুতা ও কল্পনার স্থান নেই, ইনটেলেক্‌টের একচ্ছত্র প্রভুত্ব; তা বঙ্কিম-মনীষার যোগ্য বাহন। যে চিন্তামূলক গদ্যসাহিত্য বঙ্গদর্শনে সৃষ্ট হয়েছিল, গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার বহুল অনুসৃতি অনায়াসলক্ষণীয়। এই গদ্যসাহিত্য সমাজকল্যাণাদর্শে বিশ্বাসী, বিষয় প্রধান, স্পষ্ট অনলংকৃত বিবৃতি ও বিশ্লেষণের অনুরাগী ও তত্ত্ব-মুখ্য। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্য এই চিন্তা ও বক্তব্যের উপযোগী বাহন বলে ঐ সময়ের গদ্যসাহিত্যে এই গদ্যরীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্য তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরবাহী। বঙ্কিম-শিষ্যরা তাঁর পথ ধরে আপন মনীষার মুক্তিপথ খুঁজে পেয়েছেন, শক্তিস্বাক্ষরবাহী গদ্যরীতি মারফৎ আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখানেই বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্য সার্থকতা লাভ করেছে।

এখন বঙ্কিমী প্রবন্ধ-গদ্যের কালানুক্রমিক উদাহরণ থেকে তার বিকাশ ও

পরিণতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, গদ্যের বিশুদ্ধ রূপটি এখানেই লভ্য।

[ক] যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

একথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে. সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের লোক সকল বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিল্‌টর ডৌন" করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে. কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। [পত্রসূচনা, বঙ্গদর্শন, এপ্রিল ১৮৭২]

এই গদ্যাংশে বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যের সব কয়টি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে: যুক্তিভিত্তিক অনুচ্ছেদ রচনা, প্রশ্নাত্মক ও নিশ্চয়াত্মক বাক্যের ব্যবহারে চমক

সৃষ্টি, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও তারল্যের মাধ্যমে আপন বক্তব্যের নিরাভরণ প্রকাশ, ব্যবহারিক ও অব্যর্থ শব্দের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া পদের সংখ্যা হ্রাস ও পূর্ণ ক্রিয়াপদের উপর নির্ভরতা, ব্যবহারিক ভাষায় বিজ্ঞান-বক্তব্যের (ফিল্‌টার প্রক্রিয়া) পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনা, দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা হ্রাস, সুপ্রচুর যতিচিহ্নের প্রয়োগ, বৃথা অলংকারপ্রয়োগে আসক্তিহীনতা এবং স্পষ্টতা ও সরলতার প্রতি ঝোঁক।

[খ] সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফীট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে ১১,৪৫৬ ফীট বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে ; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কতদূর যায়? বলা যায় না। কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কানে পরি, কোন কোন প্রাচানার চীৎকারে বোধ হয় গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্রাও শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তথায় পিস্তল ছুঁড়িলে পট্‌কার মত শব্দ হয় এবং স্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু মার্শাস বলেন যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফীট হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 'গগন-পর্য্যটন' প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্যকণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, শব্দতরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। [শব্দ, বিজ্ঞানরহস্য, ১৮৭৫]

প্রথমেই চোখে পড়ে নিটোল অনুচ্ছেদ। তারপর নিরাভরণ ব্যবহারিক গদ্যের নিপুণ প্রয়োগ। এখানে বক্তব্যেরই প্রাধান্য, তাই শব্দব্যবহারে লেখক সতর্ক। ছোট ছোট বাক্য ও বাক্যাংশের সুনিপুণ সংযোজন। অনেকটা মৌখিক আলাপচারিতা। কৌতুকের ব্যবহারে নীরস বিজ্ঞান-বিষয় সরস হয়ে উঠেছে। শব্দব্যবহারে লেখকের উদারতাও চোখে পড়ে, প্রয়োজনে

ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে তাঁর আপত্তি নেই। নব্যলেখকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বঙ্কিম পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, সামান্য ভাষা বা সংস্কৃতবহুল ভাষা, দেশী বা বিদেশী শব্দ, তৎসম বা তদ্ভব শব্দ—সবকিছুই ব্যবহার করা যেতে পারে। "প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" এখানে সেই সূত্রের সফল প্রয়োগ। প্রয়োজন ও ভারসাম্য, সরলতা ও স্পষ্টতা: বঙ্কিমের অন্বিষ্ট। এখানে তারই পরিচয়।

[গ] তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমিদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক সরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন,—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদিগের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল,—তাহার কাছে বাকী রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এ দিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন্ ছার। হয় ত জমিদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমিদারের ব্যবসা মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।
[সাম্য, বঙ্গদর্শনে প্রকাশ ১৮৭৬, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৯]

এই অংশে বাক্যগুলি কাটা কাটা। পূর্ণ ক্রিয়াপদের সংখ্যা খুবই কম, কোনো কোনো বাক্যে তার বিলোপ। অল্পব্যবধানে একই ক্রিয়াপদের ('তাহাও দিল') বারবার ব্যবহার। সমস্তটা কথ্য ভাষার ঢঙে রচিত। শব্দ

ও ইডিয়ম প্রয়োগে ঔদার্য লক্ষণীয়। প্রয়োজনে দেশী বিদেশী শব্দ ও ইডিয়ম ব্যবহৃত হয়েছে। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার পরিবেশ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

[ঘ] গুরু॥ আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সেই সুখই কষ্টিপাতর।

শিষ্য॥ বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু॥ তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা বুঝিয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য ও উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য॥ সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তিব স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ, না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু॥ সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য॥ তবে কষ্টিপাথর কোন্‌টা? সমবায়, না অংশ?

গুরু॥ সমবায়ই কষ্টিপাতর। [ধর্মতত্ত্ব, প্রথমভাগ, অনুশীলন, ১৮৮৮]

সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ অনুশীলন-তত্ত্ব বঙ্কিম-মনীষার আশ্চর্য ফসল। মনে হয় যেন, লজিকের সূত্র। স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত গুরু-শিষ্য সংবাদে লেখক ধর্ম-তত্ত্বের দুরূহ জটিল বক্তব্যকে সংহত, স্পষ্ট, সরল রূপে উপস্থিত করেছেন। ভাষার প্রধান লক্ষ্য—সরলতা ও স্পষ্টতা। বঙ্কিমের এই ঘোষণা এখানে অবয়ব ধারণ করেছে। দুরূহ চিন্তার ভারবহনে সামর্থ্য ও অবলীলাক্রমে তা প্রকাশে নৈপুণ্য,—দুই-ই এখানে উপস্থিত। প্রবন্ধ-গদ্য যে যুক্তি, শৃঙ্খলা ও বিশ্লেষণের প্রকৃষ্ট বাহন, তা বঙ্কিম প্রমাণ করছেন।

[ঙ] এই দিন সমস্ত কৌরব সৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ—কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদু বংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং স্বয়ং দুর্য্যোধন, এই চারিজন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্য্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা-যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের

সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি গদাযুদ্ধ করিব।" কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্য্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহূত করিলে পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত ; যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্ব্বাহ করিলেন।

দুর্য্যোধন অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্য্যোধন বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; সকলকেই বধ করিব।" তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। [কৃষ্ণচরিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ। ১৮৮৬। ১৮৯২]

বঙ্কিমের প্রবন্ধ গদ্যের চূড়ান্তরূপ কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে পাই। এখানে ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু তা কথ্যভঙ্গিম। "ডুবিয়া রহিল", "ধরিল", "মারিল", "যুদ্ধ কর" ক্রিয়াপদে ঝোঁকটা পড়েছে কথ্য ভাষার দিকে। স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় ভাষার ছাঁচটা কথ্য। প্রকাশভঙ্গিতে এমন অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্য ও লঘুতা আছে যে মনে হয় কথ্যভাষা শুনছি। যেমন—"যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন।" এই তিনটি বাক্যের প্রচ্ছন্ন উপহাস ও লঘুতা পাঠক-শ্রুতিকে এড়িয়ে যায় না। দুর্য্যোধন-বধের মতো গুরুতর ব্যাপারটিকে লেখক এভাবেই উপস্থিত করেছেন। কৃষ্ণের বিচক্ষণতা ও যুধিষ্ঠিরের স্থূলবুদ্ধির পরিচয়টি এমন সরসভাবে লেখক উপস্থিত করেছেন যে পাঠকচিত্ত লেখকের মহাভারত-ব্যাখ্যার প্রতি ধাবিত হয়। এটাই বঙ্কিমের প্রধান গুণ, এটাই তাঁর স্টাইল ; আর এই স্টাইলের উৎস বঙ্কিমের প্রবল মনীষা, সরস মনীষা।

এই পাঁচটি উদাহরণে বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যের রূপ, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করেছি। দেখেছি বঙ্কিম কীভাবে সাধুগদ্যকে লঘু, সাবলীল ও অনায়াসগতি করে তুলেছেন। দেখেছি কীভাবে তিনি ভাষার ছাঁচকে লেখ্য থেকে কথ্য রূপের দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছেন। দেখেছি কীভাবে তিনি সরলতা, স্পষ্টতা ও সরসতা-গুণ আয়ত্ত করেছেন।

গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ভাষাপথিক নন, পথিকৃৎ। কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যের বিচিত্র রূপ ও ঐশ্বর্য তাঁহার নিপুণ লেখনীতে উৎসারিত হয়ে বাংলা গদ্যভাষাকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে গদ্যভাষা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে তিনি ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে যৌবনশ্রী দান করেছিলেন। একারণেই গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি ও বাংলা ভাষার চিরনমস্য।

১৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, হিন্দু কলেজের ছাত্র, আজীবন শিক্ষাব্রতী, সংবাদপত্র সেবক, শাশ্বত সমাজদর্শনের ব্যাখ্যাকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। অথচ তাঁর কীর্তি অনুযায়ী খ্যাতি তিনি পান নি। না পাবার কারণ তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা। একে তো বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ প্রভাবের দিনে তিনি প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তার উপর তাঁর হিন্দুত্ব-নিষ্ঠাকে হিঁদুয়ানি বলে উপহাস করা হয়েছিল এবং তিনি অলংকৃত বর্ণাঢ্য রসসাহিত্যোপযোগী ভাষাচর্চায় আগ্রহী ছিলেন না। মনে হয় এই-সব কারণে ভূদেব উপযুক্ত মূল্য পান নি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ভূদেবের জীবনাদর্শ সে-কালে ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়েছিল। "ভূদেবের ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়-তত্ত্ব, অখণ্ড ভারতের মহিমাতত্ত্ব, মাতৃভাষার সেবা ও ইংরেজী ভাষার সাধনাতত্ত্ব, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আনন্দ ও বৈরাগ্যতত্ত্ব, পারিবারিক জীবনের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌজন্যতত্ত্ব—প্রভৃতি বহুবিধ চিন্তা-বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতসাদৃশ্য, এমন কি যুক্তিসাদৃশ্য, লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। মনস্বী ভূদেব মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন—সাত্ত্বিক হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু কোনোপ্রকার গোঁড়ামি বা একদেশদর্শিতা ছিল না। তাঁর হিন্দুত্ব বিশ্বজনীনত্বেরি অপর নাম। বিশেষ একটি ধর্মতত্ত্বের নীতি অনুসারে তিনি ব্যক্তিজীবন যাপন করতেন কিন্তু অশেষ ধর্মোপাসনার আনন্দজ্যোতি ছিল তাঁর মননে ও চরিত্রে, সেই হেতু, তাঁর জীবনদর্শনে, সমাজচিন্তায় ও সাহিত্য-প্রবন্ধে।" [শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, 'বাঙালীর সাহিত্য', ১৯৬৩]

মনস্বী শিক্ষাবিদ সমাজ সংগঠক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতির প্রকৃতি-বিচারে এই পরিচয় নিরর্থক নয়। তাঁর গদ্যে এই পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তাঁর গদ্যের প্রকৃতি তাঁর চিন্তা ও জীবনাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে ভূদেবের প্রকৃতির মিল আছে। বিদ্যাসাগরী গদ্যের চিন্তাশৃঙ্খলা ও অক্ষয়কুমারের গদ্যের যুক্তিনিষ্ঠা ভূদেবের গদ্যে অনায়াসলক্ষণীয়। চিন্তায় ও আচারে যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্বজনীন হিন্দুত্বে আনুগত্য, ধর্মোপাসনার আনন্দজ্যোতি ভূদেবের গদ্যে একটি শান্ত সংযত শ্রী অরোপ করেছিল। ফলে তাঁর বিষয়গৌরবী গদ্যে বিষয়ী-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছিল। বাগ্‌বিন্যাসে মাত্রাবোধ, শব্দ গ্রহণে ঔদার্য, শব্দচয়নে ছন্দ ও পরিমিতিবোধ, বিষয়বস্তু উপস্থাপনে অনাড়ম্বর ঋজু ভঙ্গী, অন্যমত খণ্ডনে সর্বতোভদ্র শোভনতা, আত্মপক্ষ সমর্থনে শাণিত যুক্তি, বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল রূপে উপস্থিত করার নিত্য নিষ্ঠা ও প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে শিল্পঘন সরসতাদানের অভিপ্রায় ভূদেবের গদ্যকে প্রসাদগুণবিশিষ্ট প্রাঞ্জল করে তুলেছে। ভূদেবের ভাষা যথার্থ প্রবন্ধের ভাষা। যুক্তিপূর্ণ উক্তি ও উদ্দেশ্যপূর্ণ তত্ত্ব-তথ্যাদির যোগে প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে 'বন্ধ' ও বিন্যস্ত করা হয় যে গদ্যরচনায়, তাকে বলি 'প্রবন্ধ'। ভূদেবের রচনা এই অর্থে 'প্রবন্ধ' ও তাঁর গদ্যভাষা বিষয়গৌরবে গরীয়ান্ প্রবন্ধেরই ভাষা।

দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে ভূদেবের জন্ম। অসহ্য দারিদ্র্যকষ্টে তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একদিন ভূদেব চুঁচুঁড়ায় গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের পদ (মাসিক বেতন আট টাকা) লাভ করলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চন্দননগর বিদ্যালয়ের শিক্ষক (বেতন ষোল টাকা) ,কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষক (বেতন পঞ্চাশ টাকা), হাবড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বেতন দেড়শত টাকা), হুগলীর বাঙলা নর্মাল স্কুলের (১৮৫৬) অধ্যক্ষ (বেতন তিনশত টাকা), বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (বেতন পাঁচশত টাকা), ও শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় পরিদর্শক (বেতন পনেরো শত টাকা) হয়েছিলেন। আটটাকা বেতনে তাঁর কর্মজীবনের শুরু, মৃত্যুর পূর্বে শিক্ষা-উন্নতিকল্পে দেড়লক্ষাধিক টাকা দান করে গেছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিজীবনে যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা তাঁকে সাফল্য-শিখরে উন্নীত করেছিল সংবাদপত্র ও সাহিত্য সেবায় তা তাঁকে স্থায়ী কীর্তির অধিকারী করেছিল।

ভূদেব দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছিলেন। 'শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং

তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা' রূপে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারী তত্ত্বাবধানে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়। ভূদেব ছিলেন তৃতীয় সম্পাদক (৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮)। ভূদেবের সম্পাদনায় পত্রিকাটি গত শতকের অষ্টম দশকে খ্যাতিলাভ করে।

সংবাদপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনার ফলে ভূদেবের গদ্যে এসেছিল প্রাঞ্জলতা ও সরলতা। যুক্তিনিষ্ঠা ও বিনয় দিয়েছিল বাহুল্যবর্জিত স্বচ্ছতা ও অলংকার-বর্জিত নিরাভরণতা, আর মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনীষা দিয়েছিল গ্রাম্যতা-বর্জিত নাগরিকতা ও শুচিতা। সবটা মিলিয়ে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ-গদ্য।

ভূদেবের গদ্য প্রবন্ধ-গদ্য। কথা-গদ্য রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল না, তাঁর মন রসসাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল ছিল না। সেই কারণে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের (১৮৫৭) বিচার নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষাদর্পণ (১৮৬৪) ও এডুকেশন গেজেট (১৮৬৮) সম্পাদনার কাল থেকেই ভূদেব-গদ্যের নিজস্বতা দেখা দেয়। ভূদেবের মূল্যবান প্রবন্ধাদির অধিকাংশ এই দুই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা সাংবাদিক সুলভ অগভীর রচনায় পর্যবসিত হয় নি, সাহিত্য-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভূদেবের স্বকীয় গদ্যরীতির প্রকাশ ঘটেছে এই-সব গ্রন্থে: প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১৮৫৯), পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৭), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ১৮৯৫, ২য় ১৯০৫), স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০৫)। স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস কল্পনানির্ভর রচনা বলে ভূদেবের গদ্যরীতির স্বকীয়তা এখানে ততটা নেই।

এখন ভূদেবের প্রবন্ধ-গদ্যের কালানুক্রমিক উদাহরণ থেকে তাঁর ভাষা বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে।

[১] বস্তুতঃ পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। যে দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানে মৃত্তিকাতে এই শব শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূল দ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জ শরীর পুষ্ট হয়; সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ দ্বারা যে পশু স্বীয় দেহ রক্ষা করে, তাহার শরীরেও ঐ পরমাণু প্রবিষ্ট হয়। আবার

সে মরিলে ঐ সকল পরমাণু অন্য নানা প্রকারে অপর প্রাণীশরীরে আসিয়া থাকে। জগতে অনুক্ষণ এইরূপই হইতেছে। [প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১৮৫৯]

দৃশ্যত অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা প্রভাবিত এই গদ্যরীতি। বিজ্ঞান আলোচনায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরাসক্তি, যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাবাবেগরাহিত্য প্রয়োজন, তা এখানে আছে। হ্রস্ব বাক্য, অনিবার্য শব্দের ব্যবহার, সুষ্ঠু পদবিন্যাস ও অলংকার বর্জন এই গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য।

[২] পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নহে—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সে-ই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয় এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্যব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে। কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্য কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেইভাবেই রাখিলেই হইল। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুরঘর নয়? [পারিবারিক প্রবন্ধ, ১৮৮২]

এখানে ছোট ছোট বাক্য, তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগে সমগ্র অংশেই একটি সাবলীল গতি অনুভব করা যায়। ভবোচ্ছ্বাস ও বাগ্‌বাহুল্য এখানে সম্পূর্ণ বর্জিত। নিরলংকারই এখানে অলংকরণ। শেষাংশে গদ্য অনেকটা কথ্যভঙ্গিম হয়ে এসেছে, তাও সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় না।

[৩] মানুষ পথে চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্বেরটি অগ্রবর্তী হয়। অতএব গমনরূপ একটি কার্য্যের মধ্যে স্থিরভাব ও চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনের ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি-প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি-প্রভাবে বিশ্রাম।

প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিত-ধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত-গ্রহণ-ব্যাপারে সঙ্কোচন ও প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে। [সামাজিক প্রবন্ধ, ১৮৯২]

ভূদেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ থেকে এই অংশ সংকলিত। বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের তারিখ ও এই গ্রন্থের প্রকাশের তারিখ একই। যুক্তিনিষ্ঠা, কাটা কাটা বাক্য, অনিবার্য শব্দের প্রয়োগ ও বৃথা শব্দের অপ্রয়োগ, বিজ্ঞানোপযোগী প্রাঞ্জলতা ও যথার্থতা এই গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য। সরলতা ও স্পষ্টতাই এর লক্ষ্য। বঙ্কিমের অলংকার-প্রবণতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রবণতা থেকে এই গদ্য সম্পূর্ণ মুক্ত।

[৪] মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র দশায় পতিত এবং আর্য্যশাস্ত্রের শিক্ষাগুণে সর্ব্বতোভাবে উদারচেতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রদর্শিত হইলে রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যটি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজচিত্রই পরিষ্কার রূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজচিত্রাঙ্কনে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক রচনা।

বসন্তসেনা একটি গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটী অষ্ট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান; দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্নস্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোকজন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গরস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্পনৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং বিভব-শালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।

['মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধ, এডুকেশন গেজেট ১৮৮৭, বিবিধ প্রবন্ধে সংকলিত ১৮৯৫]

বাক্য ও পদবিন্যাসে লেখকের কুশলতা এবং শব্দ ব্যবহারে সংস্কারমুক্তির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি সরলতা ও নিরাভরণতা আছে। নিটোল অনুচ্ছেদ-রচনা কৌশলটি লক্ষণীয়।

[৫] এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছু-মাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরেজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরেজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র।.... .... ইংরেজ রাজের অধিকার-কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরেজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [আচার প্রবন্ধ ১৮৯৫]

শব্দচয়নে ছন্দ ও পরিমিতিজ্ঞান, বাগ্‌বিন্যাসে মাত্রাবোধ, অন্যমত খণ্ডনে সর্বতোভদ্র শোভনতা, আত্মপক্ষ সমর্থনে শাণিত যুক্তি, অব্যর্থ শব্দ ও যুক্তি-প্রয়োগে নৈপুণ্য এই গদ্যাংশকে এমন একটি ঋজুতা, স্পষ্টতা ও নিরলংকার সারল্য দিয়েছে যা সুলভ নয়।

এই সব গুণ ভূদেবের প্রবন্ধ-গদ্যকে তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর শুচিতা ও ঋজুতা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদিতা আত্মসাৎ করে ভূদেবের গদ্য মননপ্রধান রচনার বাহনরূপে দেখা দিয়েছে, অথচ অবরুদ্ধ-সংযত আবেগ এইসব গদ্যরচনায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত, তাও অনুভব করা যায়।

১৬ কালীপ্রসন্ন ঘোষ

বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৭২) কেবল বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র ছিল না, সেই সঙ্গে একদল গদ্যলেখকের উদ্ভবক্ষেত্রও ছিল। বঙ্কিমের ভাষারীতি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গদর্শনের পাতায়, সৃষ্টি করল একদল গদ্যলেখক যাঁরা বঙ্কিমী গদ্যরীতির অনুগামী। বিদ্যাসাগর গড়েছিলেন সাহিত্যিক গদ্য, রস সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। বঙ্কিম তা সৃষ্টি করলেন, তাঁর গদ্যে মানব মনের বিচিত্র ও গভীর অনুভূতি রূপ লাভ করল; আবার মনন-প্রক্রিয়ার বাহনরূপেও বঙ্কিম-গদ্য দেখা দিল। ভাষা ভাবের বাহন থেকে একদিকে রসের বাহন অপরদিকে চিন্তার বাহন হয়ে উঠল।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বহু লেখকের আবির্ভাব হল, তাঁদের হাতে গদ্যভাষা রসের বাহন ও চিন্তার বাহনরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। বঙ্কিমী গদ্যরীতি ছিল তাঁদের আদর্শ। তাঁরা আপন আপন গদ্যরীতি সৃষ্টি করলেন, গদ্যভাষার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আবিষ্কার ও ব্যবহার করলেন।

বঙ্কিমী গদ্যরীতির আদর্শে গদ্যচর্চায় যে-সব লেখক স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন, পরবর্তী অর্ধশতাব্দে (১৮৭৫—১৯২৫) তাঁদের দেখা পাই। উল্লেখযোগ্য নামগুলি হচ্ছে: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু, সত্যচরণ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, মীর মশারফ হোসেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অঘোরনাথ গুপ্ত, সত্যব্রত সামশ্রমী, কালীবর বেদান্তবাগীশ, হরিকিশোর তর্কবাগীশ, নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বঙ্গদর্শন-অনুগামী যে-সব সাময়িকপত্রে এঁদের লেখা প্রকাশিত হত, তাদের নাম: জ্ঞানাঙ্কুর, নব্যভারত, প্রচার, ভ্রমর, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, বঙ্গবাসী, পঞ্চানন্দ, আর্যদর্শন, বান্ধব, সাধারণী, নবজীবন, হিতবাদী।

বঙ্কিমী ভাষারীতির অনুগামী কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) কলকাতা থেকে দূরে ঢাকা শহরে ও ভাওয়ালে জীবন অতিবাহিত করেন। বঙ্গদর্শনের আদর্শে তিনি ঢাকা থেকে একটি মাসিকপত্র 'বান্ধব' (১৮৭৪) প্রকাশ করেন, পরে প্রকাশিত নবপর্যায় বান্ধব (১৯০১) পূর্বসূরীর পদাংকানুসারী। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শুভসাধিনী' (১৮৭০) কিছুকাল সম্পাদনা করেন। ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার থাকা কালে (১৮৭৭—১৯০২) 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানাভাবে সমকালীন লেখকদের আনুকূল্য করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনা গুণে বান্ধব গত শতকের শেষপাদে নেতৃস্থানীয় সাহিত্যপত্রে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন বাগ্মী ও সাংবাদিক। তাঁর গদ্যরচনায় বাগ্মিতা ও সাংবাদিকতা-গুণ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮—১৮৮৫) সঙ্গে কালী-প্রসন্নের তুলনা করা চলে। কেশবচন্দ্র মাসিক ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), দৈনিক সুলভ সমাচার (নভেম্বর ১৮৭০) ও মাসিক নববিধান (ডিসেম্বর ১৮৮০) প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৪) ও নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের (১৮৮০) প্রতিষ্ঠাতা-মুখপাত্ররূপে সারাদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তাঁর গদ্যরচনায় বাগ্মিসুলভ ওজস্বিতা, ভাবোচ্ছ্বাস ও ধ্বনিরোল প্রাধান্য লাভ করেছে। বঙ্কিম-রীতিকে কেশবচন্দ্র অস্বীকার করেছেন, কারণ জীবনাদর্শ, ধর্মমত ও বৃত্তির বিভেদ। বঙ্কিম প্রগতিশীল হিন্দু, কেশবচন্দ্র প্রগতিশীল ব্রাহ্ম; বঙ্কিমের উপাস্য অনুশীলন-তত্ত্বের মূর্তিমান-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্রের উপাস্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; বঙ্কিমের অবলম্বন মুক্তি, কেশবের ভাবাবেগ। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত

সাহিত্যিক, কেশবচন্দ্র বাগ্মী ও সাংবাদিক। একারণে বঙ্কিমী গদ্যরীতির প্রভাব কেশবচন্দ্রের লেখায় নেই।

কিন্তু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্কিম-প্রভাবিত। কালীপ্রসন্ন কেশবের মতোই বাগ্মী, কিন্তু ধর্মগুরু নন; বঙ্কিমের মতো সমাজ-সংস্কারক, বঙ্কিমের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ও মূলত সাহিত্যিক। বাগ্মিতা-গুণের ফলে কালীপ্রসন্নর গদ্যরীতি ওজস্বিতা, ভাবোচ্ছ্বাস ও ধ্বনিরোলে সমৃদ্ধ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও কার্লাইল তাঁর প্রেরণাস্থল। তাঁর দর্শনচিন্তা ও সমাজচিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধে এই তিন মনীষীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

কালীপ্রসন্নর প্রধান গদ্যরচনা তিনটি: প্রভাতচিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩). নিশীথচিন্তা (১৮৯৬)। অন্যান্য গ্রন্থ: নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯), সমাজশোধনী (১৮৭২), ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবনযজ্ঞ (১৮৯৫), মা না মহাশক্তি (১৮৯৫), জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫), ছায়াদর্শন (১৯০৫)—গুরু গদ্যরচনা। ভ্রান্তিবিনোদ (১৮৮১) ও প্রমোদ লহরী অথবা বিবাহরহস্য (১৮৯৫)—লঘু গদ্যরচনা।

বান্ধব পত্রিকায় সাহিত্যসমালোচনার একটি বিশিষ্ট ধারা কালীপ্রসন্ন প্রবর্তন করেছিলেন। কি সমাজে কি সাহিত্যে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁর সমালোচনায় এই রক্ষণশীলতার পরিচয় পাই। বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীলতার নমুনা এখানে উদ্ধার করি।

"ভাষার বিশুদ্ধি বঙ্গদেশে একটা বিচিত্র কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা একটা ভাষা কি,—উহার আবার শুদ্ধি অশুদ্ধি অথবা বিশুদ্ধি কি,—এবং সেই মনগড়া বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য, একটা মনঃকল্পিত ব্যাকরণই বা আবার কি—এইরূপ একটা কথা ইদানীং অনেকের কাছে একটা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ......এই পুস্তকে দুইটি মাত্র শব্দ আমাদের কানে একটুকু বাজিয়াছে। (১) নিমগ্ন অর্থে 'নিমজ্জিত'। (২) শরীর অর্থে 'কায়া'। শেষোক্ত শব্দটি এইক্ষণ বাঙ্গালা অভিধানেও গৃহীত হইয়াছে।" (শ্রী সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'-এ উদ্ধৃত)

বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় কালীপ্রসন্নর এই গোঁড়ামি তাঁকে বিদ্যাসাগরের যুগে স্থাপিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাবিষয়ক ঔদার্য ও প্রগতি-চিন্তা কালীপ্রসন্ন গ্রহণ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যে-কথা লিখেছিলেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য।—

"ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকলস্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্য' এবং 'সসৈন্যে' দুই-ই লিখিয়াছি, একটু অর্থ-প্রভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত' এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ-নির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব, ইচ্ছা আছে।" [রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা, ১৮৯৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কারমুখী মন যে-সব শব্দকে গ্রহণে উন্মুখ, কালীপ্রসন্নর রক্ষণশীল মন তা গ্রহণে পরাঙ্মুখ। যদিচ তিনি ইংরেজিনবীশ, কালীপ্রসন্নর ভিত্তিভূমি ছিল সংস্কৃত। বাংলাগদ্যভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালনে তাঁর আগ্রহের কারণ এখানে পাই।

কালীপ্রসন্নর বাগ্মিসুলভ গদ্যরীতির কোনো বিবর্তন ঘটে নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি একই চরিত্রের গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবু স্বীকার করতেই হবে বঙ্কিমী গদ্যরীতির কাঠামো আশ্রয় করে অন্যতম গদ্যনির্মাতারূপে কালীপ্রসন্ন দেখা দিয়েছিলেন।

গদ্যনির্মাতা—অভিধাটি কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে খুব খাটে। তাঁর গদ্যরচনার বিশেষ গুণ এই অভিধায় নিহিত। কালীপ্রসন্নর গদ্যরচনায় সযত্ন আয়াস অনায়াসলক্ষণীয়। তিনি গদ্যরচনাকে কখনই সহজসাধ্য মনে করেন নি। তাঁর লিরিক্‌ধর্মী গদ্য শ্রমলব্ধ নিপুণতা ও আয়াসের ফল।

যদিও কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'নিভৃতচিন্তা' বা 'নিশীথচিন্তা' বা 'প্রভাতচিন্তা' তথাপি একথা অবশ্যস্বীকার্য, তা সরব ফেনায়িত চিন্তা। এই তিনটি গ্রন্থে লেখকের চিন্তা আছে, অনুভূতি আছে। এগুলিতে মনস্বিতা আছে, কবিত্ব আছে। আর আছে সযত্ন মণ্ডনচাতুর্য। অনেক সময়ই মনে হয়, মণ্ডন শিল্পের প্রখর দীপ্তিতে অনুভূতির মৃদু আলোক বুঝি ম্লান

হয়ে যায়। বস্তুত তাই ঘটেছে। তাঁর অনুভূতিতে গভীরতা, প্রশান্তি ও স্থৈর্যের অভাব আছে। সে অভাব তিনি পূরণ করেছেন সযত্নগ্রথিত শব্দাবলী, নিপুণভাবে গঠিত গুরুবাক্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ বাক্যযোজনা ও শ্রমসাধ্য মণ্ডনচাতুর্যের দ্বারা।

কালীপ্রসন্নর গদ্য আড়ম্বরপূর্ণ গদ্য—অলংকৃতা রমণীর মতো তার গর্বিত পদক্ষেপ। তাঁর গদ্যের চলন ভারী; শব্দৈশ্বর্যের ঝিকিমিকি, অলংকারের রিনিঝিনি, সযত্নরচিত বিশেষণের কিরণ-বিচ্ছুরণ প্রায়শই ঘটে। কালীপ্রসন্ন তাঁর গদ্যকে বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সাজিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ জানতেন: কার্লাইল ও ইমার্সনের সচেতন অনুরাগী ছিলেন। ফলে তাঁর গদ্যে শোনা যায় তৎসম শব্দের ধ্বনিরোল ও ঝংকার।

কিন্তু তাঁর ভাষার একটি দোষ ছিল—ভাষার অসংযম। তিনি শব্দপ্রয়োগে যেমন যত্নশীল, তেমনি শৌখিন ও অসংযমী ছিলেন। ফেনায়িত আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাস্রোতে তাঁর চিন্তাধারা অবারিত বেগে প্রবাহিত হয়েছে। মাত্রাধিক উচ্ছ্বাসের তাপে বক্তব্যকে তরল ও ফেনায়িতরূপে প্রকাশ করা ছিল সেদিনের প্রথা। ফলে কালীপ্রসন্নর রচনার ফলশ্রুতি নিবিড় ও সংহত নয়; তা অগভীর, জলজপুষ্প ও শৈবালসমাকীর্ণ তটিনী; দ্রুতগতি স্রোতে তা পাঠক-মনের উপর দিয়ে ভেসে যায়, স্থিতিলাভ করে না।

এই অগভীর অসংযমী গদ্যের উৎস কালীপ্রসন্নর ব্যক্তি-চরিত্র। তিনি বাগ্মী বলে খ্যাত ছিলেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে (১৮৬৩) কলকাতার ভবানীপুরে 'যিশু-প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম ও গির্জার খ্রীষ্টধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে কালীপ্রসন্ন রেভারেণ্ড ডাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মীরূপে ও স্ব-প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা'র বক্তারূপে ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করে বাগ্মীরূপে কালীপ্রসন্নর খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল। এই বাগ্মিতাই তাঁর পক্ষে সংহত সংযত গদ্যরচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাগ্মীর পক্ষে স্বাভাবিক যে উচ্ছ্বাস যে দ্রুতগতি ও অলংকৃত বাক্যবিন্যাস, যে শব্দাড়ম্বর সৃষ্টি—তা কালীপ্রসন্নর গদ্যে অনায়াসলক্ষণীয়। তাঁর গদ্যে শব্দ ও অর্থালংকারের ঔজ্জ্বল্য আছে, আর আছে বাগ্মীর অসংযম ও তারল্য। সবটা মিলিয়ে তাঁর গদ্য অগভীর ও অসংযমী। বাগাড়ম্বর ও অতিকথনের বেড়া ডিঙিয়ে যদি কালীপ্রসন্নর গদ্যরাজ্যে উপনীত হতে পারি, তাহলে আমরা একটি

সযত্ন-রোপিত ভাষা-উদ্যানের সন্ধান পাব, যা সুষ্ঠু বাক্যের কেয়ারি-গ্রথিত ও শব্দোচ্ছ্বাসের কলপ্রবাহে নিয়ত মুখরিত। কালীপ্রসন্নর গদ্যের ধ্বনিরোল পাঠককে মুগ্ধ করে।

এইবার কালীপ্রসন্নর এই অলংকৃত ধ্বনিসমৃদ্ধ গদ্যরীতির নমুনা চয়ন করি। তাঁর গদ্যের কোনো বিবর্তন হয় নি। যে-কোনো একটি গ্রন্থ থেকেই উদাহরণ চয়ন করলে আমাদের কার্য সিদ্ধ হবে। প্রভাতচিন্তা (১৮৭৭) গ্রন্থভুক্ত তিনটি প্রবন্ধ থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক্।

[১] কবিতার ভাষাও এই (প্রাকৃতিক) নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রসগাম্ভীর্য অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অমৃতস্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতি জ্বলদক্ষর রেখা পাঠ করে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে বিলীন হয়, তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়, কে আর তাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলয় পায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দর ছবি দেখিয়া চকিত বয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্ত-বায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কহিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অস্পষ্ট থাকিবে ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন মনোময় জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, জীবন ও মৃত্যু সমস্তই তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। [নীরব কবি, প্রভাতচিন্তা]

পিরীয়ডিক বাক্যের নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রবাহের উৎক্ষেপ ও পুনর্গতি, ভাবপ্রবাহ অনুযায়ী স্বরগ্রামে আরোহ অবরোহ, উপমা উৎপ্রেক্ষা বিশেষণের সুপ্রচুর প্রয়োগ এই গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য। শব্দ-ব্যবহারে লেখকের রক্ষণশীলতা

লক্ষণীয়—স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ সহজেই চোখে পড়ে—'ভয়বিহ্বলা ভাষা' 'জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী'। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ততটা গোঁড়ামি নেই—'পর্যবসিত হয়', 'উত্থিত হয়', 'প্রাপ্ত হয়' যেমন আছে, তেমনি আছে 'জড়ীভূত হইয়া যায়', 'চাহিয়া থাকে', 'বিচরণ করে'। 'বিলয় পায়' ও 'বিলুপ্ত হয়'—দুই-ই আছে। মজার কথা, কালীপ্রসন্ন যে শব্দ-প্রয়োগের নিন্দা করেছেন (পূর্বে উদ্ধৃত), এখানে সেই শব্দই প্রয়োগ করেছেন 'নিমজ্জিত'। পূর্বে বলেছিলেন এই শব্দ "কানে একটুকু বাজিয়াছে।"

[২] এই দুর্লভ মানবজীবন অনেকের পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, অন্যরূপ অভাবের তাড়না নাই ;—তদুপরি হৃদয় স্ফুর্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে, আবার রাত্রি, আবার দিন,—আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো, সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে ;—এক, দুই, তিন করিয়া ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহহস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না। [হর গৌরী, তদেব]

বিষয়ের তটভূমিতে ভাবাবেগের প্রবল স্রোত এখানে আছড়ে পড়েছে। তরঙ্গোচ্ছ্বাস ও ধ্বনিরোল এখানে সবকিছুর উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে।

[৩] হায়! যে দেশে স্তাবকতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, সে-দেশে কাহার আর কিসে সিদ্ধি হইবে ? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মন্ত্ররক্ষায় সকলেই অশিক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও আস্ফালনের নাম উৎসাহ, চীৎকারের নাম উদ্যম, অঞ্চলবায়ুসেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিদ্রার নাম অধ্যবসায়, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায় ? যাহারা প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ে যে কার্য্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা না হইতেই তাহার ফলভোগের জন্য ব্যস্ত হয়,—এক রাত্রিতেই রোম নির্ম্মাণ করিতে চাহে, শ্মশ্রূদ্গমের পূর্ব্বেই জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কীর্তিশৈলে আরূঢ় হইয়া বসে, তাহাদিগের আর আশা কি ? তবে জনি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক দান করিবে ? [সাধনা ও সিদ্ধি, তদেব]

দুটি হ্রস্ব (প্রথম ও চতুর্থ) বাক্যের মাঝখানে দুটি দীর্ঘ (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) বাক্য স্থাপনা করে লেখক এখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যেব মধ্যে সংহতি রেখেছেন। প্রশ্নাত্মক বাক্যের দ্বারা লেখকের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতি ভাবোচ্ছ্বাস, শব্দাডম্বর ও অলংকারপ্রাচুর্য প্রশ্নাত্মক বাক্যের তটকে আঘাত করে উচ্ছ্রিত হয়েছে।

বাগ্মী কালীপ্রসন্নর এই গুণ, এই তাঁর দুর্বলতা।

১৭ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫) গ্রন্থে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) সম্পর্কে লিখেছেন :

'পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখা সকল যে পর্য্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষর জ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হতেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কিনা বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে 'কাল দাই' বলে ডাকতুম—বড় দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন ; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।'

বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার মলেআর তাঁর দাসীকে সদ্য-রচিত নাটক পড়ে শোনাতেন,—এই গল্পটি এখানে মনে পড়ে যায়। সারল্য ও স্পষ্টতা—দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখার বড়ো গুণ। যুক্তি শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা—তাঁর রচনায় কি গদ্যে কি পদ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের (১৮৭৫) ভাষার আলোচনা থেকে আমরা অনায়াসে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য-ভাষায় উপনীত হতে পারি। দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের সদৃশ অংশের তুলনা থেকেই তাঁর গদ্য ভাষার প্রকৃতি বিচার করা সম্ভব।

(ক) ওঁ বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম যিনি সর্বমূলাধার।
অগণন দেবতা ইঁহারে দেয় পূজা উপহার॥

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম, দশম অধ্যায়)

(খ) আমাদের দেশের সাধনের প্রধান মন্ত্র যেমন ওঙ্কার, সাধনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অর্থাৎ মোট সত্য। (নানাচিন্তা, সাধনের সত্য)

(গ) হস্ত তাঁর নাই কিন্তু করেন গ্রহণ।
পদ নাই—করেন সর্বত্র বিচরণ॥
চক্ষু নাই, দেখেন সমস্ত আগু পিছু।
কর্ণ নাই, শোনেন যে কহে যা কিছু॥ ....
গঠেন নিতি নিতি যার যা চাই।
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার সরব মূলাধার।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম, অষ্টম অধ্যায়)

(ঘ) তাঁহার চক্ষু নাই অথচ সব দেখিতেছেন, কর্ণ নাই অথচ সব শুনিতেছেন, হস্ত পদ নাই অথচ সব স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব কার্য প্রবর্তনা করিতেছেন। (আর্য ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত)

(চ) নিশি অবসান প্রায়
সুখে সবে নিদ্রা যায়
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চায়।
যা দিয়া হৃদয় মাঝে
মঙ্গল আরতি বাজে
পুণ্যগন্ধী সমীরে নাচায়॥
এ হেন সময়ে কবি
উঠিল চেতন লভি
বাহিরিল বাহির উদ্যানে।.........
মন্দ মন্দ বায়ু বহে
কবি মনে মনে কহে
আহা কি সুন্দর এই স্থান॥ (স্বপ্নপ্রয়াণ, ঊনশেষ স্তবক)

(ছ) মনে কর শেষ রাত্রে একজন কবির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকে

অন্ধকার দেখিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।.........তাহার পরে যখন রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া দিবসের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, এবং আর কিছুকাল পরে যখন সবিতাদেব হিরণ্ময়জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন কবির মনের স্বপ্নালোক জাগ্রত বিশ্বলোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। (নানাচিন্তা)

এই তিনটি যুগ্ম-উদাহরণ (ক-খ, গ-ঘ, চ-ছ) থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যধর্মী পদ্যভাষা ও গদ্যভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়। যুক্তি, শৃঙ্খলা, প্রাঞ্জলতা, স্পষ্টতা, সারল্য এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। এই ভাষার ভিত্তি লোকভাষা। বঙ্কিমী বিশেষণসমৃদ্ধ বর্ণাঢ্যভাষা ও রবীন্দ্রনাথের উপমা-উৎপ্রেক্ষা সমৃদ্ধ কাব্যধর্মী ভাষা, দুয়ের প্রভাব থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যভাষা মুক্ত। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখে আমরা প্রতারিত হই, ভাবি এ বুঝি সাধু গদ্যরীতি। আসলে এ গদ্যরীতি সাহিত্যিক কথ্যরীতি। কারণ চলতি ভাষার বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণভঙ্গী, মুখের ইডিয়াম, পদবিন্যাস ও বাক্যসজ্জার বিশিষ্ট ঢঙ এই ভাষায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাকৃস্পন্দী গদ্যভাষা রূপে এই ভাষার প্রতিষ্ঠা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও যোগেশ বিদ্যানিধির গদ্যভাষার সহযাত্রী দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যভাষা। এই গদ্য ভাষার ভিত্তি যে কথ্যভাষা, তা রবীন্দ্র-প্রমথ-সংস্কারসাধিত শিষ্ট ভাষা নয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সুবক্তা, ভারতী-পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর প্রতিভা বিচিত্রমুখী। কাব্যে গণিতে ভাষাতত্ত্বে দর্শনে কাগজের বাক্স ও বাংলা ক্ষিপ্রলিপি-অক্ষর-রচনায় তাঁর সমান কৌতূহল ও অধিকার ছিল। আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদাসীন, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে বাংলা গদ্যের মহৎ শিল্পীরূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো প্রয়াসই তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাই তাঁর গদ্যরচনায় অর্ধ-মনস্কতার ছাপ আছে।

লোকভাষার অনায়াসগতি ও সাবলীলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও নমনীয়তা দ্বিজেন্দ্র-নাথের ভাষায় সঞ্চারিত। বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে যে সরসতা লঘুতা ও আটপৌরে ভাব থাকে তা এই ভাষারীতির প্রাণ। এই রীতির প্যাটার্ন স্বভাবানুগামী। এতে হুতোমী ভাষার অশ্লীলতা বা বীরবলী ভাষার কৃত্রিমতা নেই, গ্রাম্যতা ও শহুরেআনা নেই। বাংলা গদ্যকে গ্রাম্য পর্যায়ে না নামিয়ে ও কৃত্রিম শিষ্ট

পর্যায়ে না তুলে, কী ভাবে অনায়াসগতি প্রাঞ্জল সাবলীল সাহিত্যিক কথ্যভাষা-রূপে ব্যবহার করা যায়, তা দ্বিজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

তাঁর মুখ্য গদ্য রচনা : তত্ত্ববিদ্যা (চার খণ্ড ১৮৬৬-৬৯), গীতাপাঠ (রচনা ১৮৯৩। প্রকাশ ১৯১৫), নানা চিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০), চিন্তামণি (১৯২২)। কাব্য : মেঘদূত (১৮৬০), স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫), কাব্যমালা (রচনা ১৮৮০-১৯০০। প্রকাশ ১৯২০)।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির কালানুক্রমিক নমুনা চয়নের আগে পুনর্বার স্মরণ করি, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের (১৮৭৫) ভাষা। কারণ এর কাব্যভাষায় আছে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির ধর্ম—যুক্তিনিষ্ঠা ও প্রাঞ্জলতা। স্বপ্নপ্রয়াণের আগে ও পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা বঙ্কিম-যুগ থেকে রবীন্দ্র-যুগ পর্যন্ত, ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যভাষার নমুনা থেকে আমরা অনায়াসে তাঁর গদ্যভাষায় উত্তীর্ণ হই। তাঁর গদ্যস্টাইলের পরিচয় কাব্যে পাই। নিম্নধৃত তিনটি স্তবক তার উদাহরণ।—

(অ) আইল অদ্ভুতরস দল-সনে ;
লেঙচিয়া চাল-চলি লাফ দিয়া উঠে সিংহাসনে।
কে যে কোথাকার ঠিক নাই তার
বসিলেন ঠেস দিয়া সহাস্য-বদনে
মন্ত্রী আসি বসিল পেচক মুখ গম্ভীর করিয়া।

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত স্বপ্নপ্রয়াণ (১৯৬৪), বিষাদপুর প্রয়াণ, পৃ ৬৭]

(আ) কিন্তু সখে মাটিকে ছাড়িয়া দিলে
শোভাশূন্য ভোঁ ভোঁ ছাড়া আর কিছু থাকে না নিখিলে
জ্ঞানী জনে বলে
মাটিতেই ফলে
চতুরবরগ ফল ফলাতে জানিলে।

[তদেব, বিলাসপুর প্রয়াণ, পৃ ৩৭]

(ই) পড়িল দু'এক ফোঁটা কবির মাথায়।
খোলে না যে ছাতা খানা একি হল দায়॥

দ্বিতীয় তৃতীয় টানে খুলে গেল ছাতা।
ভিজিবার দায় থেকে বেঁচে গেল মাথা॥

[কবির বিপদ, কাব্যমালা]

এই তিনটি উদাহরণে সাধুভাষার পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়েছে, এর চাল গদ্যের চাল—যুক্তি, প্রাঞ্জলতা ও চিন্তাশৃঙ্খলা। অথচ মৌখিক বাগ্‌বৈশিষ্ট্য এখানে স্বীকৃত, ঘরোয়া আটপৌরে কথ্যরীতিরই প্রাধান্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় এইসব গুণেরই স্বীকৃতি।

[১] কেহ কেহ বলেন যে আমাদের আপনাদের জ্ঞান একেবারেই অকর্ম্মণ্য, ঈশ্বরবিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলে তাহাই শিরোধার্য্য! এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইঁহাদের কাহারো মনে যদি এই সত্যটি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, মূঢ়ভাবে নহে—অন্যের মতানুসারে নহে—কিন্তু সম্পূর্ণ সজ্ঞানভাবে ও স্বাধীনভাবে, আমরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, ঈশ্বর বিষয়ে আমারদিগকে অন্যের মতামত অন্বেষণ করিয়া সারা হইতে হইবে না, আমারদের আপনাদের অন্তরেই সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত আছে; বাহিরে আমরা পরাধীন বটি, কিন্তু অন্তরে আমরা স্বাধীন,—তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করত যথোচিত কৃতার্থ হই। [তত্ত্ববিদ্যা, ভূমিকা, ১৮৬৯]

'ঈশ্বরেতে', 'আমারদিগকে' পাঠ থাকা সত্ত্বেও এই গদ্যাংশের সারল্য ও প্রাঞ্জলতা অবশ্যস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ গোড়া থেকে বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত, কথ্যভঙ্গিম বাক্‌রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্কৃত সমাস ও সন্ধির বাহুল্য নেই, বিশেষণের সমারোহ নেই, অলংকারের প্রাচুর্য নেই। 'প্রকাশ পায়'—ক্রিয়াপদের সারল্য লক্ষণীয়। কথ্যভঙ্গিটি এই সব ক্রিয়াপদে লক্ষ্য করা যায়—'সারা হইতে হইবে না', 'আমরা পরাধীন বটি', 'কৃতার্থ হই'।

পরবর্তী উদাহরণগুলি গীতাপাঠ (রচনা ১৮৯৩। প্রকাশ ১৯১৫), নানাচিন্তা (১৯২০) ও প্রবন্ধমালা (১৯২০) থেকে গৃহীত। দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যরীতি এগুলিতে সমধিক পরিস্ফুট। বাঙালির মুখের ভাষা—তার বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গী ও পদবিন্যাস-কৌশল, তার বাগ্‌ধারা (ইডিয়ম ও প্রবাদ) ও বাক্যসজ্জারীতি, দেশীবিদেশী শব্দের সোৎসাহ ব্যবহার ও তৎসম-তদ্ভব-দেশী শব্দযোগে নোতুন শব্দ উদ্ভাবনৈপুণ্য—সবই এখানে শিল্পরূপ পেয়েছে। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি এই বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধার করা যায়:—'সাধন-

পদ্মানদী','গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল', 'আমার সহ্য আছে ঢের', 'যাত্রীভায়ারা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন' (৩ সংখ্যক উদাহরণ) ; 'বলিয়া ফ্যালাই ভাল', 'বলিয়া খালাস', 'কুমিরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে', 'কান দিয়া সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়', 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী', 'যে শেখে ঠেকিয়া শেখে', 'কোমর-জলের মহারথী', 'হাঁটু-জলের মহারথী' (৪ সংখ্যক উদাহরণ) ; 'লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল', 'উঁচু-দরের বায়ুপ্রধান শিক্ষক ছিলেন', 'মুখের ফুঁয়ে পিত্তানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল'. 'ইয়ঙ্‌ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল', 'ছোঁড়ার দল ও গোঁড়ার দল' (৫ সংখ্যক উদাহরণ) ; 'বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে' (২ সংখ্যক উদাহরণ)। এইসব কথ্যভঙ্গিম বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ নিম্নধৃত গদ্যাংশগুলিকে সরস, প্রাঞ্জল, সরল ও আটপৌরে রূপ দিয়েছে।

[২] এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্ গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকচ্ছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। [গীতাপাঠ, সূচনা]

[৩] আনন্দ সম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা ; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারারুদ্ধ ; কাজেই, আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্ত্তার আন্দোলন একপ্রকার 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'। এ-রকমের বাক্যবাণ আমার সহ্য আছে ঢের ; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম—যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ-যোগে তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত ; অতএব, যাত্রীভায়ারা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন। [তদেব, তৃতীয় অধিবেশন, শেষাংশ]

[৪] আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে

কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোথ কান বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল ; যে শোনে সে শুনিবে, যে না শোনে না শুনিবে ; তুমি তো বলিয়া খালাস ! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক গঙ্গার ঘাটে কুমিরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা শহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না, তাহা এক কান দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্ক-সদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুগ্রহে ভরসা করিয়া ; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়া আর এক কান দিয়া সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যকার একজনকেও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী ! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে 'ঠেকিয়া শেখে', কিন্তু কাহাকে বলে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে ; 'ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছ 'জলে নাবিও না—গঙ্গায় কুমির দেখা দিয়াছে।' পাঁচজন তোমার সে-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে, আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জল-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা। হাঁটু-জলের মহারথীরা দ্রুতগতি ডাঙায় উঠিল—ইহারই নাম দেখিয়া শেখা। [নানা চিন্তা, দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব]

[৫] আমাদের দেশে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জ্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রবর্ত্তক ছিল। ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর যে কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজিও নামক একজন উচু-দরের বায়ুপ্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহারই মুখের ফুঁয়ে পিত্তানল প্রজ্জ্বলিত

হইয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই অঙ্কুর যখন কালক্রমে সতেজ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় 'ইয়ঙ্ বেঙ্গালের দল' এবং বাঙ্গালি ভাষায় 'ছোঁড়ার দল' উপাধি প্রাপ্ত হইল। অন্যকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাধির ভার স্কন্ধে বহিতে হয়—এই গতিকে উপাধিপ্রদাতারাও একটি পাল্টা উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন—কি? না, গোঁড়ার দল। বঙ্গসমাজে, এইরূপে, দুই পক্ষের সৃষ্টি হইল—গোঁড়ার দল এবং ছোঁড়ার দল; গোঁড়ার দল এ-পক্ষ, এবং ছোঁড়ার দল ও-পক্ষ। [প্রবন্ধমালা, সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা]

সাহিত্যিক কথ্যরীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এইসব উদাহরণ। এগুলি সর্বাংশে বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। এর মূল লোকভাষা—দৈনন্দিন সংলাপ ও বাগবৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে এর প্রাণশক্তি। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ভাষারীতির অন্যতম প্রধান শিল্পী।

১৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিম যুগের তিন প্রধান গদ্যলেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব পড়ে নি। আমরা লক্ষ্য করেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বর্ণাঢ্য বিশেষণ-অলংকার-সমৃদ্ধ রীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি এবং রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করার আগেই চল্লিশোত্তীর্ণ দ্বিজেন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ গত শতকের শেষ দশকে মাত্র পাঁচখানি বাংলা কেতাব লেখেন, তখন রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতির নিজস্বতা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয় নি, এবং বঙ্কিম-যুগের অবসান ঘটছে। বঙ্কিমের মৃত্যু ও শিকাগো ধর্মসম্মেলন-অন্তে বিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তন একই সময়ে ঘটেছে, কিন্তু তিনি বঙ্কিম-প্রভাব বা রবীন্দ্র-প্রভাব—কোনোটাকেই স্বীকার করেন নি। বিবেকানন্দের চলতি গদ্যরীতির উৎস তাঁর প্রবল সহাস্য প্রাণবান ব্যক্তিত্ব। ধর্মসাধনা ও সমাজসংস্কারে তাঁর যে স্বকীয়তা ও সম্রাট্‌-মহিমা, বাংলা গদ্যচর্চায় সেই স্বকীয়তা ও বলদৃপ্ত পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে। দুঃখের বিষয় বাংলা গদ্যভাষা এই বীর-সন্ন্যাসীর সম্পূর্ণ মনোযোগ লাভ করে নি।

তৃতীয় জন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) গদ্যরীতিতে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। গদ্যচর্চা শুরু করেছেন বঙ্কিমী রীতিতে, কিন্তু সেখানে আবদ্ধ থাকেন নি, দু দশকের মধ্যে স্বকীয় রীতিতে উপনীত হয়েছেন। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের দুটি রচনা প্রকাশিত হয়—'বাল্মীকির জয়' নিবন্ধ (১৮৮০-৮১, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮১) ও 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস (১৮৮২-৮৩, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১৬)। এই দুটি গ্রন্থে বঙ্কিমী-রীতির আধিপত্য। হরপ্রসাদের স্বকীয় গদ্যরীতি পরিস্ফুট হল 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে ('নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯১৮-১৯, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯২০) ও শেষের দিকের লেখা প্রবন্ধনিচয়ে।

বাংলা ভাষার প্রতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যে বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, তার একটি প্রমাণ, তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। 'কালেজী শিক্ষা' প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮৭-সংখ্যায় প্রকাশিত) এর পরিচয় স্থল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ করেন বঙ্কিমচন্দ্র ; তখন হরপ্রসাদ ও আশুতোষ তাঁকে সমর্থন করেন, আশুতোষের প্রস্তাব সিনেটে গৃহীত হয়। সাহিত্যের আদর্শ ভাষা সম্পর্কেও হরপ্রসাদ অভিমত দিয়েছিলেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮৮-সংখ্যায় প্রকাশিত) তিনি ভাষাব্যবহার সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। সাধু বা সংস্কৃত, অসাধু বা প্রাকৃত—ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ জাতিভেদ তিনি অগ্রাহ্য করেন ; স্টাইলের উপযোগিতাই তাঁব কাছে বড কথা, এ বিষয়ে কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নৈহাটির নৈয়ায়িক পণ্ডিত-বংশের সন্তান। সংস্কৃত ন্যায়-শাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য লজিক দুই-ই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তার মন নৈয়ায়িক মন। সুতবাং তাঁর গদ্যভাষায় যুক্তি শৃঙ্খলা ও বিচার প্রাধান্য লাভ করেছে। এবিষয়ে গুরু বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। বঙ্কিমের মনও যুক্তিসিদ্ধ মন, যুক্তিশৃঙ্খলা ও বিচারে তাঁরও প্রবল অনুরাগ।

কিন্তু হরপ্রসাদ এখানেই ক্ষান্ত হন নি। বাংলা গদ্যরীতির মূলে তিনটি মৌলিক রীতির সন্ধান তিনি পেয়েছেন ('বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ)। তাঁর মতে এগুলি হল—ফারসিবহুল আদালতী রীতি, সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী রীতি, আর উভয়ের মধ্যগা বিষয়ী লোকের রীতি। শেষোক্ত রীতিই হরপ্রসাদের রীতির বনিয়াদ।

বিষয়ী লোকের রীতিটি কী? তিন-চারশ' বছর আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে যে রীতি ব্যবহৃত হত, তা-ই বিষয়ী লোকের রীতি। এই ভাষারীতিকে সহজে ও সার্থকভাবে মনন ও আবেগের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। নৈয়ায়িক হরপ্রসাদ এই রীতিকে আত্মসাৎ করে স্বকীয় রীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের হাত পড়ে নি। এই রীতিকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দ ও ইংরেজি বাক্যাদর্শ মারফৎ সংস্কার করে সাহিত্যিক সাধু গদ্যরীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে একেই গ্রহণ

করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরী রীতিতে মহাভারত-অনুবাদ করেছেন, কিন্তু হুতোম প্যাঁচার নকশায় কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই কথ্যরীতির উৎস ঐ বিষয়ী রীতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ একেই অবলম্বন করলেন।

এই বিষয়ী রীতির ভিত্তি যুক্তিধর্মী গদ্য। যুক্তিশৃঙ্খলা ও বিচারবুদ্ধি একে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋজুতা, সারল্য ও স্বচ্ছতা এই রীতির গুণ। এই রীতিকে সাধু গদ্যরীতি মনে করলে ভুল হবে। ক্রিয়াপদের রূপ বাহ্যত এক হলেও বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী রীতির সঙ্গে এই রীতিব মূলত পার্থক্য আছে। হরপ্রসাদী রীতির প্রকৃতি-বিচাব কবলেই এই পার্থক্য অনুধাবন করা যাবে।

পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও এই রীতি সাহিত্যিক কথ্যরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায় এই রীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘুকরণ কথ্যরীতির প্রধান লক্ষণ নয়। দৈনন্দিন জীবনের ইডিয়ম, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নোতুন রীতি, শব্দ ও পদবিন্যাসের রূপান্তর, আটপৌরে ঢঙ, বিশ্রম্ভালাপের সুর কথ্যরীতির প্রধান লক্ষণ। বাঙালির মুখের ভাষায় বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির শিল্পরূপ এই কথ্যরীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

হরপ্রসাদের গদ্যরীতির ক্রম-বিবর্তন অনুসরণ করে এখন আমরা তাঁর স্বকীয় রীতির প্রকৃতি-বিচারে অগ্রসর হবো।

[১] গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান,

চৈতন্ত হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ। [বাল্মীকির জয়, ১৮৮১]

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্বের কথা-গদ্যের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। পীরিয়ডিক ও কনডেন্সড বাক্যগঠনে, তৎসম-শব্দযোগে সমাস নির্মাণে, দীর্ঘ বাক্য ও হ্রস্ব বাক্যের সমাবেশে, বিশেষণ ও উপমার সুপ্রচুর ব্যবহারে বঙ্কিমী প্রভাব অনায়াসলক্ষণীয়। প্রশ্নাত্মক বাক্যের দ্বারা অনুচ্ছেদ-সূচনাও বঙ্কিম-প্রভাবের ফল।

[২] এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয়নে শরৎ-জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে, তখন দেখিয়াছ কি? [কাঞ্চনমালা ১৮৮২]

বঙ্কিমী কথা-গদ্যের প্রভাব এখানে অতিস্পষ্ট। সেই প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার, সেই মধ্যম-পুরুষে পাঠক-সম্বোধন, সেই নির্বাচিত বিশেষণমালার একটিমাত্র সাধু ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, সেই বিশেষণ ও উপমার প্রাচুর্য। এখানে হরপ্রসাদের স্বকীয়তা নেই, তিনি বঙ্কিমী কথাগদ্যের অনুসারী মাত্র।

[৩] ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রং করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে, আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না।

তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্চকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোনালি রং পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশা-মিশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা। জাল হাল্কা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হ'য়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপ্ঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব। [বেনের মেয়ে, ১৯২০]

হরপ্রসাদের স্বকীয় রীতি এই অংশে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণাঙ্গ সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু সমস্ত বর্ণনায় এমন একটা আটপৌরে ঢঙ আছে যে ঐ ক্রিয়াপদ বাধা সৃষ্টি করে না। পদবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাসে কথ্যভঙ্গীরই প্রাধান্য। বাক্য হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়েছে। এখানে ক্রিয়াপদের সরলতম রূপটি ব্যবহৃত, কোথাও-বা ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি। ব্যালান্সড বাক্যের ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়, তার ফলে বাক্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। শব্দব্যবহারে ঔদার্য লক্ষণীয়—পাশাপাশি তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহৃত। 'নোল', 'ঘাই', 'ঝক্ঝকানি', 'ঘপ্ঘপানি' প্রভৃতি দেশী শব্দ, 'মরণ-কামড়' বাংলা ইডিয়ম এবং 'সোনালি', 'রাঙা', 'মেশামিশি' প্রভৃতি তদ্ভব শব্দ খাপ খেয়ে গেছে 'উজ্জ্বলতম', 'সূর্য্যদেব' প্রভৃতি তৎসম শব্দের সঙ্গে। সংস্কার সাধিত বিদ্যাসাগরী গদ্য থেকে নয়, লোকভাষা থেকে এই গদ্যরীতির উদ্ভব। এই রীতি স্বভাবজ।

[৪] বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞানসঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। বেনের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে একালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে

বাঙালীর সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। [কাহিনী-সূচনা, বেনের মেয়ে]

এই গদ্যাংশে হরপ্রসাদের নিজস্ব রীতিটি বিশুদ্ধরূপে পাই। এখানে আটপৌরে অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভালাপের সুরের প্রাধান্য। সাধু ক্রিয়াপদ ('হইতেও চাই না') কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। ঠিক দৈনন্দিন সংলাপের ভঙ্গী, অথচ শিল্পরূপায়িত। কথ্যরীতি এর প্রাণ। বীরবলী রীতির কৃত্রিমতা ও চাতুরী, আলালী রীতির গুরুচণ্ডালী গ্রাম্যতা, হুতোমী রীতির পৌগণ্ডোচিত চাপল্য ও অশ্লীলতা এখানে নেই, বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সঙ্গে এর তুলনা চলে। "এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়।" (শ্রী প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক ১, ১৩৫৭)। এখানে সেই প্রতিভার পরিচয় পাই।

খাঁটি বাংলা কথ্যভাষা বেনের মেয়ে-র ভাষার ভিত্তি। কথ্যভাষাকে যদি তার অনায়াসগামিতা, ক্ষিপ্রচারিতা, স্বাভাবিক সাচ্ছন্দ্য সমেত শিল্পগুণোপেত করে নেওয়া যায়, তাহ'লেই হরপ্রসাদের এই ভাষাকে পাই। এখানে মুখের ভাষাই আদর্শ, বাক্‌স্পন্দন অপ্রতিহত, চলার ঢঙটি স্বভাবগত। হরপ্রসাদের এই ভাষা সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।'

একালে হরপ্রসাদের ভাষারীতির অনুসারী লেখক বলে দুজনের নাম করা যায়—শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী প্রমথনাথ বিশী।

১৭ স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা গদ্যসাহিত্যে কথ্যরীতির রূপ ও বৈচিত্র্য যাঁদের কলমে ধরা দিয়েছে তাঁরা হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথ্যরীতি বলতে বাঙালির মুখের ইডিয়ম নির্ভর যে রীতি তাকেই ইঙ্গিত করছি। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপভেদের উপর সাধু বা কথ্যরীতি নির্ভরশীল নয়, এই সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী যে সাহিত্যিক গদ্যরূপটি নির্মাণ করেছিলেন, তা মূলত সাধুভাষা। কথ্যভঙ্গি তাঁরা গ্রহণ করেন নি। বিদ্যাসাগর যে রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন তা কথ্যরীতিনির্ভর নয়, শিষ্ট সাধু রীতি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সেই শিষ্ট সাধু রীতির উত্তরোত্তর সংস্কার সাধন করেছিলেন।

এই সাধু রীতিকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন বিষয়ী লোকের ভাষা। তিন চারশ বছর পূর্বেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে এই রীতি ব্যবহৃত হত। এই সাধু গদ্যভাষা কৃত্রিম ভুঁইফোঁড় ভাবা নয়। প্রশ্ন উঠবে তা'ই যদি হয় তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ কেরী, তাঁর সহকর্মী পণ্ডিত মুন্‌শীরা যে গদ্যভাষা নির্মাণ করলেন, তা কোন্ ভাষা? তা এই বিষয়ী লোকের ভাষা। সপারিষদ কেরী তা সৃষ্টি করেন নি, তবে তাকে আধুনিক কালের উপযোগী করে তুলেছেন। বিষয়ী লোকের ভাষাই ষোড়শ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের পথে। ইংরেজ-আগমনের ফলে তার সংস্কারসাধন হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাকে ইংরেজি বাক্যের আদর্শে সার্থ-পর্ব ও শ্বাস-পর্ব অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। যা ছিল একান্তভাবে বিষয়ী লোকের ভাষা, তা হয়ে উঠল সাহিত্যিক গদ্যভাষা। বিদ্যাসাগরের হাত থেকে তা বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছেন, বঙ্কিমের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন ও উত্তরোত্তর সংস্কারসাধন করেছেন।

অপর যে রীতি, তা প্রাকৃত রীতি, কথ্য রীতি, চলিত রীতি। কলকাতায় যে বৈশ্যসভ্যতার পত্তন হল উনবিংশ শতকে, তার অবলম্বন ছিল ককনি ভাষা। ব্যঙ্গ রঙ্গ বিদ্রূপের ভাষারূপে এর উপযোগিতা অচিরে প্রমাণিত হল এবং সাধুগদ্যরীতির পাশাপাশি এর একটা ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হ'ল। গত শতকের তৃতীয় দশকে সাময়িকপত্রে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় ব্যঙ্গপ্রধান শাণিত তীক্ষ্ণধার কথ্যভঙ্গিম চলিত গদ্যভাষা ধীরে ধীরে সাবয়ব হয়ে উঠল। পরে বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনায় এর স্বীকৃতি ঘটল।

বিদ্যাসাগর সাধু রীতির গদ্য লিখেছেন। কিন্তু বেনামী রচনায় (কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য-প্রণীত অতি অল্প হইল ১৮৭৩, আবার অতি অল্প হইল ১৮৭৩, ব্রজবিলাস ১৮৮৪) চলতি রীতির স্বীকৃতি আছে। বিদ্যাসাগরের আগেই ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার যোগ্যতম বাহনরূপে চলতি রীতির গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'অর্থাতর্জা'য় হঠাৎ-বাবুদের মর্কটলীলাকে কশাঘাত করা হয়েছে, 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১) ও 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় (১৮২২) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ-বাবু ও তাদের মোসাহেবদের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য কলিকাতা কমলালয় ১৮২৩, নববাবুবিলাস ১৮২৫, নববিবি-বিলাস ১৮৩১)। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬২) ঠনঠনের হঠাৎ-অবতারদের ব্যঙ্গচিত্র অংকন করেছেন। সোমপ্রকাশে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ। ১৮৭২) 'সামাজিক লোফার'দের ব্যঙ্গোজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে।

এই সব বিদ্রূপাত্মক কাহিনী ও চিত্রের বাহন যে গদ্যভাষা তা মূলত কথ্যরীতি-আশ্রয়ী। সাংবাদিক গন্ধ এর ভিত্তিভূমি। এই গদ্যভাষা ক্ষিপ্রচারী, নোতুন শব্দ উদ্ভাবন-নিপুণ, লঘু, নমনীয় ও দৈনন্দিন জীবননির্ভর। সর্বকার্যে ব্যবহারযোগ্যতা ও সর্বজনবোধগম্যতা এর লক্ষ্য। চলতি ভাষা এর ভিত্তিভূমি।

সাহিত্যে এই রীতির প্রথম সূচনা করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাকে শ্রী ও মর্যাদা দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন (এমন-কি সাধু-চলিত-মেশানো গুরুচণ্ডালী আলালী গদ্যভাষার রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর) কথ্যরীতির গদ্যকে কেবল লঘু রচনায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন, সর্বকর্মে ব্যবহার করেন নি, গুরু রচনায় সাধু

গদ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের প্রধান রচনাসমূহ, প্যারীচাঁদ মিত্রর রামারঞ্জিকা (১৮৫৪), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫) ও অভেদী (১৮৭১), কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ (মহাভারতের গদ্যানুবাদ ১৮৬০-৬৬) সাধু গদ্যরীতিতে রচিত। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) গ্রন্থে প্যারীচাঁদ কাহিনীর প্রত্যক্ষ উক্তিতে মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। কালীপ্রসন্ন সামাজিক বিদ্রূপাত্মক রচনায় হুতোমী ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা পুরোপুরি কলকাত্তাই ককনি; স্ল্যাং ও অশ্লীল শব্দ তাতে আছে; কিন্তু তিনি সর্বকর্মে চলতি ভাষাকে ব্যবহার করেন নি।

সর্বকর্মে কথ্যভাষাকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন ও তার পক্ষে ওকালতি করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। তাঁর আগে কোনো বাঙালি সাহিত্যিক চলতি ভাষার পক্ষে এই ওকালতি করেন নি:

'চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?......স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।' [ভাব্‌বার কথা]

এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দে।

বিবেকানন্দের চলতি-ভাষা-আশ্রয়ের গুরুত্ব আরো বাড়ে যদি সেদিনের গদ্যচর্চার পটভূমিতে একে বিচার করি। তখন গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের রাজত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) চলতি ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত, কিন্তু তা ব্যক্তিগত পত্র, প্রকাশ্য সাহিত্যচর্চা নয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ও সংশয় পরিস্ফুট:

'বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতী-র উদ্দেশে লিখিত হয় নাই।'

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে-কথা বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী সে-কথাই বললেন দু বছর পরে—

'যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই

লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।' [কথার কথা, ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ বীরবলের হালখাতা। প্রবন্ধ সংগ্রহ ১]

বিবেকানন্দ ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন :

'যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।'

সংস্কৃত ভাষা বাংলার প্রধান আশ্রয়, কিন্তু সংস্কৃতের অনুকরণ বাংলা ভাষার কাম্য নয়,—এ কথাটা বিবেকানন্দ জোরের সঙ্গে বললেন :

'যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে চাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্ রে সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে 'রাজা আসীৎ'। আহা-হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!—ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু' হাজার ছাদি বিশেষণেও নেই।' ['ভাব্‌বার কথা']

এই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন প্রমথ চৌধুরী—

'এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারবে না। পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে-কদিন বেঁচে আছে, সে-ক'দিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে—বাংলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন। বাংলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না'। [কথার কথা]

সুতরাং সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রথম শিল্পীর সম্মান স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রাপ্য। আলালী ভাষা গুরুচণ্ডালী-দোষ-দুষ্ট, হুতোমী ভাষা 'অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য' (বঙ্কিম), তা ককনি, স্ল্যাং-নির্ভর, বে-আব্রু। বীরবলী ভাষা শিষ্ট, মার্জিত, চাতুরী ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও কিছুটা কৃত্রিম। বিবেকানন্দের চলতি ভাষা হুতোমী ভাষার মতো বে-আব্রু নয়, আবার বীরবলী ভাষার মতো কৃত্রিম চতুর বিদগ্ধ মার্জিত ভাষা নয়।

এবার বিবেকানন্দের গদ্য ভাষার সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ করা যাক। প্রথমে সাধুরীতির গদ্যের উদাহরণ (বর্তমান ভারত), তারপর চলিত রীতি গদ্যের উদাহরণ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পরিব্রাজক, ভাব্‌বার কথা, পত্রাবলী)।

(১) বাহ্য জাতির সজ্ঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে, প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতি প্রভা; অপর দিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্‌ঘাটিত যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্ব শরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা, ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য। প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। [বর্তমান ভারত]

এই সাধু গদ্যরীতি তৎসমশব্দবহুল, সমাসসন্ধিসমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত বাক্য পরম্পরায় সমৃদ্ধ। বাক্‌রীতি দীর্ঘবিস্তারী, প্রথম বাক্যটি হ্রস্ব, পরবর্তী তিনটি বাক্যই দীর্ঘ। উপবাক্যের সংখ্যা প্রচুর, বাক্যে তৎসম শব্দের একচ্ছত্র প্রাধান্য। বাক্যের গতি মন্থর, সজ্জা আনুষ্ঠানিক, গুরু চিন্তানুসারী। গুরুগম্ভীর শব্দঝংকারে মুখরিত এই গদ্যাংশ। সাধু গদ্যরীতির উপর লেখকের অধিকার এখানে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত।

[২] হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন. আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে

গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' [বর্তমান ভারত]

এখানেও সাধু গদ্যরীতির বাক্যসজ্জা ; কিন্তু পূর্বের উদাহরণের চেয়ে এই গদ্যাংশের গতি দ্রুত, প্রচণ্ড আবেগে পাগলা-ঝোরার মতো ছুটে চলেছে। এখানে বাক্যের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়েছে, উপবাক্যগুলি আবেগের স্রোতে ভেসে গেছে। লেখক-হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগে বাক্যপুঞ্জ বিস্ফোরিত হয়েছে, প্রতি ছত্রে মনে হয় অশনিনির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে। এখানে সাধু গদ্যরীতি লেখকের হৃদয়াবেগের শাসন মেনেছে, বাক্যসজ্জার গুরুভার অন্তর্হিত হয়েছে ; আবেগের নিয়মিত উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যেও স্বরের আরোহ অবরোহ ঘটেছে। এখানে দিব্যভাবে আবিষ্ট বক্তা লেখকের স্থান অধিকার করেছেন, তাঁরই হৃদয়াবেগ এখানে অবারিত গতিতে ছুটে গিয়েছে।

[৩] সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাশটি জাহাজের পাছার উপর। সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ঝুঁকে হাঙর দেখচে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন ; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। ......কিন্তু নেহাৎ হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান 'বাঘা'র গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড থ্যাবড়ামুখো চলে আসচে।......এবার সব চুপ নোড়চোড না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে, টোপ্‌টা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌চে! দেখুক! চুপ্‌, চুপ্‌—এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে আড়ে গিলেচে। চুপ্‌—গিল্‌তে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসরক্রমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান! চিন্তিত 'থ্যাবড়া', মুখ ঝেড়ে চাইল সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্। [পরিব্রাজক]

প্রাকৃত শব্দ-ব্যবহারে ঔদার্য প্রথমেই চোখে পড়ে। লেখকের শব্দ-ব্যবহারে কোনো শুচিবায়ু ছিল না। 'জাহাজের পাছা', 'হাঙর মিঞারা',

'থ্যাবড়ামুখো' আর 'বাঘা' হাঙর, 'মোদ্দা', 'চিৎ', 'আড়ে গিলেছে'—এসব শব্দ তিনি অকুণ্ঠ ব্যবহার করেছেন। চলিত ক্রিয়াপদের রূপটিও লক্ষণীয়—'সয়ে গেচেন', 'নোড় চোড় না', 'আড়ে গিলেচে'। বিদেশী শব্দও পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—'সেকেণ্ড কেলাশ'। আটপৌরে ভাষা, চলতি নাগরিক ইডিয়ম, ঘরোয়া মুখের ভাষার ঢঙ, দেশী-বিদেশী শব্দ, লাগসই উপমা, হ্রস্ব বাক্য, প্রত্যক্ষ বর্ণনা, পরিহাস-উক্তি—সবটা মিলিয়ে বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি। এখানে যে সংস্কারমুক্তি ও শিল্পিসিদ্ধির পরিচয় পাই, তা প্রশংসার্হ।

[৪] জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নিচে ঝোঁপ, তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে, ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্থানি গাল্‌চে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস, যত দূর যাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে। [পরিব্রাজক]

এ এক আশ্চর্য স্বভাবানুগামী বর্ণনা। সত্যেন্দ্র দত্তের চিত্ররস, অবনীন্দ্রনাথের বাক্‌স্পন্দ, বাণভট্টের বর্ণসমারোহ মনে করিয়ে দেয় এই বর্ণনা। স্বভাবোক্তি ও উৎপ্রেক্ষার কত নিপুণ ব্যবহার, বর্ণসমারোহের কত সুনির্বাচিত বিশেষণ, কত বর্ণধ্বনিময় রূপচিত্র এখানে সিদ্ধ শিল্পীর হাতে অপরূপ সুষমা লাভ করেছে। আক্ষেপ হয়, এই ঐশ্বর্য ও সিদ্ধি যে শিল্পীর করতলগত, তিনি বাংলা গদ্যের অনিয়মিত অর্ধ-মনস্ক শিল্পী। বাংলাদেশের শ্যামল অরণ্য, রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেত, নীলাম্বরী আকাশ আর বৃষ্টিধারার এই স্বভাবানুগত বর্ণনায় কোথাও জোর করে কাব্য করা হয় নি। বাক্যগুলি মনে হয় দীর্ঘ। আসলে তা একটি ছবির খণ্ডচিত্রযুক্ত উপবাক্যের সমষ্টি। এর সংযোজন-কৌশলটি দক্ষ হাতের।

[৫] একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝ খান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিষটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতন-স্বরূপ সমস্ত জিনিষের-অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম ; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ-ভাগ নিলে, অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো !! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু'দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান্' ডাকতে লাগলো। [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য]

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভোগদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের মূল কথাটি এখানে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাল মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সমালোচনায় যে-কথা বলেছেন, এখানে সে-কথাই বিবেকানন্দ সোজা করে বলেছেন। গুরু অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় চলিত রীতির ব্যবহারে লেখকের সাফল্য এখানে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিয়াপদের চলিত রূপটি বিশেষ লক্ষণীয়—'শিখলে', 'দিলে', 'কিনলে', 'করলে'। অতীত ক্রিয়াপদের অর্থে এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সবুজ পত্র-পর্বের গল্পে ও ঘরে বাইরে উপন্যাসে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ অতীত কালের ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তার বিশ বছর আগেই বিবেকানন্দ ক্রিয়াপদের এই রূপটি ব্যবহার করে গেছেন। ভাষার ঢঙ আটপৌরে, চলতি ভাষার ইডিয়ম এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—'সে পেলে ঘোড়ার ডিম', 'দাম দিয়ে মলো'।

[৬] আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্তই করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করেই হ'ক, সমুদ্রে যাবেই, দু'একদিন আগে বা পড়ে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু'একবার আস্তাকুঁড় ভেদ করে। যদি এ দশহাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত, আর ত এখন উপায়

নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়। [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

এই অংশের ভঙ্গি পুরোপুরি মুখের ভাষার। মৌখিক ভাষার বিশেষ টান ও মুদ্রাদোষ এখানে আছে—'ভুল হয়ে থাকে ত, আর ত এখন উপায় নেই', 'ইদিক-উদিকে', 'মরে যাবে বই ত নয়'। তৎসম শব্দের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, তদ্ভব শব্দের উপরেই নির্ভরতা। ঢঙটি আটপৌরে, এ ভাষায় ইতরভদ্র সকলের অবাধ নিমন্ত্রণ।

[৭] যদি বল ও কথা বেশ ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো ? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব, পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না কেন, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কল্‌কেতার ভাষাই রাখ্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয় ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌-কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। [ভাব্‌বার কথা]

মুখের ভাষার টান ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যকে লেখক এখানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'কল্‌কেতায়', 'এথায়',—এ-সব শব্দ আজকাল আর আমরা ব্যবহার করি না, কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন বিবেকানন্দ এটি লেখেন, তখন তা চলিত ছিল। আসলে মুখের ভাষাও যে সাহিত্যের ভাষার প্রভাবে, রবীন্দ্র-প্রভাবে ও শিক্ষাবিস্তারের ফলে অলক্ষ্যে পবিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তা আমরা খেয়াল রাখি না। গত অর্ধ-শতকে বাঙালির মুখের ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাই 'কলকেতায়' হয়েছে 'কলকাতায়', 'এথায়' হয়েছে 'এখানে'। 'লোকে কয়'—'কয়' ক্রিয়াপদটি আমাদের কাছে আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ বলে মনে হয়। 'বলে' এখন 'কয়'-কে স্থানান্তরিত করেছে। 'কহা' ধাতুর কথ্যরূপ 'কয়'। আমরা 'কহা' ছেড়ে 'বলা' ধাতুকে আশ্রয় করেছি বলেই 'কয়' আমাদের

কাছে অপ্রচলিত। এ ছাড়া এই উদাহরণের সবটাই আমাদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য। আজ ছেষট্টি বছর পরেও এই গদ্যাংশ সর্বাংশে আধুনিক।

বিবেকানন্দের চলতি রীতির গদ্য যে কতো প্রাণবন্ত তার পরিচয় এই সর্বাঙ্গীন আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পূর্বেই বিবেকানন্দ সাহিত্যিক কথ্যরীতির পথ রচনা করেছিলেন, সে কথা অবশ্য স্বীকার্য। বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ, কোনো প্রভাবই স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতির উপর ছাপ ফেলে নি। সন্ন্যাসীর প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁর গদ্যরীতির একমাত্র উৎস। সে ব্যক্তিত্ব প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ ও সহাস্য, বিবেকানন্দের চলতি ভাষার গদ্যরীতিও প্রাণচঞ্চল ও সরস।

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭৫ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ (১২৮৩ থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)—সুদীর্ঘ ছেষট্টি বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ) বাংলা গদ্যভাষায় চর্চা করেছেন। লিখেছেন দুই শতকের নানা সাহিত্যপত্রে—জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ভারতী (১২৮৪), বালক (১২৯২), হিতবাদী (১২৯৮), সাধনা (১২৯৮), প্রদীপ (১৩০৪), নব পর্যায় বঙ্গদর্শন (১৩০৮), প্রবাসী (১৩০৮), সবুজপত্র (১৩২১), বিচিত্রা (১৩৩৪)। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা করেছেন এইসব পত্রিকা—বালক (১২৯২, আয়ুষ্কাল মাত্র এক বছর। সম্পাদক : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। কার্যাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ), সাপ্তাহিক হিতবাদী (১২৯৮ সম্পাদক : কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অল্প কিছুদিনের জন্য সাহিত্য-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ), সাধনা (কেবল ৪র্থ বৎসরে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, ১৩০১), ভারতী (সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, এক বৎসরের জন্য, ১৩০৫), নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, পাঁচ বৎসরের জন্য, ১৩০৮ থেকে ১৩১২), ভাণ্ডার (১৩১২, আয়ুষ্কাল মাত্র দু বছর। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ গদ্যচর্চার কালকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) জ্ঞানাঙ্কুর-বালক-ভারতী যুগ, ১৮৭৬ থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। (২) হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী যুগ, ১৮৯৩ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। (৩) সবুজপত্র-বিচিত্রা যুগ, ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী গদ্যরীতির পরিবেশে বাধিত হয়েছিলেন, কিন্তু বাঙ্কমী গদ্যরীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন নি। তার নানা কারণ আছে। বঙ্কিমের মনন-প্রক্রিয়া বস্তুবিশ্লেষণে, ব্যবহারিক যুক্তি বিচারে, নৈর্ব্যক্তিক মূল্যনিরূপণে নিযুক্ত ছিল এবং সমাজকল্যাণাদর্শ তাঁর সাহিত্য সাধনায় চির-অন্বিষ্ট ছিল। ফলে বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্য হয়ে উঠেছিল বক্তব্যপ্রধান, নিরাভরণ, স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর অনুচ্ছেদ-বিশিষ্ট এবং সিদ্ধান্তান্বেষী লজিক-অনুসারী। সরলতা

ও স্পষ্টতাই বঙ্কিমী প্রবন্ধ-গদ্যের লক্ষ্য। গত শতকের সকল প্রবন্ধ-লেখকের গদ্য এই রীতিতে লিখিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-বিশ্লেষণ অ্যাকাডেমিক প্রণালীতে চলেছিল, নির্মোহ বিচার ও তথ্যসিদ্ধ গবেষণায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল। অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারাকে হিন্দু কলেজের আইনের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসাৎ করেছিলেন। তার ফলে বঙ্কিম নির্ভর করেছিলেন আরোহ ও ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতির উপর। তাই তাঁর প্রবন্ধ-গদ্য বক্তব্যসর্বস্ব স্পষ্ট, সরল এবং অর্থাভাস ও ভাবাবেগ-বর্জিত।

বঙ্কিমের কথা-গদ্য বিবরণাত্মক ও বর্ণনাত্মক। তখনকার দিনে উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণ রীতি চালু হয় নি বলে ঔপন্যাসিককে ঘটনাবিবৃতি ও রূপবর্ণনার উপর নির্ভর করতে হত; এই বর্ণনা ও বিবরণের সাহায্যেই তাঁকে চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে হ'ত। সুতরাং উপন্যাসে ঘটনার বিবরণ ও রূপবর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছিল। স্বভাবতই বঙ্কিমের কথা-গদ্য হয়ে উঠেছিল শরীরী কল্পনার বর্ণাঢ্যতায় সমৃদ্ধ, ধ্বনিরোলসমন্বিত বিশেষণ ও উপমা-অলংকারে সজ্জিত। কল্পনার সাবয়বতা এই কথাগদ্যকেও করে তুলেছিল পরিচ্ছন্ন, পরিমিত, বাহুল্য-বর্জিত, সেইকারণে বঙ্কিমের কি উপন্যাসে কি গদ্যে বৃথা শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয় নি।

গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ এই মনন-প্রক্রিয়া ও নৈর্ব্যক্তিক বিচারপদ্ধতির অনুকূল ছিলেন না। এর কারণ নির্দেশ কঠিন। তবে একথা বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি এক ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচর্চা অ্যাকাডেমিক প্রণালীতে চলে নি, স্কুল কলেজের নিয়ম ও বিনয়নিষ্ঠ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না, তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে আরোহ ও ঐতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। অবরোহ, অনুমাননির্ভর ও ব্যক্তিগত অনুভূতিপ্রধান পদ্ধতি তিনি আশ্রয় করেছিলেন। মননশক্তিকে তিনি বস্তুবিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন নি, ভাবব্যাখ্যানে নিযুক্ত করেছিলেন। লজিক অপেক্ষা আপন প্রত্যয়, বিশ্বাস ও আবেগের উপর নির্ভর করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কখনই বঙ্কিমের মতো লজিক-নির্ভর নৈর্ব্যক্তিক নির্মোহ আবেগবর্জিত স্পষ্ট বাহুল্যবর্জিত গদ্যে 'গুরু শিষ্য সংবাদ' ('ধর্মতত্ত্ব') লেখা সম্ভব নয়। কেবল সমাজকল্যাণাদর্শ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণাস্থল নয়, তাই তিনি বঙ্কিমের মতো দেশ সমাজ

জাতিগত সমস্যা নিয়ে গুরু চিন্তার বিস্তার ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন নি। বর্ণনার পরিমিতিবোধে ও বাহুল্যবর্জিত বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না বলে তাঁর গদ্যরীতি বিচারনির্ভর, বক্তব্যসর্বস্ব, ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে নি, হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিঅনুভূতিপ্রধান, আবেগ ও বিশ্বাসনির্ভর, প্রকাশ-সচেতন। তাই রবীন্দ্র-গদ্যে এসেছে অলংকার ও বিশেষণের প্রাচুর্য। এই অলংকৃতি রবীন্দ্র-গদ্যের সহজাত সৌন্দর্য। তাঁর স্টাইল সাবজেকটিভ, আত্মচেতনোৎসারিত। তাঁর চেতনা ও অস্তিত্বের সঙ্গে বিষয়বস্তুর যোগ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে বলেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য আত্মপ্রকাশের বাহন, বক্তব্যের বিচারবাহন নয়, তাই তা উৎপ্রেক্ষা-উপমা-রূপক-যোগে বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, বক্রোক্তি-ইঙ্গিত-ব্যাজস্তুতি-শ্লেষ-যোগে সরস হয়ে উঠেছে। নানা অর্থালংকার সৃষ্টি, প্রয়োগ ও ব্যঞ্জনায় গদ্যভাষা রবীন্দ্রনাথের হাতে এক অপরূপ বাণীরূপ লাভ করেছে। অলংকার ও বিশেষণ তাঁর চিন্তা ও ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে কবি, এ কথাটা গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মুহূর্তেকের জন্যও আমরা ভুলতে পারি না। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ—সর্বত্রই তিনি কবি। সেই কারণে রবীন্দ্র-গদ্যকে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ছেষট্টি বছরের গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে দেখা গিয়েছে নানা রূপ ও রীতির গদ্য, কিন্তু সবই কবি-ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্কিমের গদ্যে ভাস্কর্য-রূপ চোখে পড়ে, রবীন্দ্র-গদ্যে অলংকৃত লীলায়িত ভঙ্গিই প্রাধান্য লাভ করেছে। গদ্যের যে বিশুদ্ধ মূর্তি বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যে দেখা যায়, তা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-গদ্যে নেই। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য ও রসসাহিত্য, ভাষারীতিতে কথাসাহিত্য থেকে ভিন্নতর নয়, তাঁর প্রবন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়কে ছাড়িয়ে উঠেছে বিষয়ী। সর্বত্রই অলংকারের ব্যবহার। তাই বলতে হয়, রবীন্দ্র-গদ্য এক মহাকবির গদ্য, দ্বিতীয় রহিত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিকাশ, বৈভব ও পরিণতির কালানুক্রমিক আলোচনার পূর্ব-মুহূর্তে রবীন্দ্র-গদ্য সম্পর্কে তিনটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।

(১) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দ-বিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—

সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা।……ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্‌বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এসব প্রবন্ধে লেগেছে।……মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়। ভাষা প্রয়োগের কলাকৌশল রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্যলেখকের অসাধ্য। এ রকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ; যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব। আর তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা। [অতুল চন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকা, শ্রাবণ ১৩৫৯]

(২) রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোন সাহিত্যিক গদ্য পদ্যের জোড় কলম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। মধুসূদন গদ্য লিখতে পারতেন না, বঙ্কিম-চন্দ্র পদ্য লিখতে পারতেন না—যদিও কবিত্বগুণ তাঁতে যথেষ্ট ছিল। যদিচ রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্য পদ্যের জোড়া কলম ছিল তবু তাঁর পদ্যের কলম তাঁর গদ্যের কলমকে যে পরিমাণে প্রভাবিত ও চালিত করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর কবিতার যাবতীয় গুণ, তাঁর গদ্যে। বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে তাঁর পদ্যের কলমটাই যেন মাঝে মাঝে গদ্যের ছদ্মবেশ পরে। এ যেন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ। [শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী, বাংলা গদ্যের পদাংকের ভূমিকা, ফাল্গুন ১৩৬৭]

(৩) রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার অলংকৃতি বিভূষণভার নয়। তাহা স্বাভাবিক ও সহজাত সৌন্দর্য্য। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশিষ্টতা গদ্যলেখকরূপে। রবীন্দ্রনাথের স্টাইল তাঁহার সুগভীর আত্মচেতনার উৎস হইতে উৎসারিত।……এইরূপ সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ বা আত্মদৃষ্টিমূলক রচনারীতি লক্ষণা-বক্রোক্তি-স্বভাবোক্তি-উপমা-উৎপ্রেক্ষামণ্ডিত হইতে বাধ্য [শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ· ১৭৪-৭৫]

॥ দুই ॥

রবীন্দ্র-গদ্যচর্চার আদিযুগ জ্ঞানাঙ্কুর-বালক-ভারতী যুগ (১৮৭৬-৯২)। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থদুটি ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৮-৯২ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনার সংকলন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা তিনখানি বাংলা কাব্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা, নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী' ('জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব', ১২৮৩ বঙ্গাব্দ। ১৮৮৬ খৃ); দ্বিতীয় গদ্যরচনাও তীক্ষ্ণ দীর্ঘ সমালোচনা, নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য' ('ভারতী', শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ। ১৮৮৭-৮৮ খৃ)।

এই দুটি সমালোচনা-প্রবন্ধে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির আদি রূপটি পাই।

(১) যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীত-কাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয় পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোবৃত্তি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলা-রাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। ['ভুবনমোহিনী, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী']

(২) আমাদের পাঠক সমাজের রুচি ইংরাজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে, অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক্, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজী গিল্‌টিতে আবৃত্ত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর, তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন, সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বর ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে, ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ-পরিচ্ছদ সেই সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না। ['মেঘনাদ বধ কাব্য']

এই দুটি উদাহরণ কি বঙ্কিমী প্রবন্ধ-গদ্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত ?

আমরা জানি, উপন্যাসে 'চোখের বালি' পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রভাবিত ছিলেন, বঙ্কিমের উপন্যাস-গঠন-ও-বর্ণনকৌশলের অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে (১৮৮২) এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

(১৮৮৩) ও 'আলোচনা' (১৮৮৮) গদ্যগ্রন্থে নিজস্বতা দেখিয়েছিলেন। সে নিজস্বতা আত্মভাবের প্রাধান্য। গদ্য পদ্যে আত্মভাবনামূলক রচনারই প্রাধান্য এবং শেষোক্ত গদ্যগ্রন্থদুটিতে সেই পরিচয় পরিস্ফুট, একথা স্বীকার্য।

(১)-সংখ্যক উদাহরণে দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরার প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়। একটি দীর্ঘ বাক্যে দুই বা তিনটি বাক্য ভারসাম্য বজায় রেখে খণ্ডিচিহ্ন (কমা) বা সংযোজক অব্যয়-যোগে বিন্যস্ত হয়েছে। উৎপ্রেক্ষা-অলংকারের একচ্ছত্র প্রাধান্য চোখে পড়ে। [দ্র° শ্রীসুকুমার সেনের উক্ত গ্রন্থ]

(২)-সংখ্যক উদাহরণে দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরা অপেক্ষা পরস্পারিত বাক্যের প্রয়োগ চোখে পড়ে। বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য কম নয়। উপাদান বাক্য এবং হেতুমৎ বাক্য প্রায়ই মূল বাক্যের শেষে এসেছে। 'কিন্তু', 'যে' শব্দের দ্বারা এই দুই অংশকে সংযুক্ত করা হয়েছে। বিশেষণ ও উপমার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে সমালোচনার পদ্ধতি ব্যাখ্যামূলক, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে সমালোচকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অনুভূতি। গদ্যরীতি তদনুযায়ী হয়েছে, তা আবেগবর্জিত নয়, লেখকের অনুভূতিসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা বেশি করে ফুটেছে আত্মকথন বা আত্মচিন্তা-মূলক গদ্যরচনায়, নিম্নধৃত উদাহরণ দুটিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

[৩] মনের বাগান বাড়ী

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে, ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে, হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও, হাসির বিদ্যুত দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। [বিবিধ প্রসঙ্গ]

[৪] এক কাঠা জমি

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেখানে ততই অনুরাগ সূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাহাদিগকে অভ্যাস সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবলমাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের

একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না। [আলোচনা]

এই দুটি উদাহরণে রবীন্দ্র-গদ্যের বৈশিষ্ট্য প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠল। আত্ম-ভাবনামূলক রচনার বাহন আবেগোচ্ছ্বসিত গদ্য। লেখকের ভাবতরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য তরঙ্গেরও উত্থান-পতন। বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য কমে এসেছে, অথবা কাটা কাটা হ্রস্ব বাক্য যতিচিহ্নযোগে একত্র বাঁধা পড়েছে। কাব্যোচিত কোমলতা ও নমনীয়তা শব্দপ্রয়োগে লক্ষ্য করা যায়। নামধাতুর প্রয়োগও ('সম্ভবে') আছে, তা কাব্যপ্রভাবের ফল। পূর্ণ ক্রিয়াপদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

[৫] সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়ীতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, যেন কি কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রজনি? কি বলিতে আসিয়াছিস?' রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি আমার একটি কথা রাখতে হবে।' মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, 'কি কথা বল?' রজনী কতবার না বলি না বলি করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল, 'মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে।' কাহাকে লিখিতে হইবে? মহেন্দ্রকে। কি লিখিতে হইবে? না তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন; তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল। [অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, করুণা, 'ভারতী' আশ্বিন ১২৮৪—ভাদ্র ১২৮৫/১৮৭৮]

[৬] বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়্ দুড়্ করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব? দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, 'সুরমা কি?' পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়। [একবিংশ পরিচ্ছেদ, বউ-ঠাকুরাণীর হাট, ১২৮৮-৮৯/১৮৮৩]

এই দুইটি উদাহরণে বঙ্কিমী কথা-গদ্যের প্রভাব অনায়াসলক্ষণীয়। হ্রস্ব বাক্য, নিশ্চয়াত্মক বাক্যের স্থানে প্রশ্নাত্মক বাক্য, নাটকীয় চমক, স্বগত ভাষণ —সবই বঙ্কিমী কথাগদ্য-রীতি মনে করায়। করুণা, বউঠাকুরাণীর হাট বা রাজর্ষি (বালক, ১২৯২, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১২৯৩/১৮৮৭)—এই তিন উপন্যাসের গদ্যরীতি বঙ্কিম-প্রভাবিত, গঠনরীতি ও শিল্পকৌশলও বঙ্কিম-উপন্যাস-অনুযায়ী। কিন্তু এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নিজস্বতার প্রথম ইঙ্গিত পাই তাঁর প্রথম দুটি ছোট গল্পে: 'ঘাটের কথা' (ভারতী, কার্তিক ১২৯১/১৮৮৪) ও 'রাজপথের কথা' (নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১/১৮৮৫)।

[৭] এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সড়িয়া গেল, জানিতে পারিলাম না। [ঘাটের কথা]

[৮] বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়। [রাজপথের কথা]

এই দুটি উদাহরণে বঙ্কিম-প্রভাব আছে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা। নৈর্ব্যক্তিক বহির্মুখিতার স্থানে এসেছে আত্মভাবনার

সুর ও অন্তর্মুখিতা। উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও বিশেষণ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে—যেমন, 'করুণ নূপুরধ্বনি' (বিশেষণ), 'অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল' (উৎপ্রেক্ষা)। [৮]-সংখ্যক উদাহরণে মৃত্যুঘটনার সাংকেতিক বর্ণনা, নাটকীয়তা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। জটিল ও যৌগিক বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। ভাষা অন্তরঙ্গ ও সরস হয়েছে। এ সবই রবীন্দ্র-গদ্যরীতির নিজস্বতার প্রথম ইশারা।

রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম পর্বের আর-একটি গ্রন্থের ভাষা বিচার্য: 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১ ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত)। এই পত্ররূপী ভ্রমণগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি কথ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন। অনেকদিন পরে এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন (২৯ আগষ্ট ১৯৩৬): "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে—সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।……আমার বিশ্বাস বাংলা চল্‌তি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।" তবে সেদিন তিনি সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে এই ভাষাকে চালাতে সাহস করেন নি, পত্রগুলি বন্ধুদের কাছে লেখা ব্যক্তিগত পত্র, ভারতী-র উদ্দেশে লিখিত নয় বলে মুদ্রণে দ্বিধা ছিল।

[৯] নাচ আরম্ভ হল। ঘুর্-ঘুর্-ঘুর্। একটা ঘরে মনে করো চল্লিশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কা-ধাক্কি। তবু ঘুর্-ঘুর্-ঘুর্। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে। একটা নাচ শেষ হলো, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল-মূল-মিষ্টান্ন-মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দু'জনে নিভৃতে কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে, সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না। [তৃতীয় পত্র, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র]

[১০] তুমি এখানে আসতে ভাই, তা হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে ঢেউ গুণ্‌তে গুণ্‌তে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের

মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত, বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম। [তদেব]

এই দুটি উদাহরণে ক্রিয়াপদগুলি কথ্যভাষার, বানানে নোতুনত্ব আছে, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন উপভাষা-রূপ ব্যবহৃত হয়েছে, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ বসেছে তৎসম শব্দের গায়ে গায়ে। ইডিয়মগুলি ঘরোয়া ও মেয়েলি। অনুকার শব্দ ও মেয়েলি ইডিয়ম বর্ণনাকে সরস ও জীবন্ত করে তুলেছে। [১০]-সংখ্যক উদাহরণে ছড়ার রীতি অনুসৃত হয়েছে, সমিল গদ্য-পর্ব বারবার ব্যবহারে চমৎকার এফেক্ট্ হয়েছে। পরবর্তী কালে কথ্যভাষারূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সব পরীক্ষা করেছেন, এটি তারই অগ্রদূত।

রবীন্দ্র-গদ্যের প্রথম যুগের গদ্যের নানা রূপ, বঙ্কিম-প্রভাব ও প্রভাবমুক্তির প্রয়াস, সাধু গদ্যরীতি ও কথ্যরীতির বিচিত্র ব্যবহার এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি।

॥ তিন ॥

এবার রবীন্দ্র-গদ্যের দ্বিতীয় যুগের কালসীমা বিশ বছর (১৮৯৩ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ)—হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসীর যুগ। এই যুগে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (২য় খণ্ড ১৮৯৩), পঞ্চভূত (১৮৯৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ (১৯০৬), গল্পগুচ্ছ (পাঁচ ভাগ ১৯০৮-০৯), শান্তিনিকেতন (তের ভাগ, ১৯০৯-১১), গোরা (১৯১০), জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছিন্নপত্র (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এবং ষোল ভাগে গদ্য গ্রন্থাবলীতে (১৯০৭-০৯) নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ঃ বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), লোক সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), সভাপতির অভিভাষণঃ পাবনা সম্মিলনী (১৯০৮), রাজা প্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), সমাজ (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), ধর্ম (১৯০৯)। সুতরাং এই যুগ রবীন্দ্র-গদ্যের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ যুগ। এই সময়ে তিনি সাধনা (এক বছর), ভারতী (এক বছর) ও বঙ্গদর্শন (পাঁচ বছর) সম্পাদনা করেন।

রবীন্দ্র-গদ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক গ্রন্থ কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যে ক'টি গ্রন্থের নাম করতে পারি, তাঁর পাঁচ খানিই এই যুগে লিখিত—প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) গল্প গুচ্ছ (১৯০৮-০৯), গোরা (১৯১০), জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছিন্নপত্র (১৯১২)। এই পাঁচখানিকে অবলম্বন করে এ যুগের রবীন্দ্র-গদ্যের ঐশ্বর্য ও বৈভব প্রদর্শনের প্রয়াস করা যাক্। মনে রাখতে হবে এই যুগেই রবীন্দ্র-গদ্য তার চরম ঐশ্বর্য আয়ত্ব করেছিল। ভারসাম্য ও প্রাঞ্জলতা রক্ষায়, অলংকারের সহজাত সৌন্দর্য ব্যবহারে এবং ভাষার প্রসাদগুণ ও লাবণ্য প্রকাশে এই যুগের রবীন্দ্র-গদ্য চরম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

বিশ বছরে (১৮৯৩-১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা ও শিল্পসাফল্য লাভ করেছিলেন, তার পরিচয়স্থল এই পাঁচটি গদ্য-গ্রন্থ।

প্রথমেই 'প্রাচীন সাহিত্য'। এই গ্রন্থভুক্ত 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে সংস্কৃত গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—

'সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনি গাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের কনসার্ট বাজিয়া উঠে। তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়; বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইবার চেষ্টা করে, এবং তাহাতে সফলও হয়।'

এই মন্তব্যের পটভূমিতে প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যরীতি বিচার্য। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ সংস্কৃত বাক্যের সমাস-বাহুল্য বর্জন করে ইংরেজি বাক্যের আদর্শে বাংলা বাক্য গড়ে তুললেন, শ্বাসপর্ব ও সার্থ-পর্ব অনুযায়ী ছেদচিহ্ন ব্যবহার করে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশ রচনা করলেন, অনুচ্ছেদ রচনা করলেন। বাণভট্টের কাদম্বরী রীতিতে পল্লবিত তরঙ্গিত সমাসাকীর্ণ বিরতিবিহীন ধ্বনিরোলসমৃদ্ধ গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর পরিহার করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর-এক ধাপ অগ্রসর হলেন। বাংলা গদ্যকে তিনি সংস্কৃতের সন্ধি-সমাস থেকে বহুল পরিমাণে মুক্ত করে তার ধ্বনিরোলটি রক্ষা

করলেন। কপালকুণ্ডলা ও দেবীচৌধুরাণীর নায়িকা-রূপবর্ণনা ও কমলাকান্তের দপ্তরের দেশমাতৃকা-রূপবর্ণনা তার উদাহরণ। দুর্গেশনন্দিনীর সংস্কৃতবহুল রীতি থেকে দেবীচৌধুরাণী ও রাজসিংহের সংস্কৃতানুগ রীতি—এ দুয়ের ব্যবধান সতর্ক শ্রুতিকে এড়িয়ে যায় না। বঙ্কিমের কথা-গদ্যের রূপ-বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশই সংস্কৃত প্রভাব ও লেখ্য ভাষা থেকে কথ্যভঙ্গির দিকে, অগ্রসর হচ্ছিলেন। বাক্যের দৈর্ঘ্য হ্রাস, পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাস ও সুযোগ মতো বিলুপ্তি সাধন করে বঙ্কিমচন্দ্র সাধু গদ্যকে সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্তি দিচ্ছিলেন। দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ (সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ) ও ইন্দিরা (সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ) তার প্রমাণ।

রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের (১৮৯৪) 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। --

"ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষা-সমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন্' 'প্রভো' 'স্বামিন্' 'রাজকুমারি' 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্য' এবং 'সসৈন্যে' দুই-ই লিখিয়াছি, একটু অর্থ-প্রভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত' এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ-নির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব, ইচ্ছা আছে।"

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যের ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনিরোল রক্ষায় যত্নবান হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধু গদ্যের যে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাতেই তৃপ্ত না থেকে নোতুন করে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতপ্রধান গদ্যরীতি নির্মাণ করলেন, ফিরিয়ে আনলেন সুর ও স্পন্দন। এটি তাঁর প্রথম যুগের গদ্যে দেখা যায় নি, দ্বিতীয় যুগের গদ্যে দেখা গেল। তার প্রথম পরিচয় পাওয়া

গেল বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের (১৩১৪/১৯০৭) কয়েকটি রচনায়—রুদ্ধগৃহ, পথপ্রান্তে, লাইব্রেরি (১২৯২), নববর্ষা ও কেকাধ্বনি-তে (১৩০৮)। দীর্ঘ বাক্য, ধ্বনিসমৃদ্ধ তৎসম শব্দ, কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি ব্যবহার করে তিনি গদ্যকে করে তুললেন কাব্যগুণ ও সুর সমৃদ্ধ, ছন্দঃস্পন্দিত ও আবৃত্তি-উপযোগী।

সংস্কৃত গদ্যের সুর ও স্পন্দনকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কুমারসম্ভবের আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং। বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।/পর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥—শ্লোকটি উদ্ধার করে কেকাধ্বনি প্রবন্ধে শব্দসংগীত-অতিক্রমী সুর ও স্পন্দনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন—

'মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকবনম্রা, ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতি প্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ ; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া যায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে। ['কেকাধ্বনি', ১৩০৮ ভাদ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪/১৯০৭]

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতানুসারী গদ্যের সূত্রটি এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে—শব্দ-সৌন্দর্য নয়, ভাবসৌন্দর্যই তাঁর কাম্য।

পর মুহূর্তেই এই সূত্র প্রয়োগ করে সুরেলা কাব্যস্পন্দী গদ্য সৃষ্টি করলেন—

[১১] 'আষাঢে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতরঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান ; কান তাহার মাধুর্য জানে না ; মনই জানে ; সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক

মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।' [কেকাধ্বনি]

এখানে দীর্ঘ স্বরধ্বনি ও কোমল ব্যঞ্জনধ্বনির নিপুণ ব্যবহারে একটি প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে এক রমণীয় ধ্বনিমাধুর্য আমাদের শ্রুতিকে আচ্ছন্ন করে। আবৃত্তি-উপযোগী বাক্যাংশগুলির কুশলী উপস্থাপনে তরঙ্গিত ধ্বনি একটি চমৎকার এফেক্ট সৃষ্টি করেছে।

এখানেই প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের গদ্যরীতির সূত্রপাত। ধ্বনিগাম্ভীর্য, ছন্দঃস্পন্দ, স্বরবৈচিত্র্য মিলে গদ্যভাষার একটি কন্‌সার্ট বেজে উঠেছে। এই কন্‌সার্ট সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ এইসব উপাদান ব্যবহার করেছেন—তৎসম শব্দ, যুক্তাক্ষর দীর্ঘস্বরধ্বনি, কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি, বাক্যের ধ্বনিবিস্তার,—সবটা মিলিয়ে স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ লয়ের উত্থানপতনসমন্বিত তান। মনে হয় বাণভট্ট যে ক্লাসিকাল নিষ্ঠা ও প্রয়োজনবিহীন শিল্প-আনন্দে বিভোর হয়ে গদ্যভাষার মর্মরসৌধ গড়ে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই নিষ্ঠা ও আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে প্রাচীন সাহিত্যের স্টাইল সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু তিনি বাণভট্টের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। সচেতন শিল্পকর্মরূপে তিনি এই গদ্যরীতির চর্চা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তার উপর সংস্কৃত ভাষারীতি আরোপ করে দেওয়া যায় না। বাংলায় নেই স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ, নেই অন্ত্যস্বরধ্বনির উচ্চারণ, আছে অকারের প্রতি উপেক্ষা, হসন্ত বর্ণের প্রভাবে লোপ পেয়েছে অন্ত্যস্বর-ধ্বনি আর চল্‌তি ভাষায় প্রাধান্য পেয়েছে যুক্তবর্ণের ধ্বনি। এর ফলে বাংলা ভাষা হয়েছে লঘু, তাতে সংস্কৃত স্বরধ্বনির মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর এটা অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি শ্বাস-পর্ব ও সার্থ-পর্ব অনুযায়ী বাক্যাংশ রচনা ও যতি চিহ্ন ব্যবহার করে ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে এই পথেই অগ্রসর হয়ে গেলেন। বাক্যাংশ, বিশেষণ, তুলনাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে সমতল ধ্বনির অর্থযতিবিভাজন করেই ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি করলেন। দীর্ঘ বাক্য ও পরস্পর নির্ভর বাক্যাংশ ব্যবহার করে অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন। তাতেই এলো ধ্বনিস্পন্দন। [দ্র° বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ, শ্রীভবতোষ দত্ত, রবীন্দ্রায়ণ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৮]

একটি উদাহরণ থেকেই প্রাচীন সাহিত্যের গদ্য রীতির বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হবে।

[১২] তরুণ শুভ্রভালে যে দিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যে দিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সে দিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর, যে দিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সে দিন বধূ উর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলি-শয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে! সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল! যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাহার দেবতা-যুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; উর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে একেবারে মুছিয়া গেল। [কাব্যের উপেক্ষিতা, ১৩০৭, প্রাচীন সাহিত্য]

এই উদাহরণে দীর্ঘ বাক্যের অতি ব্যবহার প্রথমেই চোখে পড়ে। 'যে', 'সে', 'যে দিন', 'সেদিন'—এই সব পরস্পর নির্ভর সর্বনামের দ্বারা মিশ্র বাক্য রচিত হয়েছে। অর্থের জোর (এমফ্যাশিস) বুঝাবার জন্য এদের ব্যবহার হয়েছে। বাক্যগুলি স্পষ্ট বাক্যাংশ সমূহে বিভক্ত, যতিচিহ্ন দ্বারা বিভাজিত। দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরা শেষে হ্রস্ব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, তার ফলে দীর্ঘ বক্তব্যের শেষে যেন সমাপ্তিরেখা টানা হয়েছে। সংস্কৃতানুযায়ী সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন— 'তরুণশুভ্রভাল', 'অভিষেক-মঙ্গলাচরণ', 'ক্রৌঞ্চবিরহিণী', 'মাঙ্গল্যরচনা', 'দেবতাযুগল'। সংস্কৃত সন্ধিবদ্ধ পদও আছে, যেমন—'অর্ধাব-গুণ্ঠন', 'মঙ্গলাচরণ'। আর আছে অনুপ্রাসের নিপুণ প্রয়োগ,—'ধূলিশয্যায়

বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত', 'উর্মিলার আত্মবিলোপ', 'প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায়', 'সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান'।

স্বদেশ, শান্তিনিকেতন, ধর্ম গ্রন্থে এই রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করি। তারপর রবীন্দ্রনাথ একে চিরকালের মতো পরিত্যাগ করেছেন।

॥ চার ॥

১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের (১২৯৮ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের) মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের চুয়াল্লিশটি গল্প (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন থেকে অতিথি) ছিন্নপত্রের অধিকাংশ পত্র এবং সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রায় সবই সাধনা পত্রিকার জন্য লিখিত।

গদ্যে নোতুন পরীক্ষার স্থল এই সব গল্প ও পত্রগুচ্ছ। গল্পগুলি সাধনা পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১২৯৮ থেকে কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত (রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ খণ্ডে সংকলিত)।

সাধনার যুগের গল্পে ও ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ কথ্যভঙ্গিম গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। গল্পগুলি আত্মমগ্ন কবির লেখনীতে রচিত, ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছও তাই। এ দুয়ের মধ্যে সমধর্মিতা আছে। ছিন্নপত্রের অনেক পত্রেই গল্পের মূল উপাদান পাই। (এর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য—শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', ভাদ্র ১৩৬১, পৃ ২৯)। মনে রাখতে হবে সাধনার যুগের গল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড় কলমে রচিত, আর ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছ কবির কলমে রচিত। সুতরাং গল্পগুচ্ছ ও ছিন্নপত্রকে সমধর্মী গদ্য রূপে বিচার করাই উচিত। এই গদ্য ঘরোয়া, আবেগস্পন্দিত, কথ্যভঙ্গিনির্ভর।

প্রাচীন সাহিত্যের ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনিরোল এই কথ্যভঙ্গিতে প্রত্যাশিত নয়। কারণ কথ্যভঙ্গি সুরবর্জিত, তা স্পন্দন সৃষ্টির অনুকূল নয়। রাজা প্রজা, সমাজ, সমূহ প্রভৃতি সমকালীন প্রবন্ধ-গ্রন্থে এই রীতিই অনুসৃত। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানাত্মক, রসাত্মক, কর্মাত্মক—সকল গদ্যরচনাই কবির কলমে লেখা বলে গল্পগুচ্ছ ও ছিন্নপত্রের সঙ্গে এদের ভাষাসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের রচনায় কথাগদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যে যে ব্যবধান আছে, তা রবীন্দ্র-রচনায় অনুপস্থিত। এই সত্যটি এই সময়কার সকল গদ্যরচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছ ও ছিন্নপত্রের ভাষার গুণ স্থিতিস্থাপকতা, স্বচ্ছতা ও চিত্রধর্মীতা। এই গদ্য ভাষার প্রবণতা কথ্যভঙ্গির দিকে।

গল্পগুচ্ছের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন তা প্রণিধান-যোগ্য।—

"তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি', এসব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ওসব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমবা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গডতে হলে তাঁদের কি দশা হত জানিনে।" ["সাহিত্য, গান ও ছবি", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি। পরিশিষ্ট, পৃ ৪৮, শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প'।]

সমকালে রচিত ছিন্নপত্র ও গল্পগুচ্ছ থেকে দুটি অংশ এখানে উদ্ধার করি। গদ্য ভাষার রূপ ও সমধর্মিতা এতেই প্রমাণিত হবে।

[১৩] বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড ভালবাসি।···এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে, বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহ বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথা-গুলো চিঠিতে লিখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না। [ছিন্নপত্র, ২২মে, ১৮৯৩]

পদ্মালালিত ভূখণ্ডের একটি বালিকার ছবি পাই গল্পগুচ্ছে।—

[১৪] মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট

সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতা-মাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ শিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে। ['সমাপ্তি', আশ্বিন ১৩০০/১৮৯৩]

ভাষার চিত্রধর্মিতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে: (১৩)-উদাহরণে "সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে"; (১৪)-উদাহরণে "ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকা পতন হয়।" দুটি-ই জীবন থেকে সদ্য তুলে-আনা ছবি। এখানে উপমা গতিময়, চিত্রধর্মী। এই ছবিতে শুধু বাহ্য বস্তুর প্রতিকৃতি নয়, মানসিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। এখানে উপমা আর অর্থালংকার মাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে ভাষা—লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগসেতু। গল্পগুচ্ছে এই সংযোগসেতু বারবার দেখা গেছে।

(১৩) ও (১৪)—দুটি উদাহরণেই ছিপ্‌ছিপে মেয়ের বর্ণনা, একটিতে চঞ্চলা নদী, অপরটিতে নদীমাতৃক ভূখণ্ডের চঞ্চলা কিশোরী। দুটি বর্ণনায় বিষয়ের ও বর্ণনার সমধর্মিতা আছে তা নয়, ভাষাভঙ্গিতেও সমধর্মিতা আছে। ছিন্নপত্রের ভাষা চলতি ভাষা, সমাপ্তি গল্পের ভাষা কথ্যভঙ্গিম ভাষা। সমাপ্তি গল্পের ভাষা (উদাহরণ ১৪) সরল, ঘরোয়া, মৌখিক বাঁধুনিযুক্ত। পার্থক্য শুধু ক্রিয়াপদের। এই পার্থক্য অগ্রাহ্য এই কারণে যে ক্রিয়াপদই সাধু ও চলিত ভাষার মৌল পার্থক্য নয়। এ দুটির গুণসাদৃশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—এই ভাষা স্থিতিস্থাপক, চিত্রধর্মী, আবেগনির্ভর ও স্বচ্ছ।

গল্পগুচ্ছের ভাষা আসলে মিশ্ররীতির ভাষা, এখানে আছে স্পন্দিত গদ্য, নিরাভরণ গদ্য, বস্তুনির্ভর গদ্য। সবেরই প্রবণতা কথ্যভঙ্গির দিকে। তা সহজ, প্রাণধর্মী; কোথাও তা কৃত্রিম নয়, সজ্জিত বা অলংকৃত নয়। এখানে

অলংকার ভাষাশরীরেরই লাবণ্য, তা বহিরারোপিত নয়। এই গুণকেই শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন, 'স্বাভাবিক ও সহজাতসৌন্দর্য'। 'এই অলংকৃতি বিভূষণভার নয়।'

গল্পগুচ্ছের ভাষারীতি সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' গ্রন্থে (বৈশাখ, ১৩৬২)। তিনি এই ভাষারীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য, ভাষার সাত্ত্বিকতা বা নির্লিপ্ততা-গুণ। গল্পগুচ্ছের ভাষা-রীতিতে, 'শাস্তি' গল্পের ছিদামের দেহের মতো, 'একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়।' এই পরিপাট্য ও মিতভাষিতা প্রকাশ পেয়েছে 'শাস্তি'তে বড়ো বৌয়ের হত্যাকাণ্ড বর্ণনায়:

[১৫] 'ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় রুদ্ধ গম্ভীর গর্জনে (দুখিরাম) বলিয়া উঠিল, 'কী বললি।'—বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে 'কী হোলো গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।' [শাস্তি']

ব্যস্, এই-ই সব। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নাটকীয় বর্ণনা নেই, শরৎচন্দ্রের মতো ভাবালু বর্ণনা নেই, এ কেবল নির্লিপ্ত বর্ণনা। "ভাষায় কোনোখানে এতটুকু বেশি জোর দেয়া হয়নি; যেন অত্যন্ত সাধারণ দৈনন্দিন কোনো ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে, এমনি আটপৌরে ভাষা; বরং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রত্যেকটি বাক্য 'ইল' প্রত্যয়ান্ত শব্দে শেষ হওয়ায় ভাষাবিন্যাসে কিছুটা শৈথিল্যই ধরা পড়ে।"

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য গল্প উপস্থাপনা সম্পর্কিত,—কথকতার ভঙ্গি,—যে গুণকে আমরা বলেছি স্পন্দনবর্জিত কথ্যভঙ্গি। "গল্প তিনি সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন, ভূমিকা করেন না, দম নেবার জন্য থামেন না, পরোক্ষভাবে উপদেশ দেন না, ঠিক মুখে বলা গল্পের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তাঁর কাহিনী; সে-স্রোত কোথাও অত্যধিক বর্ণপ্রয়োগে ঘোলা হয়ে ওঠে না, সেটি একেবারে স্বচ্ছ অথচ মানব-হৃদয়ের রহস্যের মতোই অতলস্পর্শী।"

গল্পগুচ্ছের ভাষার আর-একটি গুণ সম্পর্কে এখানে আমরা সচেতন হয়ে উঠি : স্বচ্ছতা। উপমার চিত্রধর্মিতা থেকেও এই স্বচ্ছতা আসে। মনের যে-গহনে বিশুদ্ধ আখ্যান পৌছতে পারে না, সেখানে জীবন থেকে সগু তুলে-আনা চিত্রধর্মী উপমার আলো ফেলে লেখক তাকে প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, স্বচ্ছ করে তোলেন। ভৃত্য রাইচরণ যখন প্রভুপুত্রকে 'খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না', বলে কদমফুল আনতে গেলো, তখন খোকার কাছে নিষিদ্ধ জলটাই লোভনীয় হয়ে উঠলো ; সে নদীর ধারে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, তাকিয়ে দেখলে, 'জল খলখল ছল ছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া একলক্ষ শিশুপ্রবাহ কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।' ['খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন']—এখানে ভাষা স্বচ্ছতাগুণ অর্জন করেছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : উপমা (সুক্ষ্মবিচারে বিস্তারিত বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নয়) ও বিশেষণের (বিশেষণও একপ্রকার অলংকার) ব্যবহার, উপমা ও বিশেষণের কোনো স্বতন্ত্র গৌরব এখানে বড়ো হয়ে ওঠে নি, কাহিনীর অগ্রগমনই একমাত্র লক্ষ্য। "উপমার যাথার্থ্যে, বর্ণনার বাস্তবঘনতায় এখানে একটি সুন্দর সৌষম্য অনুভব—উঁচু-নিচু নেই, সমতলভাবে কাহিনীর স্রোত প্রবাহিত—ভাষা যেন স্বতন্ত্রভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচরই হয় না, শুধু কাহিনীকে এগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।"

উপমা ও বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ভাবপ্রধান ও রূপপ্রধান বর্ণনায়। প্রথমটার উদ্দেশ্য পাঠক-মনে একটি ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি, দ্বিতীয়টার উদ্দেশ্য চিত্রাংকন।

প্রথমে দুটি ভাবপ্রধান ও পরে দুটি রূপপ্রধান বর্ণনা এখানে চয়ন করি।

[১৬] বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দু-প্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। ['শাস্তি']

[১৭] গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর

উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ;—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরাবলী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত। ['ক্ষুধিত পাষাণ']

[১৮] নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরেজরচিত আধুনিক শৈল নগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত-প্রস্তর-রচিত বড়ো-বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তী-পৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর খচিত হাওদা, পুরবাসীগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুর-প্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার। ['দুরাশা']

[১৯] নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করে। ['মধ্যবর্তিনী']

গল্পগুচ্ছে নানা রূপের গদ্য আছে—সাধু থেকে চলিত, ঋজু থেকে বঙ্কিম, নিরাভরণ সারল্য থেকে সমৃদ্ধ কারুকলা, লঘু-তরল থেকে ধীর গম্ভীর, কৌতুক-প্রফুল্ল থেকে বিষাদ-করুণ—সব রকমই আছে। সবটা মিলিয়ে স্বচ্ছ, কথ্যভঙ্গিম, পরিমিত, পরিপাটি, স্থিতিস্থাপক, চিত্রধর্মী গদ্য। গল্পগুচ্ছের ভাষা দর্পণের মতো কাজ করে—স্বচ্ছ প্রতিবিম্বের মতো তা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত।

ছিন্নপত্রের গদ্য গল্পগুচ্ছের থেকে স্বভাবধর্মে ভিন্নতর নয়, তা পূর্বে লক্ষ্য

করেছি। এখানে একটি রূপপ্রধান বর্ণনা চয়ন করি, তাতেই এই বক্তব্য প্রমাণিত হবে।

[২০] জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই—চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধু ধু শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়—সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই—ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা—চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে—যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড় পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে। [পতিসর ১৭ মার্চ ১৮৯৪]

গল্পগুচ্ছের ভাষারীতির সঙ্গে এই পত্রের রীতির মিল এতই প্রকট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। সেই স্বচ্ছতা, চিত্রধর্মিতা, রূপবর্ণনার প্রত্যক্ষতা, বিশেষণ ব্যবহারে সেই একই কৌশল, সেই পরিমিতি, সেই পারিপাট্য, সেই নিরাভরণ সারল্য অনায়াসলক্ষণীয়।

গল্পগুচ্ছে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষণ স্মরণ করা যাক্—'সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালক' (ছুটি), 'নিরীহ চঞ্চল ক্ষুদ্র কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ' (শাস্তি), 'সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোক-উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ' (অতিথি), 'ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস' (পোস্টমাস্টার)। এখানে পাই এই সব বিশেষণযুক্ত পদ—'ধু ধু শূন্য মাঠ', 'ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা', 'বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোক', 'একটি মরুময় বৃহৎ গোর', 'একটি সাদা কাপড়-পরা মেয়ে'। সর্বত্রই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী বিশেষণের প্রয়োগ, কোনোটাই বৃথা যায় না। এই সব বিশেষণের প্রয়োগে চিত্রধর্মী রূপ

দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সাহিত্যের দীর্ঘ যৌগিক ও মিশ্রবাক্য গল্পগুচ্ছে (ও ছিন্নপত্রে) একেবারে ব্যবহৃত হয় নি, তা নয়, কিন্তু তার ব্যবহার কমে এসেছে। দীর্ঘ বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে, পরস্পরনির্ভর বাক্য আর ব্যবহৃত হয় নি, দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরাও বর্জিত হয়েছে। প্রাচীন-সাহিত্যের গদ্যভাষার লক্ষ্য ছিল ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনি গাম্ভীর্য, গল্পগুচ্ছের লক্ষ্য স্থিতিস্থাপকতা ও স্বচ্ছতা।

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্র-গদ্যের দ্বিতীয় যুগের শেষ দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গোরা (১৯১০, ভাদ্র ১৩১৪-চৈত্র ১৩১৬, প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত) ও জীবনস্মৃতি (১৯১২, ভাদ্র ১৩১৮, শ্রাবণ ১৩১৯, প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রচিত এই দুটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভাষা ব্যবহারে যে ভারসাম্য অর্জন করেছিলেন তা আর কখনো দেখা যায় না।

গোরা ও জীবনস্মৃতির ভাষা সম্পর্কে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সিদ্ধান্ত সবচেয়ে নির্ভুল বলে আমার মনে হয়।—

এখানে "রবীন্দ্রনাথ ভাষার মধ্যগারীতির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন—অবশ্য তাঁর মতো প্রচণ্ড সাহিত্যিক পার্সোনালিটি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যতখানি কাছাকাছি আসা সম্ভব। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট পদাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও সে পদাঙ্ক বাঁচিয়ে পাশ দিয়ে চলবার রাস্তা আছে। এ ভাষাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করলে খুদে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে না—গ্রহণকারীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবার আশা থাকে। শরৎচন্দ্র বলেছেন যে, তিনি পঞ্চাশবার গোরা পড়ে ভাষার মহড়া দিয়েছিলেন। কথাটা সত্য বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্রের প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ঋজু নিরলঙ্কার ভাষা গোরার ভাষাকে মনে করিয়ে দেয়। এমন কি আমার বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ভাষার ভিত্তিও গোরার ভাষা; উভয় ক্ষেত্রেই ঋজু, তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ প্রসাদগুণ। অলঙ্কার রবীন্দ্র-সাহিত্যের, কি গদ্যের কি পদ্যের, প্রধান লক্ষণ। সেই অলঙ্কার-প্রাচুর্যের চাপ এই সময়ের রচনায় কিছু কম, অলঙ্কার বর্জন একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ও অনুভূতির মিডিয়াম অলঙ্কার। বিশেষণ

ও অলঙ্কারের আপেক্ষিক বিরলতা, অলঙ্কারে ও শব্দসম্ভারে স্বতোবিরুদ্ধের মিশ্রণ, ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা তাঁর গদ্যরীতিতে এমন একটা আত্মনিষ্ঠ ভারসাম্য দান করেছে যার একমাত্র তুলনা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যার অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায় আর পাই না। এই ভারসাম্যের বারে বারে উল্লেখ করেছি বঙ্কিমের রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে। ভাষায় এই ভারসাম্য ভাষাব্যবহারকারীর, ভাষার পাঠকের অর্থাৎ সমাজের ভারসাম্যের একটা বহিঃপ্রকাশ। এখানেই বাঙালী সমাজের ভারসাম্যের শেষ মুহূর্ত্ত, এর পরে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, ভাষারীতিরও।" [বাংলা গদ্যের পদাংক, ভূমিকা, পৃ ১৭৮]

ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা, স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা—সবটা মিলিয়ে প্রসাদগুণ ও ভারসাম্য গোরা ও জীবনস্মৃতির গদ্যভাষায় লক্ষ্যণীয়। কথ্যভঙ্গিম বাগ্‌রীতি, সরল ও মিশ্রবাক্য, শব্দ ব্যবহারে ঔদার্য, ভারসাম্যযুক্ত বাক্যবিন্যাস, পদবিন্যাসে ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা ও প্রাঞ্জলতা,—সবটা মিলিয়ে একটা ধাবৎশক্তি ও স্বচ্ছতা এই দুই গ্রন্থে অনায়াসলক্ষ্যণীয়। মনে হয় লেখক সাধু ক্রিয়াপদের ঠাট বজায় রেখে চলতি রীতিকেই আশ্রয় করেছেন। গোরা উপন্যাসেই সর্বপ্রথম মুখের ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে।

সামান্য উদাহরণেই এই মন্তব্যের পোষকতা হয়।

[২১] শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁওয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। [গোরা, প্রথম পরিচ্ছেদ]

ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধু রূপ সত্ত্বেও কথ্যরীতির প্যাটার্ন এখানে গৃহীত হয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশী-বিদেশী সাধু-অসাধু শব্দ নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে, তৎসম শব্দের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অতীত কালের বর্ণনায় বর্তমান ক্রিয়াপদের 'ইয়াছে' প্রত্যয়ান্ত রূপটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনা যে অতীত কালের তার পরিচয় এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদের

প্রথম বাক্যেই আছে—"এমন দিনে বিনা-কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ······ দেখিতেছিল।"

[২২] এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, আজ বিনয়বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন এক মুহূর্তের জন্যও বিনয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে সে কেবলই মনে করিয়াছে বিনয় হয়তো আসিয়াছে, হয়তো সে উপরে না আসিয়া নিচের ঘরে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এই জন্য দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়াছে তাহাব ঠিক নাই। অবশেষে দিন যখন অবসান হয়, রাত্রে যখন সে বিছানায় শুইতে যায়, তখন সে নিজের মনখানা লইয়া কী যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে—সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে, কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই। কেবলই মনে হয়, 'এ কী হইল! আমি বাঁচিব কী করিয়া! কোনো দিকে তাকাইয়া যে কোনো রাস্তা দেখিতে পাই না। এমন করিয়া কতদিন চলিবে!' [গোরা, পরিচ্ছেদ ৩৬]

পূর্বেকার দীর্ঘ বাক্যগুলিকে ভেঙে এখানে ক্ষুদ্রতব বাক্যে পরিণত করা হয়েছে, তার ফলে এসেছে ধাবৎশক্তি। ভাবতরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের দৈর্ঘ্য কমে বাড়ে, উচ্চাবচ পথে বাক্য ছুটে চলে। যেখানে বিবরণে এমফ্যাসিস্ দেখানোব প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে 'কী' শব্দটি নিপুণ-ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: 'কী যে করিবে ভাবিয়া পায় না', 'এ কী হইল', 'বাঁচিব কী করিয়া'। পাশাপাশি হ্রস্ব-দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারের দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে। সমস্তটার মধ্যে পাই ঋজুতা, তীক্ষ্ণতা, স্বচ্ছতা।

[২৩] স্মৃতিব পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। [জীবনস্মৃতি, সূচনা]

'আঁকে', 'আঁকুক'—কথ্য ক্রিয়াপদ ও 'আগের', 'পাছের'—কথ্য

বিশেষণ ব্যবহারে এই অংশের কথ্যভঙ্গিটি ফুটে উঠেছে। এই অংশের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা। এই গুণে ছবিটি অন্তরঙ্গ ও হার্দ্য হয়ে উঠেছে।

[২৪] এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। [জীবন-স্মৃতি, 'কড়ি ও কোমল' পরিচ্ছেদ]

বাক্যবিন্যাস কৌশলটি লক্ষ্য করার মতো। দুটি হ্রস্ব বাক্যের মাঝে একটি দীর্ঘ বাক্য স্থাপন করে সংহতি রক্ষা করা হয়েছে। আবার দীর্ঘ বাক্যটিতে পদবিন্যাসকৌশলে বাক্যের সংহতি ও ভারসাম্য বিচলিত হয় নি। কথ্য-ভঙ্গির প্যাটার্ন বজায় আছে, কথ্য ও সাধু ইডিয়ম পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে। 'পালা সাঙ্গ', 'মেলামেলির দিন', 'ডাঙার পথ', 'ভাঙাগড়া' যেমন আছে, 'জীবনের যাত্রা', 'সুখদুঃখের বন্ধুরতা', 'সংঘাত ও সম্মিলন' তেমনি আছে। সবটা মিলিয়ে অন্তরঙ্গ আটপৌরে পরিবেশ। এই ভাষা সম্পর্কে একটি কথাই বলা চলে—স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা,পুনরপি স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার আলোকে আটপৌরে পরিবেশ লাবণ্যমণ্ডিত হয়েছে। জীবনস্মৃতির ভাষায় আছে লাবণ্য, প্রসন্নতা ও মাধুর্য।

এখানেই রবীন্দ্র-গদ্যের দ্বিতীয় যুগের অবসান।

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্র-গদ্যের তৃতীয় যুগ সবুজপত্র-বিচিত্রার যুগ (১৯১৪ কেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ)। জীবনের এই শেষ পঁচিশ বছর রবীন্দ্র-গদ্যের স্বর্ণযুগ। গদ্যের শিল্পরূপে নানা পরীক্ষা, নানা উদ্ভাবন, গদ্যকবিতার অবিষ্কার, পদ্যের ভাষায় গদ্যের মেজাজের আমদানি, গদ্য-পদ্যের দূরত্ব হ্রাস, বাগ্‌ভঙ্গীর বিচিত্র পরীক্ষা এই যুগে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিবেকানন্দ স্বামীর রচনায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধে ও নাটকে

কথ্যরীতির যে সব পরীক্ষা ও সাফল্য দেখা যাচ্ছিল, তার অলংকারসমৃদ্ধ শিল্পরূপটি এই যুগের রবীন্দ্র-গদ্যে দেখা গেল।

এই যুগের সূত্রপাত হ'ল সাধুভাষা ও চলতি ভাষার তর্কে। তর্ক যখন জমে উঠেছে তখন রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন চতুরঙ্গ ও ঘরেবাইরে উপন্যাস নিয়ে (১৩২২ বঙ্গাব্দেব সবুজপত্রে প্রকাশিত। দুটিই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। এ দুটি উপন্যাসে নোতুন পদ্ধতিব প্রথম উদাহরণ, ভাষা রীতিতেও সে নোতুনত্ব দেখা গেল। চতুরঙ্গ সাধুভাষাব কাঠামোটা গ্রহণ করেছে মাত্র, চলতিভাষার সবগুণই আত্মসাৎ কবেছে। ঘবেবাইরে পুবো-পুরি চলতি ভাষায় লেখা উপন্যাস। চলতি ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প—'স্ত্রীরপত্র' (শ্রাবণ ১৩২১/গল্পগুচ্ছ) ও 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ় ১৩২৪ গল্পগুচ্ছ)। আব প্রবন্ধ 'বাতায়নিকেব পত্র' (আষাঢ় ১৩২৬/কালান্তর ১৯৩৭)।

সাধু বাংলা গদ্য আর চলিত বাংলা গদ্য—এই শ্রেণীবিভাগের একটিমাত্র স্থূল ভেদবেখা আছে—ক্রিয়াপদেব রূপান্তর। আর এই স্থূল ভেদেব উপর নির্ভর করার ফলে ঘটে ভ্রান্তি। সাধু ও চলিত গদ্যরীতিব ভেদরেখা হওয়া উচিত কথ্যভঙ্গির প্রতি আনুগত্য বা তা থেকে বিচ্যুতি। বঙ্কিমেব শেষের দিকের গদ্যরচনায় কথ্যভঙ্গির প্যাটার্নের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, একথা স্বীকার করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথে এসে সেটা আব ইশারা মাত্র রইলো না, স্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিলো।

একথা ঠিক যে ক্রিয়াপদের রূপান্তরে বাংলা উচ্চারণভঙ্গি তথা বাগ্‌ভঙ্গি বদলে যায়। বাংলা উচ্চারণে শব্দের অন্ত্যস্বরধ্বনি লোপ পায় ও আদ্যস্বরের উপর ঝোঁক পড়ে, একথা সবাই জানেন। তাব ফল সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি না। শব্দে হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়, ব্যঞ্জনসংঘাত ও ঝোঁকের ফলে বাক্যে আসে গতিবেগ, ক্রিয়াপদের রূপান্তরেই এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে। "তুমি আমার প্রাণে সুরের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছ"—এই সাধু বাক্যটি চলিত বাংলায় এই রূপ গ্রহণ করে—"তুমি আমার প্রাণে সুবের আগুন জ্বালিয়ে দিলে।" 'আমার', 'সুরের' 'আগুন' শব্দে অন্ত্যস্বরধ্বনির লোপ হয়েছে ; 'জ্বালাইয়া দিয়াছ' ক্রিয়াপদের পরিবর্তিত রূপে ('জ্বালিয়ে দিলে') এসেছে গতিবেগ ও চাঞ্চল্য। 'আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া আসিল।' এই বাক্যের চলিত রূপ—'আকাশ থেকে নেমে এলো একখানা অন্ধকার'।

অন্ত্যস্বরধ্বনি লোপ ও আন্ত্যস্বরের উপর ঝোঁকের ফলে হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, ব্যঞ্জন-সংঘাতে 'অন্ধকার' শব্দটির সিলেবল্-দৈর্ঘ্য কমে গেছে, এসেছে গতিবেগ।

চলিত গদ্যের চাল হয় দ্রুত, বাক্য বিভক্ত হয় কয়েকটি খণ্ডে (আন্ত্যস্বর-ধ্বনির উপর ঝোঁকের ফলে সৃষ্ট হয় বাক্যখণ্ড), বর্জিত হয় সুর, ব্যঞ্জন-সংঘাতে সৃষ্ট হয় নোতুন ধ্বনিরূপ।

রবীন্দ্রনাথ যখন চতুরঙ্গ ও ঘরেবাইরে লেখেন তখন এসব কথাই তাঁর শিল্পীমনকে প্রেরণা দিচ্ছিল। কেবল সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরীর বাইরেকার তাগিদে তিনি সাধুগদ্য পরিত্যাগ করে চলতি গদ্যে এলেন, একথা অযথার্থ। আসলে তাঁর মনের মধ্যে যে প্রেরণা অনেকদিন ধরে কাজ করছিল, তা বিবর্তনের ধারায় স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নিয়ে দেখা দিলো।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১, ১৮৯৩), ছিন্নপত্র (১৯১২), শান্তিনিকেতন-ভাষণাবলী (১৯০৯-১৬), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), গোরা-র (১৯১০) সংলাপ-অংশ, অচলায়তন (১৯১২) পর্যন্ত গদ্য নাটকের সংলাপ-অংশ—এই সব রচনায় গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকে ব্যবহার করে এসেছেন। এই ভাষার রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে। ক্রিয়াপদের মৌলিক রূপেই চলতি ভাষা নির্ভরশীল নয়, এ সত্য রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না।

গোরা ও জীবনস্মৃতির ভাষা স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল, ঋজু ও তীক্ষ্ণ, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আবো দেখছি, তা চলিত ভাষা রূপের কতো নিকটবর্তী হয়েছে। গোরার ভাষারূপের একটি বৈশিষ্ট্য পুনর্বার স্মরণযোগ্য—যে অলংকার (বিশেষণ ও উপমা) রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও অনুভূতির মিডিয়াম, তার প্রাচুর্য হ্রাস পেয়েছে। অলংকারের আপেক্ষিক বিরলতা ঐ গদ্যকে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল, প্রসন্ন ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

চলতি বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশ বছর (১৮৮১-১৯১৬) ধরে গড়ে তুলেছিলেন। চলতি ক্রিয়াপদ গ্রহণ করা বলতে তিনি কি বুঝেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাই 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে (১৯৩৮)। সাহিত্যিক কথ্যভাষার উপাদান কি হবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায়' গ্রহণ করতে হবে। শব্দগ্রহণে

ঔদার্য থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানচর্চার ফলে নতুন-বানানো পারিভাষিক শব্দ আমরা পেয়েছি। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে সমাজজীবনের দিগন্ত প্রসারের ফলে নব নব চিন্তা ও অনুভূতির বাহন রূপে অনেক শব্দ সংগৃহীত ও সৃষ্ট হয়েছে। তার ফলে এখন 'কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ড-নীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে। নোতুন কাল, নোতুন জীবন বাংলা ভাষাকে দিয়েছে নব প্রাণ, নব সম্পদ। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটে নি।' [বাংলা ভাষা-পরিচয়, ১০]

এইবার চতুরঙ্গ ও ঘরেবাইরের ভাষারূপ আমরা পরীক্ষা করতে পারি। চতুরঙ্গের কাঠামোটা সাধুভাষার, প্রকৃতি চলতি ভাষার। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের সমস্যার কোন সমাধান রবীন্দ্রনাথ এখানে করেছেন? আমরা জানি, ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি বা স্থানান্তরণে সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। তার পরীক্ষা হ'ল চতুরঙ্গে। নিম্নধৃত উদাহরণে তা ধরা পড়ে।

[২৫] গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-এক বার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চস্বরের ডাক— 'বামী'। আমরা ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক তো ওইখানেই —যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি— সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকৃমিক্ করিয়া উঠিতেছে। [চতুরঙ্গ, শচীশ]

চতুরঙ্গের সকল ভাষা বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকাশিত। অলংকারসমৃদ্ধ বর্ণনা, উপমা ও বিশেষণের শিল্পসমৃদ্ধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরো লক্ষণীয় ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি : "যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ"; "দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী", "বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ" কিন্তু বাক্যের বাঁধুনি আছে, তা সংহত।

কথ্যভঙ্গিম গদ্যের যে ঝোঁক চতুরঙ্গে লক্ষ্য করি, তার সূচনা গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে। ক্রিয়াপদের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রায়শই বিনষ্ট হয়েছে চলতি রীতির প্রতি অতি-আগ্রহে। "ভাবের যে শ্মশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম"—এখানে আনুগত্য অনভিজাত চলতি রীতির কাছে, অভিজাত সাধুরীতির কাছে নয়। "তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ"—সর্বনামপদের চলতি রূপের স্বীকৃতি এখানে লক্ষণীয়। "অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্‌ঝর্ করিয়া এক পসলা বৃষ্টি", "ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়"—এইসব বাক্যাংশে উপমাসমৃদ্ধি ও মৌখিক রীতি-আনুগত্য—দুই-ই চোখে পড়ে।

চতুরঙ্গে যা ছিল নিরুদ্ধ, ঘরেবাইরেতে তা হ'ল মুক্ত। চলতি রীতির সম্পূর্ণ অবলম্বনকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। চলতি ভাষার কেবল আত্মিক গুণ নয়, চেহারাটাও ঘরেবাইরে উপন্যাসে স্বীকৃত হ'ল। ক্রিয়াপদের সমস্যা আর রইলো না, কিন্তু তার ফলে ঘরেবাইরের ভাষা অধিক পরিমাণে কথ্যরীতির নিকটবর্তী হয়েছে, একথা মনে করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষা লিখছেন না, কথ্যভাষার সাহিত্যিকরূপ নির্মাণ করছেন, এবং তাঁর গদ্য কবির গদ্য—এ সত্য আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারি না। চতুরঙ্গ থেকে ঘরে বাইরে—একটি ধাপ—এখানে ক্রিয়াপদের রূপ চলতি হ'ল। অতীতকালের ক্রিয়াপদের রূপ হ'ল কথ্যভাষাশ্রয়ী—'দিলে', 'বললে,' 'করলে'। ভাষার কারুকর্মে দেখা গেল আতিশয্য। বাক্য হ'ল দীর্ঘ পল্লবিত এলায়িত, বিশেষণ ও অর্থালংকারের ব্যবহার হ'ল অপরিমিত, প্রকাশভঙ্গীতে এলো তীক্ষ্ণতা ও আকস্মিকতা। 'সে তো', 'সেই,' 'যে', 'তো'

'সে', 'সে যে', 'ও'—প্রভৃতি অব্যয় ও সর্বনামের ব্যবহার বেড়ে গেল। চতুরঙ্গের সকল শাসন ও সংহতিকে ভেঙে ভাষা এখানে উচ্ছল, উচ্ছ্বসিত, অলংকারদীপ্ত হয়ে উঠল। সৌষম্যকে ছাপিয়ে উঠল আতিশয্য।

[২৬] কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার টিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না। [ঘরেবাইরে]

[২৭] মাগো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। সে যে দেখছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উমাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার? [তদেব]

এ দু'টি উদাহরণে ঘরেবাইরের ভাষারীতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাই। অলংকারের ঔজ্জ্বল্যে, বিশেষণের প্রাচুর্যে, উপমা উৎপ্রেক্ষা লক্ষণা বিরোধ নিশ্চয় প্রভৃতি অর্থালংকারের সমারোহে ঘরেবাইরের গদ্যভাষা উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। এ যেন ভাষার পেয়ালায় অলংকারের উপ্‌চে-পড়া স্রোত। জীবন-স্মৃতি বা গোরার ঋজুতা, প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতার জায়গায় এসেছে উচ্ছলতা, ঔজ্জ্বল্য, বাক্যের পল্লবিত বিস্তার, অলংকারের হীরকদীপ্তি।

'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' গল্পে 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে এই ভাষারী-তিরই স্বীকৃতি।

॥ সাত ॥

এর পরে ভাষারীতির নোতুন পরীক্ষাস্থল 'লিপিকা' (১৯২২)। গদ্য-পদ্যের দূরত্ব হ্রাস, পদ্যের ভাষায় গদ্যের মেজাজ আমদানি, গদ্যকবিতার আবিষ্কার—এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হ'ল লিপিকায়। ক্রিয়াপদের

হ্রস্ব রূপ ও সর্বনামের হ্রস্ব রূপ সাহিত্যিক কথ্যভাষার বহির্লক্ষণ। অন্তর-লক্ষণ বলতে আরো কিছু বোঝায়। চতুরঙ্গ ও ঘরেবাইরে উপন্যাসের ভাষার বহির্লক্ষণ ও অন্তরলক্ষণ, দুই-ই লক্ষ্য করেছি। তৃতীয় যুগের রবীন্দ্র-গদ্যের আলোচনার সূচনায় বলেছি, রবীন্দ্রসাহিত্যের এই শেষ পঁচিশ বছর গদ্যের স্বর্ণযুগ; বিচিত্র পরীক্ষা, বিচিত্র রীতির গদ্য এই যুগে বারবার দেখা গিয়েছে। গদ্যকবিতার অগ্রদূত বলে রবীন্দ্রনাথ লিপিকাকে নির্দেশ করেছেন। কথ্য-ভাষারীতির বিচিত্রতর পরীক্ষার সূচনা হল লিপিকায় ('শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় ১৯১৯-২০ সালে প্রকাশিত)।

গদ্যপদ্যের সীমানায় অবস্থিত লিপিকার বাক্যবিন্যাসকৌশল বিশেষ লক্ষণীয়। পদবিন্যাসে বিপর্যয় ঘটেছে, বাক্যবিন্যাসে মৌখিক রীতি অবলম্বিত হয়েছে; শব্দব্যবহারে ঔদার্য লক্ষ্য করা যায়। লিপিকার সব কথিকাই কাব্যঘেঁষা নয়, পরিচিত পরিবেশপ্রাধান্যও চোখে পড়ে। লিপিকার গদ্য-রীতি মিশ্র, সেখানে একটি স্টাইলের অন্বেষণ বৃথা। কয়েকটি উদাহরণে লিপিকার এই সব ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়।

[২৮] (ক) রূপকথাভঙ্গিম রীতি:

সামনে এল অসীম সমুদ্র স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়া অম্‌নি এ কী হল? এ কোন জাদুকরের জাদু?

এ যে সহর। ট্রাম চলছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে রাস্তায় উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল্? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে। [রাজপুত্তুর, লিপিকা]

(খ) দেশীশব্দপ্রধান ভাষারীতি :

এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম অকালকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু করতে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। [ঘোড়া, লিপিকা]

(গ) বিদেশীশব্দপ্রধান ভাষারীতি :

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না : 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' [কর্তার ভূত, লিপিকা]

(ঘ) সংস্কৃতশব্দপ্রধান ধ্বনিসমৃদ্ধ ভাষারীতি :

সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় তা'ই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক্ দূর বনান্তের রংটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনীতে মেঘ-মল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে। [মেঘদূত, লিপিকা]

লিপিকায় পদবিন্যাসে বিপর্যয় সত্ত্বেও বাক্যবিন্যাসে মৌখিক রীতি প্রাধান্য পেয়েছে, পদ্য-রীতি প্রাধান্য পায়নি। ক্রিয়াপদের চলতি রূপের বিলুপ্তি বা নামধাতুর প্রয়োগ নেই, আছে চলতি ক্রিয়াপদের স্বীকৃতি। আর আছে অর্থালংকারের নিপুণ ব্যবহার। সুতরাং লিপিকার মিশ্ররীতিকে গদ্য ভাষার একটি নোতুন পরীক্ষা বলেই গণ্য করা উচিত। এর ভিত্তিভূমি মৌখিক রীতি।

পদ্যের প্রধান উপাদান সুস্পষ্ট নক্সায় বিন্যস্ত পর্ব, গদ্যের প্রধান উপাদান অর্থসূচক শব্দসমষ্টি দিয়ে গঠিত ফ্রেজ বা গদ্যপর্ব বা বাক্যাংশ। পদ্যচ্ছন্দের ভিত্তি ঐক্য, গদ্যচ্ছন্দের ভিত্তি বৈচিত্র্য।

গদ্যের ছন্দ বলতে আমরা কী বুঝি? পদ্যচ্ছন্দের সঙ্গে তার মিল ও বিরোধ কোথায়? দুয়ের সীমারেখা কি?

"বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যতির মধ্যবর্তী শব্দসমষ্টি বা পর্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্যচ্ছন্দ ও গদ্যচ্ছন্দ উভয়ত্রই একথা খাটে। ছন্দোময় গদ্যেরও উপকরণ—এক এক ঝোঁকে (ইম্‌পাল্‌স্) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব।·········

পদ্যের পর্বের ন্যায় গদ্যের পর্বও দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্বের অন্তর্ভুক্ত পর্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতেই এক একটি পর্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ার-জাতীয় পদ্যের অনুরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা সিলেব্‌ল্ এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক কথায়, গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।··· ······

গদ্যেও এক একটি পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্বাঙ্গও দেখা যায়।

গদ্যে পর্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূল শব্দ থাকিবে। গদ্যে শব্দাংশ লইয়া পর্বাঙ্গগঠন করা চলে না। সুতরাং বলা বাহুল্য একটি পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে।

পদ্যের পর্বের সহিত গদ্যের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না-হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে ; কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাজান যায়।·······

পদ্যচ্ছন্দ ও গদ্যচ্ছন্দের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যচ্ছন্দ ঐক্য-প্রধান এবং গদ্যচ্ছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি পূর্ণ বিরামের পূর্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময় হ্রস্বতর হয়। যে স্থলে পর পর পর্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য। পর পর পর্বগুলি সমান না হওয়া কিংবা কোন নক্সার অনুসরণে পর্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্বগুলি সাময়িক আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু

বাক্যের শেষে পৌঁছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গদ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্যচ্ছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়।

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং স্তবকগঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ।" [বাংলাছন্দের মূলসূত্র, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ৫ ম সং, ১৯৫৭, পৃ ২১৯-২২৪]

গদ্যচ্ছন্দ, লিপিকার গদ্যের ছন্দ ও গদ্যকবিতার ছন্দ—পর পর তিনটির উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ থেকে এখানে উদ্ধার করছি। লিপিকার গদ্য ও পুনশ্চ শেষসপ্তক প্রমুখ গদ্যকবিতার ছন্দের প্রকৃতি এ থেকে অনুধাবন করা যাবে।

[২৯] আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন ভারতবর্ষ; তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটহতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ওই অবিচলিত-শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না তখন ওই সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে

শঙ্কিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব— যাহা শুদ্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব। ['নববর্ষ', বৈশাখ ১৩০৯/১৯০২, স্বদেশ, ১৯০৮]

তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্টছন্দ, এই সত্য এই গদ্যাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবেগের প্রকৃতি অনুসারে বাক্যের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয়েছে, তৎসম ও যুক্তাক্ষর শব্দের সংঘাতে ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, আবেগের ঝোঁকে এই গদ্যের ছন্দ ওঠা-নামা করেছে ; তরঙ্গায়িত ছন্দই এর প্রাণ।

[৩০] এখানে নাম্‌লো সন্ধ্যা।
সূর্যদেব, | কোন্ দেশে | কোন্ সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলো ?
অন্ধকার (এখানে) | কেঁপে উঠ্‌ছে | রজনীগন্ধা
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা | নব বধূর মতো ;
কোন্‌খানে (ফুট্‌লো) | ভোর বেলাকার | কনক-চাঁপা ?
জাগ্‌লো কে ?
নিবিয়ে দিলো | সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ
ফেলে দিলো | রাত্রে গাঁথা | সেঁউতি ফুলের মালা।

[লিপিকা ১৯২২]

এখানে প্রথম দুটি পংক্তি, পরবর্তী তিন পংক্তি ও শেষ তিন পংক্তি নিয়ে পদ্যচ্ছন্দের আদর্শ অনুযায়ী স্তবক গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে চারটি করে গদ্য-পর্বে (ফ্রেজ বা বাক্যাংশ), তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তিতে তিনটি করে গদ্য-পর্ব, সপ্তম পংক্তিতে দুটি গদ্য-পর্ব, প্রথম ও ষষ্ঠ পংক্তিতে একটি করে গদ্য-পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি গদ্য-পর্বে (ফ্রেজ-এ) কম-বেশী চার অক্ষর (সিলেব্‌ল্) থাকলেও কোনো ধ্বনিগত ধর্ম এখানে ক্রিয়াশীল নয়। এখানে পংক্তিগুলি যেভাবে সাজানো হয়েছে, লেখক তা করেন নি। তিনি গদ্যের সাধারণ পংক্তিসজ্জা অনুসরণ করেছেন। গদ্যকবিতার (প্রোজ-ভর্স) ছাঁচ এখানে অনেকটা অস্পষ্ট। পর্ব সজ্জায় কোনো বিশিষ্ট ছাঁচ অনুসৃত হয়নি।

[৩১]

১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
এক দিন | নিম ফুলের গন্ধ | অন্ধকার ঘরে | অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ | নিয়ে এসেছে
১ ১ ২ ১ ২ ১
মাহষী | বিছানা ছেড়ে | বাতায়নের কাছে এসে | দাঁড়ালো
১ ১ ২ ১
মহিষীর | সমস্ত দেহ | কম্পিত
১ ২ ১
ঝিল্লী-ঝঙ্কৃত | রাত
১ ২ ৩ ১
কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদ | দিগন্তে

[শাপমোচন, পুনশ্চ, ১৯৩২]

পদ্যের সুস্পষ্ট আদর্শে গদ্যপর্ব (ফ্রেজ) সমাবেশ করে এই গদ্যকবিতার চরণ-গুলি রচিত হয়েছে। এই পাঁচটি চরণে একটি স্তবকের আভাস আছে। এখানে পর্বসংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে—পর্বসংখ্যা যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, ২। পর্বসজ্জায় একটি বিশিষ্ট ছাঁচ (প্যাটার্ন বা পরিপাটী) অনুসৃত হয়েছে।

রবীন্দ্র-গদ্যের শেষ পরীক্ষার কালে পাই গদ্যকবিতা (পুনশ্চ ১৯৩২, শেষ সপ্তক ১৯৩৫, পত্রপুট ১৯৩৬, শ্যামলী ১৯৩৬), চলতি রীতির কথাগদ্য (যোগাযোগ ১৯২৯, শেষের কবিতা ১৯২৯, দুইবোন ১৯৩৩, মালঞ্চ ১৯৩৪, চার অধ্যায় ১৯৩৪, সে ১৯৩৭, ছেলেবেলা ১৯৪০, তিনসঙ্গী ১৯৪০) ও প্রবন্ধগদ্য (রাশিয়ার চিঠি ১৯৩১, মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, বিশ্বপরিচয় ১৯৩৭, পথে ও পথের প্রান্তে ১৯৩৮, বাংলাভাষাপরিচয় ১৯৩৮, সাহিত্যের পথে ১৯৩৬, কালান্তর ১৯৩৭), ছড়া ও নৃত্যনাট্যের গদ্য (ছড়ার ছবি ১৯৩৭, খাপছাড়া ১৯৩৭, গল্পসল্প ১৯৪১, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬, চণ্ডালিকা ১৯৩৮, শ্যামা ১৯৩৯)।

গদ্যকবিতার আলোচনা আগেই করেছি। প্রবন্ধগদ্যের আলোচনা নিরর্থক এই কারণে যে, তা কথাগদ্য থেকে প্রকৃতিতে ভিন্নতর নয়। ছড়ার গদ্যে গদ্যপদ্যের মিশেল আছে, বাকি রইল নৃত্যনাট্যের গদ্য। সংগীতের ভাষাকে কতদূর গদ্যের কাছাকাছি আনা যায় তার পরীক্ষা নৃত্যনাট্যের সংলাপে লক্ষণীয়। নৃত্য, গীত, কাব্য ও কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত তিনটি নৃত্যনাট্যে সংলাপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নোতুন পরীক্ষা করেছেন। "সুরের সঙ্গ

না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে।" (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার কবি-কৃত ভূমিকা)। এই সংলাপ আবৃত্তি বা পাঠযোগ্য নয়, একান্তভাবে সুর-নির্ভর। কিন্তু নৃত্যনাট্যের সংলাপ যদি কেবল পাঠ করা হয়, তাহলেও একরকম সৌন্দর্যানুভূতি পাঠকচিত্তে দেখা দেয়। শব্দসমারোহ, উপমাবৈচিত্র্য, বিশেষণসমৃদ্ধি, শব্দসজ্জা ও বাক্যপ্রসাধন : রবীন্দ্র-গদ্যের বৈশিষ্ট্য। নৃত্যনাট্য, বিশেষকরে শেষ দুটি (চণ্ডালিকা ও শ্যামা), এই-সব বৈশিষ্ট্যবর্জিত, তবু তীব্রতা ও উচ্ছ্বাস কমে নি, তা এসেছে নৃত্যনাট্যের নিজস্ব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে। যদিচ সুরনির্ভর, তথাপি নৃত্যনাট্যের প্রকাশরীতি গদ্যমুখী, কথ্যভঙ্গিমুখী, দৈনন্দিন সংলাপমুখী হয়ে উঠেছে। "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে" তাকে বাদ দিলেই গদ্যকাব্যের সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে, কেবল "অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়" (পুনশ্চ কাব্য-পরিচয়)—এ কথা রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনা সূচনায় বলেছিলেন। নৃত্যনাট্যে সুরনির্ভর সংলাপের সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে গদ্যের সীমানায় উপনীত করেছেন। পদ্যের পংক্তিসজ্জা রেখে সংলাপ রচিত হয়েছে, কিন্তু এর চাল গদ্যের, অথচ নৃত্যনাট্যের সুর, নৃত্য ও কবিতার রস পুরাপুরি বজায় আছে, রসবোধ অখণ্ড আছে,—রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য হাতে না পেলে একথা বিশ্বাস করা যেত না। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার নিম্নধৃত অংশবিশেষ সংলাপের কথ্যভঙ্গি ও গদ্যমুখিতার পরিচয় বহন করে।—

[৩১] মায়া॥ কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে—নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।
রাজবাড়ীতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,
তোর আঙিনা হয় নি যে নিকোনো।
তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল।
কখন বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি॥

(নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, প্রথম দৃশ্য)

অপর-একটি সংলাপ ।--

[৩৩] প্রকৃতি ॥ হাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক।
আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা বলে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী ॥

(তদেব, দ্বিতীয় দৃশ্য)

এই পংক্তিসজ্জাকে বাদ দিয়ে গদ্যপংক্তি অনুযায়ী অনায়াসে এই সংলাপকে বিন্যস্ত করা যায়। নৃত্যনাট্যের সংলাপ এইসব দিক থেকে রবীন্দ্রগদ্যপাঠকের মনকে টানে।

॥ আট ॥

পুনরায় রবীন্দ্রগদ্যের মূল ধারায় ফিরে আসি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল—যোগাযোগ (বিচিত্রা পত্রিকায় তিনপুরুষ নামে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে প্রকাশিত) ও শেষের কবিতা

(প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)। চলতি গদ্যের সংহতি ও সুষমা যোগাযোগে আছে, শেষের কবিতায় তা নেই, বরং আছে চমক; ভাষায় হীরকদ্যুতি আর কবিত্বের অপচয়। ঘরেবাইরের আতিশয্যের জায়গায় শেষের কবিতায় এসেছে চাতুরী ও কৃত্রিমতা, বড হয়ে উঠেছে বাক্যবন্ধ ও শব্দসজ্জা নিয়ে বহুবিধ কসরৎ; কিন্তু স্বীকার করতেই হয়—এতে আছে অমিত প্রাণশক্তির উল্লাস।

যোগাযোগ উপন্যাসের গদ্যরীতি সংহত, সুষম, অলংকার-আতিশয্য-বর্জিত।

[৩৪] পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারিদিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পুজোবাড়ি, শস্যখেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেছে, সাজি ভরেছে, নুন-লঙ্কা ধনেপাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেছে; চালতা পেড়েছে, বোশেখ-জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েছে। বাগানের পূবপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে নাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুর ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল-ঘুঘু-দোয়েল-শ্যামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নানাফুল তুলেছে, ঘাটে বসে দেখেছে খেয়াল, আনমনে একা বসে করেছে পশম সেলাই। [যোগাযোগ, পরিচ্ছেদ ৮]

ঘরেবাইরে ও ছেলেবেলা—এ দুটি গ্রন্থের মধ্যবর্তী ভাষারূপ এখানে পাই। হ্রস্ব বাক্য, ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি ও স্থানান্তরণ, দেশীবিদেশী শব্দের উদার ব্যবহার, শব্দ জুড়ে জুড়ে বাংলা পদ্ধতির সমাস-গঠন অনায়াসলক্ষণীয়। এখানে ঘরেবাইরের অলংকারের আতিশয্য নেই, আছে ছেলেবেলার বালভাষিত গদ্যের পূর্বসূচনা। গোরা ও জীবনস্মৃতির যে প্রধান গুণ, সেই স্বচ্ছতা-গুণ এখানে ফিরে এসেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বাক্যবিন্যাস ও শব্দবিন্যাসে এমন একটা অনায়াস-গামিতা আছে যে পাঠক কোথাও বাধা পায় না। একই কর্তৃপদযুক্ত বাক্য-পরম্পরায় কর্তৃপদের অপ্রয়োগ দ্বারা রচনায় এসেছে লালিত্য ও ধাবৎশক্তি। উজ্জ্বল প্রসন্ন স্বচ্ছ এই গদ্যাংশ পাঠককে টেনে নিয়ে চলে।

কিন্তু গদ্যভাষায় নোতুন পরীক্ষার যে মোহ ঘরে-বাইরে উপন্যাসে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, তা যোগাযোগে-ও উপস্থিত। শেষের কবিতায় তা কসরতে পরিণত হয়েছে।

[৩৫] উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে চলল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামা-সুন্দরী মেজের উপর বসে. চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে, তার আলো এসে তাকে ঘিরেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো। অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতিনিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। সে জানত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়—সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেইজন্যই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে—যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা। [যোগা-যোগ, পরিচ্ছেদ ৪৫]

কর্তৃপদের বিলুপ্তি, হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার, ক্রিয়াপদের নানা প্রয়োগ এখানে লক্ষ্য করা যায়। অতীতকালের ক্রিয়াপদে বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ (অবশ্য এর সূচনা হয়েছে গল্পগুচ্ছে) লক্ষণীয়। 'উঠে পড়ল', 'শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর বসে', 'সে জানত', 'প্রত্যাশা আছে'—পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। 'অর্থাৎ' শব্দযোগে বাক্যের সূচনাও পাওয়া গেল। বাক্য-বিন্যাসে ব্যুৎক্রম ঘটিয়ে ভাষার ছন্দে বৈচিত্র্যসাধনের যে সচেতন শিল্পপ্রয়াস শেষের কবিতায় অনায়াসলক্ষণীয়, তার নমুনা এখানে পাই।

যোগাযোগ লিখতে লিখতেই শেষের কবিতা এসে গেল। বাংলা সাহিত্যে সেদিন (১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে) শেষের কবিতা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার গঠনশিল্প ও ভাষাশিল্পের চমৎকারিত্বে ও দীপ্তিতে। লেখকের কলানৈপুণ্য শেষের কবিতায় চরমে উপনীত হয়েছে, অনেক সময়েই মনে হয় লেখক তাঁর বাগ্‌বিভূতি ও কবিত্বের অপচয় করছেন। কিন্তু এই অপচয়ই প্রমাণ করে লেখকের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, জীবনীশক্তির উচ্ছলতা।

শেষের কবিতার আবির্ভাব কালে যে-সব তরুণ লেখক এর দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের একজনের সাক্ষ্যে এর মহার্ঘতা প্রমাণিত হয়।

"সে-সময়ে যেটা আমাদের মনে সবচেয়ে চমক লাগিয়েছিলো সেটা শেষের কবিতার ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে

ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। ....বাংলা গদ্য যে এত সাবলীল হতে পারে, তাকে যে ইচ্ছে মতো বাঁকানো, হেলানো, দোমড়ানো, মোচড়ানো সম্ভব, আলো-ছায়ার এত সূক্ষ্ম স্তর তাতে ধরা পড়ে, খেলা করে ছন্দের এত বৈচিত্র্য, তা আমরা এর আগে ভাবতেও পারিনি। তাই এই বইটি হাতে পেয়ে যদি আমাদের মনের অবস্থা চ্যাপম্যানের হোমর-পাঠান্তে কীটসের মতো হয়ে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আর, যদি গদ্যরচনার কারুশিল্পই আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে দেখতে পাবো শেষের কবিতা বাংলা সাহিত্যে চূড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির মূলে অনেকখানি রয়েছে এই গ্রন্থের প্রভাব; তার ফল যেখানে যেখানে ভালো হয় নি সেখানেও বাঙালি লেখক আজকের দিনে অবহিত হয়েছেন। ঘরে-বাইরেতে যে-পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিলো তার উদ্‌যাপন হলো শেষের কবিতায়; এর পর থেকেই চলতি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠলো সাহিত্যে, আর সাধুভাষা পিছনে হঠতে-হঠতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলো রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। রচনার মধ্যে ক্রিয়া-পদের সংখ্যাহ্রাস, কথ্য ভাষার ভাণ্ডার থেকে নতুন ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য শব্দ সংগ্রহ, বাক্যবিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ভাষার ছন্দে বৈচিত্র্যসাধন— এই সব নিয়ম যা বাদ দিলে আজকের দিনে এক দণ্ড চলে না আমাদের, এগুলো ঘরে-বাইরেতে প্রবর্তিত হলেও প্রতিষ্ঠিত হলো শেষের কবিতায়। বহু দিনের বহু পরীক্ষার পর শেষ ফলটি যেখানে এসে পাওয়া যায়, সেখানেই আমরা বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকি; সেদিক থেকে এই গ্রন্থকে বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা বললে ভুল হয় না।... .

ঘরে-বাইরের সঙ্গে শেষের কবিতার একটা বড়ো তফাৎ এই যে দ্বিতীয় গ্রন্থটি—শুধু কবিত্বে নয়, কৌতুকেও উদ্ভাসিত, মাঝে-মাঝে তা বিদ্যুতের মতো ঝলক দিচ্ছে, আবার কখনো বিস্ফোরকের মতো লুকিয়ে থেকে আকস্মিক ভাবে জ্বলে উঠছে দপ করে। ঠাট্টার অংশ নেহাৎ কম নেই এখানে, আর সেই অংশগুলি পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় ঘরে-বাইরের পর ভাষার দিক থেকে তিনি কতখানি এগিয়েছেন, কেমন করে, সংস্কৃত শালীনতার সঙ্গে মিশিয়েছেন মৌখিক ভাষা, প্রাদেশিক শব্দ, প্রয়োজনমতো নতুন উদ্ভাবন। 'বন্ধুনি' (বাংলা ভাষায় এই প্রথম), 'পাখার বাড়ি' (আঘাত অর্থে 'বাড়ি' এখানে লৌকিক ভাষার স্বাদ এনেছে), 'ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা', 'শাড়িটা

গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে ল্যাপ্টানো'—এই রকমের স্বাধীনতা ঘরেবাইরেতে দেখতে পাই না, লিপিকায় কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না তার, শেষের কবিতায় ঠাট্টার জন্য এর আমদানি হলেও এর সার্থকতা দূরস্পর্শী।" (শ্রীবুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', বৈশাখ ১৩৬২)।

এপিগ্রাম, প্যারাডক্স, অক্সিমোরনের সমারোহ শেষের কবিতার ভাষাকে দিয়েছে বিচিত্র স্বাদ। 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা'; 'বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত'; 'সময় যাদের বিস্তর তাদের পাংচুয়াল্ হওয়া শোভা পায়'; 'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।; 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে'; 'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এ দুই-এ তফাৎ আছে'; 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না', 'তাজমহলকে ভালো লাগবার জন্যই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার' এইসব বিষম (এপিগ্রাম), বিরোধাভাস (প্যারাডক্স, অ্যান্টিথিসিস্) ও বিরোধ (অক্সিমোরন) অলংকারের প্রাচুর্য দেখা যায়।

শব্দনির্মাণ, বাক্যগঠন, পদবিন্যাস ও অলংকার ব্যবহারে শেষের কবিতার যে-সব বৈশিষ্ট্যের এতক্ষণ উল্লেখ করা হল, তারই সমর্থনে নমুনা চয়ন করি।

[১] তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলং পাহাড়ের মতো—সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতের ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের

ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে ; তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষ-চ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো। [শেষের কবিতা, পরিচ্ছেদ ১০]

শেষের কবিতার পরবর্তী ত্রয়ী-উপন্যাসে এই গদ্য ভাষারই অনুসরণ। দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়ের ভাষা শেষের কবিতার মতোই তীব্র তীক্ষ্ণ দীপ্ত ; স্টাইলের অসহ্য দীপ্তি পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চার অধ্যায় (১৯৩৪), ছেলেবেলা (১৯৪০), তিন সঙ্গী (১৯৪০)—শেষের দিকের প্রতিনিধিস্থানীয় এই তিনটি গ্রন্থের ভাষারীতির আলোচনায় দেখা যাবে শেষের কবিতার স্টাইলের কী পরিণতি ঘটেছে। চলতি গদ্যের সকল সম্ভাবনা নিঃশেষ করে এই তিনটি গ্রন্থ দেখা দিয়েছে। লক্ষ্য করি ছেলেবেলায় নোতুন পরীক্ষার ফল যেমন শুভ হয়েছে, বাকি দুটি গ্রন্থে তা হয়নি। মনে হয় ভাষার সহনশক্তি ও ধারণশক্তি এখানে শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে।

চতুরঙ্গ ও ঘরেবাইরে থেকে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে ভাষার প্রসাধন খুব বেশি রকম চোখে পড়ে। বর্ণনায় নাটকীয় চমক সৃষ্টি ও আকস্মিকতার প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়। সংলাপের অ-সাধারণত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে শেষের কবিতায়। ব্যাকরণের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে, ভাষাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়িয়ে, শব্দ উদ্ভাবন করে, সাধু-অসাধু শব্দ মিশিয়ে সাজিয়ে সংলাপ-রচনা এই সময়কার গল্প-উপন্যাসে বারবার দেখা যায়। দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯৩৪), তিন সঙ্গী (১৯৪০)—এই চারখানি গ্রন্থেও ভাষারচনা লেখকের কাছে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম বলে গণ্য হয়েছে, বর্ণনা ও সংলাপে অ-সাধারণত্ব দেখা দিয়েছে।

শেষের কবিতা ও চার অধ্যায়, এ দুটি উপন্যাসের ভাষাবিচারের সময় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হয় দুটিই নিবিড় অর্থে কাব্য, গদ্যে ভালোবাসার উজ্জ্বল রূপায়ণ। ভাষা সেই দাবি মেনে নিয়েই প্রসাধিত দ্যুতিমান উজ্জ্বল রূপে দেখা দিয়েছে, তা কামনার বিচিত্র রূপান্তরে রঙীন হয়ে উঠেছে।

চার অধ্যায়ের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক গল্পের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা

লিরিকের তোড়া রচনা—নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে।' [২৯ চৈত্র ১৩৪১ তারিখে শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্র। শ্রী বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত।]

চার অধ্যায়ের ভাষা উজ্জ্বল শিল্পকর্ম, তা শিল্পের দাবিকেই মেনেছে। ইন্দ্রিয়জ কামনার ভাষাচিত্র রূপেই নিম্নধৃত গদ্যাংশ বিচার্য। এখানে ভাষা আবেগে স্পন্দমান, চিত্রধর্মী, কাব্যধর্মী। লেখকের কবিপ্রকৃতি এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে, গোরা পর্যন্ত তা সংযম-শাসিত ছিল, ঘরে-বাইরে থেকে তা এই শাসনকে অগ্রাহ্য করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শেষের কবিতায় তা অসহ্য দীপ্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, চার অধ্যায়ে গীতধ্বনিত কবিত্বপূর্ণগদ্য-ভাষারূপে দেখা দিয়েছে। চার অধ্যায়ের পাঠযোগ্যতা প্রধানত নির্ভর করে তার বাক্‌শিল্পের 'পরে। নিম্নধৃত অংশে এর পরিচয় পাই।

[৩৭] এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।' মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে বললে, 'মারো একবার মারো।' ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, 'একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।

অতীন কঠিন স্বরে বললে, 'যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।'

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগলো—'অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।'

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, 'শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।'

'ঘুম হবে না।'

'ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।'

'কিছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও।

ক্লোরোফর্ম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্ত। অন্ত।'

দূরের থেকে হুইসলের শব্দ এল। [চার অধ্যায়]

তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থে এই প্রসাধিত দ্যুতিময় গীতধ্বনিত কবিত্বরঞ্জিত ভাষার আর-এক পরিচয় পাই। এ ভাষা নামেই কথাভাষা, আসলে গদ্য-ভাষার এক বিশিষ্ট শিল্পরূপ, এখানে ভাষার জাদু স্বভাবধর্মকে ছাপিয়ে উঠেছে।

[৬৮] সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল মোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্সটবুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে বলে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালুচুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্ ছম্ করে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে। [ল্যাবরেটরি, আশ্বিন ১৩৪৭, তিনসঙ্গী, পৌষ ১৩৪৭, ১৯৪০]

চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-চারঅধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক কথ্যভাষার যে জাদু, যে অ-সাধারণ শিল্পরূপ রবীন্দ্র-লেখনীমুখে রূপ লাভ করেছে, তিন সঙ্গীতে তার চরম ঐশ্বর্যরূপ লক্ষ্য করি। গদ্যের সহনক্ষমতা ও ধারণক্ষমতার চরম পরীক্ষা এখানে হয়েছে। অশীতিস্পৃষ্ট জরাবিজয়ী ভাষাশিল্পীর দুঃসাহসিক

কীর্তিরূপে গণ্য হবে তিনসঙ্গীর ভাষাশিল্প। নমনীয়তা ও কাঠিন্য, ক্ষিপ্রতা ও সাবলীলতা এই ভাষারূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। বাক্যরচনা, পদবিন্যাস, শব্দপ্রয়োগ ও অলংকারব্যবহারে যে-সব কৌশলের কথা এই যুগের রবীন্দ্রগদ্যে লক্ষ্য করেছি, এখানে দেখি তার চরম ঐশ্বর্যরূপ।

ঘরেবাইরে-শেষের কবিতা-দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়-তিন সঙ্গীর গদ্যভাষার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—বর্ণনীয়কে ছাপিয়ে উঠেছে বর্ণনার বাহন (ভাষা)। বস্তুত এই সব গ্রন্থে ব্যবহৃত গদ্যের ঐশ্বর্যরূপ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কথাবস্তুর বা উপন্যাসশিল্পের ন্যূনতার ক্ষতিপূরণ করে। গদ্যভাষায় আতিশয্য, চাতুর্য, কারুশিল্প বড়ো হয়ে উঠে পাঠকমনকে আচ্ছন্ন করে। কবিত্ব—প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব শেষের কবিতা-দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়ের সমস্ত ত্রুটি আবৃত করেছে। অ-সাধারণ সংলাপের দীপ্তি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেয়, মুগ্ধ হই ভাষার জাদুবিদ্যায়। এই পর্বের অনাখ্যান গদ্য-সাহিত্যের গদ্য সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যাত্রী (১৯২৯), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), জাপানে-পারস্যে (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্ব-পরিচয় (১৯৩৭), পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮), বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮),—এই-সব ভ্রমণ, সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এমন কি ছন্দ ও ভাষাবিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা ও সৌরতত্ত্ব-সম্পর্কিত গদ্যগ্রন্থে ভাষার এই জাদু, এই কারুশিল্প, এই গীতধ্বনি আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।

শেষের কবিতা-চার অধ্যায়-তিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—ভাষার সংগতি (ব্যালান্স) রক্ষিত হয় নি। ক্রিয়াপদের স্থানান্তরণ, সংখ্যাহ্রাস, বিলুপ্তি ও প্রাদেশিক রূপের স্বীকৃতি, কর্তৃপদের বিলুপ্তি, বাক্যবিন্যাসের বিপর্যয় ও ব্যুৎক্রম, পদবিন্যাসের বিপর্যয়, শব্দ উদ্‌ভাবন, প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার, সংস্কৃত অভিজাত শব্দের সঙ্গে অশালীন প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ, শব্দ জুড়ে জুড়ে সমাসরচনা, বিদেশী ও দেশী ইডিয়মের ব্যবহার, সর্বোপরি প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব আমাদের বাংলা গদ্য ভাষার সম্ভাবনা ও সীমানাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সংগতিহীনতার অভিযোগ থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের জবাব দিলেন ছেলেবেলা গ্রন্থে। চলতি গদ্যভাষার শিষ্টরূপ ছেলেবেলায় পাই। তার মধ্যে নেই চাতুরী, নেই শিল্প-সর্বস্বতা, নেই কারুশিল্পের প্রাধান্য। সেকেলে কলকাতার বিচিত্র চলচ্ছবি

এই ভাষায় স্পষ্ট অন্তরঙ্গ রূপ লাভ করেছে। লেখক ছেলেবেলা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ওটি রচনা করেছি বালভাষিত গদ্যে।' এই গদ্যের দ্যুতি, সংহতি ও সাবলীলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হই। এখানে লেখক কথ্যভাষাকে স্ল্যাং সমেত সাহিত্যের দরবারে এনেছেন। কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি তার ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, উপমা সমেত এখানে হাজির হয়েছে। নিম্নধৃত অংশে এর পরিচয় পাই।

[৩৯] আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কল্‌কাতায়। শহরে শ্যাকরা-গাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্‌কি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার-আধ-ঘোমটা-ওয়ালা, কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিতে পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্‌কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। [ছেলেবেলা]

ছেলেবেলার ভূমিকায় লেখক বলেছেন এটি ঝর্না। সত্যি তাই, বালভাষিত গদ্যের কলধ্বনি, স্ল্যাং আর শব্দ জুড়ে তৈরি-করা সমাসের কলরোল ঝর্নার মতোই এখানে প্রবাহিত হয়েছে ভরা আনন্দে।

সংসার থেকে বিদায়ের পূর্বলগ্নে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্যরচনা লিখেছিলেন, তা অশীতি-পূর্তি উপলক্ষে অভিভাষণ। অনন্যসাধারণ গদ্যশিল্পীর হাতে কথ্য-ভাষার ঐশ্বর্য শেষবারের মতো দেখা দিল।

[৪০] আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে। ......ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে

ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার অবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। ['সভ্যতার সংকট', মে ১৯৪১]

এখানে দীর্ঘ প্রসারিত বাক্যের পুনরাবির্ভাব ও তৎসম-তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে ক্রিয়াপদের চলতি রূপ প্রয়োগ করে এর সাবলীল গতি বজায় রাখা হয়েছে।

সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা রবীন্দ্র-গদ্যের প্রাণবস্তু। অলংকরণ ও প্রসাধন সে সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। চোদ্দ থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের শিল্পসম্ভাবনার সীমানাকে অনেকদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

২১ | বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত সাহিত্যে দু রকমের গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে, সূত্রধর্মী ও দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী। সূত্রধর্মী গদ্য সংস্কৃত দার্শনিক নিবন্ধ ও শাস্ত্রালোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই রীতির গদ্য স্বল্পাক্ষর, হ্রস্বকায়, ক্রিয়াপদবিরল ও সংক্ষিপ্ত। বাংলায় এর নিদর্শন পাই রূপগোস্বামীর কারিকায় (রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রূপগোস্বামী থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন) অপর পক্ষে দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্যের ব্যবহার হয়েছে বাণভটের কাদম্বরী গ্রন্থে। এই রীতির গদ্য পল্লবিত, সমাসাকীর্ণ, ছেদহীন, তরঙ্গসঙ্কুল, শিথিল গ্রথিত ও এলায়িত। বাংলায় এর নিদর্শন পাই প্রাগ্-বিদ্যাসাগরী পণ্ডিতী গদ্যে। তারাশংকর তর্করত্নের কাদম্বরী অনুবাদ-গদ্যে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে এ-সবের আলোচনা করেছি।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি অসাধু মৌখিক বাংলা ভাষার সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করে দেখেন নি। বাঙালির বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি সমন্বিত ভাষা—তার বাক্যগঠনরীতি, পদবিন্যাস কৌশল, বিশেষণ প্রয়োগ প্রণালী, বিভক্তি প্রত্যয়, শব্দ নির্মাণ, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ও বাগ্‌ধারা (ইডিয়ম)—বিদ্যাসাগরের শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করে নি। তাঁর সমসাময়িক গদ্যলেখক ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভঙ্গির বাংলা গদ্য-রীতির শিল্পসম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখেছেন। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর শিল্পসম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। এর ভিত্তি বাঙালির মুখের ভাষা, এর প্রাণ বাংলা চলতি ইডিয়ম। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ ছেড়ে বাংলা গদ্যভাষাকে সংস্কার করে সাধু বাংলা গদ্য নির্মাণ করলেন,—রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-সবুজপত্র-যুগে এই পথেরই পথিক। সবুজপত্র-পরবর্তী যুগে তিনি যে কথ্যরীতির গদ্য আশ্রয় করলেন তার উদ্ভব এই সাধু ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতির গদ্য আসলে এই সাধু ভাষারীতিরই একটি সংস্কৃত রূপ। সে-কারণে তা কৃত্রিম শিষ্ট মার্জিত; তা হুতোমী ভাষা নয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ-বিবেকানন্দের প্রাকৃত বাংলাভাষা নয়। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ব্যবহৃত পদ্যভাষার উদ্ভব বাংলা চলিত ইডিয়ম। ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই গ্রহণ করেছিলেন, হুতোমী ভাষায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ-বিবেকানন্দের লেখায় তার স্বীকৃতি—। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী এই পথের পথিক নন। সংস্কৃত শব্দসম্ভার ও ইংরেজি বাক্যাদর্শ বিদ্যাসাগরের মূল উপাদান। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দ চয়ন করে সাধুবাংলা গদ্যে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতের দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্যরীতিকে বর্জন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। ইংরেজি বাক্য গঠনরীতির আদর্শে সার্থ-পর্ব ও শ্বাস-পর্ব অনুযায়ী গঠিত বাক্যাংশে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করলেন, দীর্ঘ পল্লবিত সমাসবহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর একাধিক বাক্যে বিভক্ত করে দিলেন আর অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থকে সংহতিবদ্ধ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই পথে এগোলেন। বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার গ্রহণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র আর বঙ্কিমের উত্তরাধিকারী হয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এঁদের হাতে সাধু বাংলা গদ্যরীতি শিল্পরূপ লাভ করল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনায় পূর্ববর্তী অধ্যায়-গুলিতে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

কেবল একটি কথা এখানে পুনঃস্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাগদ্যকে দিয়েছিলেন স্থিতিস্থাপকতা গুণ, নির্মাণ করেছিলেন আদর্শ গদ্য, সফল পরীক্ষা করেছিলেন কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যের বিচিত্র সম্ভাবনা, মুক্ত করেছিলেন সংস্কৃতের সন্ধি-সমাসের জটাজাল থেকে।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতশব্দ-সমৃদ্ধ অলঙ্কৃত বর্ণাঢ্য বঙ্কিমী গদ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করে তার নবতর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। সে পরীক্ষার বিস্তারিত আলোচনা রবীন্দ্র-অধ্যায়ে করেছি। এই পরীক্ষার পরিচয়স্থল বিচিত্র প্রবন্ধ ও প্রাচীন সাহিত্যের গদ্য। এই গদ্য কাব্যধর্মী, সুরওয়ালা, অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ ও স্পন্দনশীল। এই গদ্য কথ্যরীতি ও ভঙ্গি থেকে বহু ব্যবধানে অবস্থিত। কথ্যরীতির গদ্যে সুর নেই, তা আবৃত্তির যোগ্য নয়। কিন্তু বিচিত্র প্রবন্ধ ও প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের গদ্য সুরসমৃদ্ধ ও আবৃত্তিগুণসম্পন্ন। আবৃত্তির জন্য

আবশ্যিক সংস্কৃতের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও ছন্দঃস্পন্দ, তার জন্য চাই দীর্ঘ স্বরধ্বনি ও অনুপ্রাসবিশিষ্ট স্বরধ্বনি। এই দুই গ্রন্থে তার নিপুণ শিল্পসম্মত ব্যবহার হয়েছে। এই কারণে বিচিত্র প্রবন্ধের প্রথমদিকের গদ্য ও প্রাচীন সাহিত্যের গদ্য পাঠকের শ্রুতিকে আচ্ছন্ন করে। 'কেকাধ্বনি' বা 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' গদ্যরচনার স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনিময় সুরসমৃদ্ধ স্পন্দিত গদ্যভাষার মোহ উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। এই কাব্যধর্মী স্পন্দিত সুবেলা গদ্যের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ-অধ্যায়ে উদ্ধার করেছি।

রবীন্দ্র-গদ্যে ও বাংলা গদ্যে এই ভাষা আর অনুসৃত হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বলেন্দ্রনাথের গদ্যভাষা। ঊনবিংশ শতকের শেষ প্রহরে কেবল তিনিই এই দিব্য লাবণ্যময়ী স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষ ভাষার ব্যবহার করেছিলেন।

ঊনতিরিশ বছরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) যে গদ্যকীর্তি রেখে গিয়েছেন, তা নিঃসঙ্গ মর্মরমূর্তি রূপে বাংলাগদ্যক্ষেত্রে বিরাজমান। তাঁর গদ্যগ্রন্থ একটিমাত্র; 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪) কাব্যগ্রন্থ দুটি: 'মাধবিকা' (১৮৯৬) ও 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। কাব্যে যে দিব্য কল্পনা ও দৈবী ভাষা বলেন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, গদ্যরচনায় তা'ই ব্যবহৃত হয়েছে। এই গদ্যভাষা নিত্য প্রয়োজনের ভাষা নয়; সংসারের সকল মালিন্য, অশুচি ও ক্লেদ থেকে মুক্ত এক প্রসাধিত বর্ণবহুল ধ্বনিসমৃদ্ধ দিব্যলাবণ্যময়ী ভাষা। সংস্কৃতভাষা তাঁর ভাষার প্রেরণাস্থল, ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শ তাঁর রচনার প্রেরণাভূমি।

এই কারণে তিনি ভাষার প্রসাধনকলায় বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুত ভাষা-চর্চাকে তিনি যত্নসাধ্য সচেতন কারুকর্ম বলে মনে করতেন। অতন্দ্র শিল্প-চেতনা নিয়ে রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ সাহিত্য সংসারে এসেছিলেন। গদ্য-শিল্পীর সব কয়টি গুণই তার ছিল। রবীন্দ্র-পরিবেশ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সৌন্দর্যজ্ঞান ও সুরুচি, আর নিজ সাধনায় অর্জন করেছিলেন ভাষার উপর দখল ও প্রাচীন ভারত-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। এ দুয়ের সম্মেলনে আমরা পেয়েছি গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথকে। তাঁর সকল গদ্যরচনা বর্ণনামূলক। এই বর্ণনায় লক্ষণীয়—তার প্রাচুর্য, চারুতা, সূক্ষ্মতা ও নাটকীয়তা। রবীন্দ্র-গদ্যে বিশেষণের বহুল প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়, বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় লক্ষ্য করা যায় বিশেষ্যপদের বহুল প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্তাক্ষর-সংঘর্ষজাত ধ্বনির উপর

বিশেষ নির্ভর করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি স্বরধ্বনির অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ বাক্য ও হ্রস্ব বাক্য ব্যবহার করে বলেন্দ্রনাথ গদ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন ও সংহতি রক্ষা করেছেন। আবার একটি দীর্ঘ বাক্য-কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর বাক্যকে স্থাপন করেছেন। কখনো কয়েকটি দীর্ঘ বাক্য সমবায়ে গঠিত একটি অনুচ্ছেদের শেষে একটি হ্রস্ব বাক্য বসিয়েছেন। নিপুণ কারুশিল্পীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি প্রতিটি খুঁটি-নাটির বর্ণনা দিয়েছেন, অতন্দ্র শিল্পজ্ঞান নিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র রচনাটিকে বর্ণোজ্জ্বল শুচিতা ও সংহত শ্রী দান করেছেন।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বিস্তারিত পরিচয় লাভের পূর্বে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় গ্রহণ করি। তাঁর গদ্যে যে সংযম ও কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও শান্ত শ্রী লক্ষ্য করা যায়, বলেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তার প্রতি-ফলন দেখেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিতাম। তাহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে চোখে ও কথাবার্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বালকের মূর্তির ভিতরে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য দেখিতে পাইতাম। তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষর উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতাম। তিনি যেন পর্য-বেক্ষক মাত্র, সংশয়ের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র, উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন মাত্র।......

বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে যে বিশিষ্টতা ছিল সেই বিশিষ্টতার নির্মাণে তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাঙ্গলার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা।......

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ; অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাব-প্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। কবিতা রচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে; বলেন্দ্রের গদ্যরচনাতেও সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে।" [বলেন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকা]

বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র ও ভাষাচর্চা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের এইসব তাৎপর্যবাহী মন্তব্য ও পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের পোষকতা হবে নিম্নধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে।

[১] কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার জয়ঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন। [কণারক]

[২] পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রাম সুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিন

আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে। কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি-রেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতা-দৃশ্যের মত বোধ হয়। [কণারক]

[৩] জীবনস্রোত ভারতবর্ষে তখনও মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। জীবনে সুখও ছিল, সখও ছিল—সুরম্য হর্ম্যমধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে প্রমদাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া প্রিয়জনের সহিত সুখে প্রেমালাপ করিতেন; অনতিউচ্চ মঞ্চোপরি সরক ও পানপাত্র থাকিত, এবং সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণী-রাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ করিত। কল্যাবিদ্যার তখন বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তন্বঙ্গীর চম্পক অঙ্গুলি সৌদামিনীর মত খেলিয়া বেড়াইত এবং প্রিয়জন সেই চঞ্চল অঙ্গুলি চালনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কেবল সেই মধুর বীণাধ্বনি, সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত। [প্রাচীন উড়িষ্যা]

[৪] এমনি দেখিতে দেখিতে ধান কাটার দিন আসিত। সোনার ধানে ক্ষেত ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা দলে দলে ধান কাটিতে বাহির হইয়াছে; কৃষকাঙ্গনারা গান গাহিতে গাহিতে ধানের আঁটি বাঁধিতেছে। গৃহে গৃহে উৎসব। দেবতামন্দিরে পূজার ভারি ধুম। সিংহাসন হইতে রাজা নামিয়া আসিয়াছেন, প্রাসাদ হইতে অমাত্যের দল উপস্থিত, পশ্চাতে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ, মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য। উজ্জ্বল নীলাকাশ-তলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা—ময়ূরকণ্ঠী ধূপছায়া লাল নীল সোনালী গোলাপী বেগুনী নানা বর্ণের তরঙ্গ; মণিমুক্তা জরী জহরৎ ঝক্‌মক্ করিতেছে। পট্টবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, হোমাগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি ও লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইতেছে, স্তূপাকার পুষ্পরাশিতে দেবতা দুর্ণিরীক্ষ্য; বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে, ভিতরে কাঁসরঘণ্টা শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই; আবাল-বৃদ্ধবনিতা রাজা হইতে ভিক্ষুক অবধি নতশিরে দেবতার আশীষ গ্রহণ করিতেছেন। [প্রাচীন উড়িষ্যা]

[৫] প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবনস্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন বিরহ সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে,

কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিরম্ভাকুলিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। [দিল্লীর চিত্রশালিকা]

[৬] আমার সেই গরুর গাড়িটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়িও চলিয়াছে বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই। সে যে সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে, সেই সুনির্মল ক্ষেত্রে তাহার চাকার একটি চিহ্নও পড়ে না, কেবল তাহার পথের পার্শ্বে তারা ফুটিয়া উঠে, চাঁদ হাসিয়া চায়, সূর্য জাগিয়া উঠে; তাহার চারিদিকে জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু, সংসারের যোঝাযুঝি; কিন্তু সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুখের উপরে গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া একাকী নিঃশব্দে মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে। [বনপ্রান্ত]

[৭] সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরেব অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি। [জানালার ধারে]

এই সাতটি দৃষ্টান্ত থেকেই বলেন্দ্র-গদ্যরীতির প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। প্রথম পাঁচটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থের গদ্যরীতির অনুগামী, ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃষ্টান্ত বিচিত্র প্রবন্ধান্তর্গত রুদ্ধগৃহ'-'পথপ্রান্তে'র গদ্যশৈলী-অনুসারী। বর্ণনাত্মক ও ভাবাত্মক গদ্যরচনায় বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পদাংকানুসারী, এ বিষয়ে সংশয় নেই। (ক) বাক্যাংশগুলির স্বসম্পূর্ণতা ও ঘনীভূত সৌন্দর্যের বর্ণন-সৌকুমার্য, (খ) বিশেষণের ভূমিকায় বিশেষ্যর ব্যবহার, (গ) ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দবন্ধের ব্যবহার, (ঘ) সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের বহুল প্রয়োগ, (চ) বর্ণালিম্পনের উৎসব, (ছ) অনুপ্রাসের সমারোহ, (জ) ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনিলালিত্যের 'পরে নির্ভরতা, (ঝ) স্বরধ্বনির নিপুণ ব্যবহার—এইসব দৃষ্টান্তে অনায়াসলক্ষণীয়।

পরম্পরাক্রমে এইসব বৈশিষ্ট্যের নমুনা উদ্ধৃত গদ্যাংশগুলি থেকে চয়ন করি।

(ক) 'শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয়', 'পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী', 'নীল আকাশ প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত', 'কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত', 'এই চিত্রার্পিত জীবনস্রোত'।

(খ) 'অতীতের সমাধি-মন্দির', 'নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত', 'যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে'।

(গ) 'উজ্জ্বল নীলাকাশতলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা', 'মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য', 'সেই মধুর বীণাধ্বনি, সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোক-স্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত'।

(ঘ) 'হিমশিলাখণ্ডোপারি', 'চীনাংশুককেতু', 'ঝিল্লিমুখরিত', 'সিদ্ধগন্ধর্ব-সেবিত', 'কনককিরণে', 'বারুণীরাগসঞ্চারে', 'তন্বঙ্গী', 'নীলাকাশতলে', 'আবালবৃদ্ধবনিতা', 'ঘৃতাহুতি ও লাজাঞ্জলি।'

(চ) 'ময়ূরকণ্ঠী ধূপছায়া লাল নীল সোনালী গোলাপী বেগুনী নানা বর্ণের তরঙ্গ', 'সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণীরাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ করিত'।

(ছ জ) 'ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির', 'ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত জড়িত হস্তে', 'পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে', 'নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন', 'সম্মুখের ঝিল্লি-মুখরিত প্রান্তরদেশ', 'সিদ্ধগন্ধর্বসেবিত', 'কনককিরণে', 'অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা', 'বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তন্বঙ্গীর চম্পক অঙ্গুলি', 'সেই চঞ্চল অঙ্গুলি চালনা', 'চঞ্চল রূপের তরঙ্গ', 'পটবস্ত্র পরিহিত', 'নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে', 'আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিরম্ভাকুলিত নৃত্যাঙ্গী উৎসব-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে'।

(ঝ) 'কণারকে এখন কিছুই নাই', 'চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত', 'এমনি দেখিতে দেখিতে ধান কাটার দিন আসিত', 'আমার সেই গরুর গাড়িটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে', 'আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া একাকী', 'সীমাহীন ছায়াহীন'।

বলেন্দ্র-গদ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ স্রোতস্বতীর তুলনা চলে; তার মতই এই গদ্য ধীর মন্থর গতিতে আপন নির্দিষ্ট পথে চলে; এর গতিপথে কখনো ফেনিল

আবর্ত উপস্থিত হয় না ; উত্তাল তরঙ্গের কোলাহল কখনো এর ধ্যান ভঙ্গ করে নি ; ভাব উপলব্ধির পথে এর শান্তগতি কখনো ব্যাহত হয় নি। বলেন্দ্র-গদ্য প্রবাহে কেবল শান্তি ও কোমলতা, প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতা। আর এই প্রবাহের নিয়ামক অতন্দ্র শিল্পসাধক বলেন্দ্রনাথ। তাঁর হাতে ভাষার এক বীণাযন্ত্র ছিল ; সে বীণাযন্ত্রে কখনো গম্ভীর, কখনো মধুর, কখনো উদাত্ত, কখনো স্তিমিত, কখনো ব্যথাহত, কখনো-বা লাস্য-চঞ্চল ধ্বনি বেজে উঠেছে।

২২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গদ্যশিল্পীদের অন্যতম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। অপর-এক ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ পিতৃব্যের ভাষারীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনায় এটি আমরা লক্ষ্য করেছি। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে থেকেও, রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহে লেখনী ধারণ করেও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন। সাধু ও চলিতের কৃত্রিম বাধা উল্লঙ্ঘনে ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও বিবেকানন্দের শিল্পসচেতন প্রয়াসের কথা মনে রেখেই অবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব বিচার্য।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চা গত শতকের শেষ দশক থেকে এই শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত প্রসারিত। অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী :

১. শকুন্তলা (বাল্যগ্রন্থাবলী ১) ১৮৯৫। ২. ক্ষীরের পুতুল (বাল্যগ্রন্থ-বলী ৩) ১৮৯৬। ৩. রাজকাহিনী (১ম খণ্ড) ১৯০৯। ৪. ভারতশিল্প ১৯০৯। ৫. ভূতপত্রীর দেশ ১৯১৫। ৬. নালক ১৯১৬। ৭. পথে-বিপথে ১৯১৯। ৮ বাংলার ব্রত ১৯১৯। ৯. খাতাঞ্চির খাতা ১৯২১। ১০. প্রিয়দর্শিকা ১৯২১। ১১. চিত্রাক্ষর ১৯২৯। ১২ রাজকাহিনী (২য় খণ্ড) ১৯৩১। ১৩. বুড়ো-আংলা ১৯৪১. ১৪. ঘরোয়া ১৯৪১। ১৫. বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী (১৯২১-২৯) ১৯৪১। ১৬ জোড়াসাঁকোর ধারে ১৯৪৪। ১৭ আপন কথা ১৯৪৬। ১৮. সহজ চিত্রশিক্ষা ১৯৪৬। ১৯. আলোর ফুলকি (১৯১৯) ১৯৪৭। ২০. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ (১৯১৪) ১৯৪৭। ২১. ভারতশিল্পে মূর্তি (১৯১৩) ১৯৪৭। ২২. মাসি ১৯৫৪। ২৩. একে তিন তিনে এক ১৯৫৪। ২৪. শিল্পায়ন ১৯৫৪। ২৫. মারুতির

পুঁথি ১৯৫৬। ২৬. চাঁইবুড়োর পুঁথি ১৯৫৮। ২৭. রং-বেরং ১৯৫৮। ২৮. লম্বকর্ণ পালা ১৯৫৯ [শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু-সংকলিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩]।

শকুন্তলা ও ক্ষীরের পুতুল; রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতা, আলোর ফুলকি ও বুড়ো-আংলা; পথে-বিপথে ও নালক, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবলী, ভারতশিল্পে মূর্তি ও ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ; ঘরোয়া, জোড়া-সাঁকোর ধারে ও আপন কথা; মারুতির পুঁথি ও চাঁই বুড়োর পুথি; রং-বেরং ও একে তিন তিনে এক; লম্বকর্ণ পালা ও আরো অনেক যাত্রা পালা— অবনীন্দ্রনাথের জাদু-ভাষার বিচিত্র উদাহরণ রূপে বর্তমান।

অবনীন্দ্রনাথেব গদ্যরচনার সূত্রপাত হ'ল শকুন্তলা (১৮৯৫) গ্রন্থে। সে কাহিনী তিনি নিজেই বলেছেন:

[১] "একদিন আমায় উনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম বাপ্‌রে লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন্‌কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল', ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, বাঃ। সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে ··· উনি বলেছিলেন 'ভয় কি আমিই তো আছি'। সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।" [জোড়া-সাঁকোর ধারে ১৯৪৪]

চিত্রশিল্পে যিনি ইতিমধ্যেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তিনি রবীন্দ্র-প্রেরণায় গদ্যশিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন ও সঙ্গে সঙ্গেই সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হ'ল। কারণ প্রতিভা, সাহিত্যপ্রীতি, শিল্পজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান তাঁর ছিলই। চিত্রাঙ্কনের গূঢ় রহস্য তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বলেই ভাষারচনার

গূঢ় রহস্যটি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারলেন। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল সহজ শিল্পদৃষ্টি। গতানুগতিক লেখাপড়া বা অ্যাকাডেমিক ছবি-আঁকার পথে তিনি এগোননি। 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইদুটিতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি গীতবাদ্য নাট্যকলার চর্চা করেন। এসরাজ বাজানোয় পাকা হয়ে উঠলেন। ঠাকুরবাড়িতে নানা নাট্যাভিনয়ে যোগ দিয়ে অভিনয়বিদ্যাকে রপ্ত করলেন। তারপর ইচ্ছে হল ছবি আঁকা শিখবেন। স্কেচ, পেন্সিল-ড্রয়িং, প্যাস্টেল, অয়েলপেন্টিং, ল্যাণ্ডস্কেপ, তেল-রঙ্, জল-রঙ—ধাপে ধাপে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কিছুতেই মন ভরে না। ছবি-আঁকার চোখ আর ছবি-আঁকার মন। দুয়ের রমণীয় পরিণয়সাধনেই শিল্পের মুক্তি। সেই লগ্নের জন্য অবনীন্দ্রনাথকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। ছবি আঁকার 'দিব্যদৃষ্টি' পেতে তাঁকে সাহায্য করলেন আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব। শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠার, 'ভাব দেবার' উপায় তাঁর হাতে ছিল, এইবার পেলেন রূপ সৃষ্টির চরম কৌশলটি। ভাব ও রূপের সমন্বয় হল এইবার। সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা শিল্পী নিজেই দিয়েছেন :

[২] "সাহেব বললেন, '…… চল, তোমাকে আর্ট গ্যালারি দেখিয়ে নিয়ে আসি।'…… দু-তিনখানা মোগল ছবি আর দু একখানা পার্শিয়ান ছবি, এইখান চার-পাঁচ ছবি নিয়ে তখন আর্ট গ্যালারি।…… ……একটি বকপাখির ছবি, ছোটই ছবিখানা, মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে। আমাকে বললেন, 'এই নাও এটি দিয়ে দেখ।' বলে বুকপকেট থেকে একটি আতশী কাচ বের করে দিলেন। সেই কাচটি পরে আর আমি হাতছাড়া করি নি। বহুকাল সেটি আমার জামার বুকপকেটে ঘুরেছে। আমি নন্দলালদের বলতুম, এটি আমার দিব্যচক্ষু। সেই কাচ চোখের কাছে ধরে বকের ছবিটি দেখতে লাগলুম। ওমা কি দেখি, এ তো সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখি তার প্রতিটি পালকে কি কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক—কি দেখ—আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই।……তারপর আর দু-চারখানা ছবি যা ছিল দেখলুম, সবই ওই এক ব্যাপার। মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিষও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল।

পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব।······আমি দেখলুম এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।" [জোড়াসাঁকোর ধারে]

ভাব দেবার—শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি অবনীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল, এবার ভাব ও রূপের সমন্বয়ে কালজয়ী ছবি আঁকলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপ হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। তার আগে তিনি এঁকেছিলেন রাধাকৃষ্ণ-চিত্রাবলী (১৮৯৪-৯৬)। দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপের অনুসৃতি এখানে অনায়াসলক্ষণীয়। "ছবিতে ভাব দিতে হবে"—এই সংকল্প নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে-সব ছবি আঁকলেন, তা সর্বাংশে নোতুন। তার সূচনা 'ভারতমাতা' (১৯০২) চিত্রে, পরিণতি 'ওমর-খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। রাধাকৃষ্ণ-চিত্রাবলীর আলংকারিক বাঁধন এইযুগে (১৯০২-১৮) শিথিল হয়েছে, পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব দেখা দিয়েছে। মোগল ও জাপানী ছবি এবং বিলাতী অ্যাকাডেমিক অঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাব আছে এই পরিবর্তনের মূলে, কিন্তু অবনীন্দ্র-চিত্রাবলীর স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের—একান্ত নিজস্ব।

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে অবনীন্দ্র-প্রতিভা সাহিত্য ও ছবি, এই দু ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর চিত্রাবলীতে সাহিত্যানুভূতির ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য, তাঁর গদ্য-রচনার নিয়ামক চিত্রোপলব্ধি।

অবনীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চিত্রশিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিম্নধৃত অভিমতটি যথার্থ—

"সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি—ভালো করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপমার ঝংকারে সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলংকার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে আসে—মনের মধ্যে বাজাতে থাকে শব্দের ঝংকার; আবার মনে পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির

টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো আংলা—ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কি রকম তার উত্তরে বলতে পারি—বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝংকার, ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝংকার আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত, এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছাবে কিনা, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কিনা। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবিরচনা এই দুয়েরই সবচেয়ে বড আকর্ষণ, ভঙ্গী—দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিষটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি—

'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তার ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।' ” [বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

অবনীন্দ্র-গদ্যের সঙ্গে অবনীন্দ্র-চিত্রের সমধর্মিতা এবং অবনীন্দ্র গদ্যের প্রকৃতি অনুধাবনে এই ব্যাখ্যান আমাদের পথপ্রদর্শক। “শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে” রচিত বাক্য হল “উচ্চারিত ছবি”—অবনীন্দ্রনাথের এই সংজ্ঞার্থ অবনীন্দ্র-ভাষাবিচারে আমাদের অবলম্বন।

মুখের ভাষা ও ছবির ভাষায় অদ্বৈতবোধের কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,

[৩] “মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোন রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুসি হচ্ছে না মানুষের মন, সুন্দর

উপায় সকল উত্তম উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য সাধনা চলেছে—'হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়।' ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে —রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল ভাষা আর স্তোত্র চাইলেন। ভাষার পথে গতি পৌঁছয় কোথা থেকে? মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গলার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙ্গালীর মন বাঙ্গলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাঙ্গালা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা জিনিষে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের মধ্য দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাঙ্গলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্ট হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না।" [বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, ১৯২১-২৯]

ছবির ভাষা ও মুখের ভাষার বাহন ভিন্ন—প্রথমটির বর্ণ রেখা, দ্বিতীয়টির অর্থযুক্ত শব্দবন্ধ, কিন্তু দুয়েরই লক্ষ্য এক। এই সত্যটির উপর এখানে অবনীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয় যে-বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা হল চলতি ভাষা। ভাষা হল গতিশীল মনের শব্দবাহন, মনের গতির সঙ্গে ভাষার গতি চলে। সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা পুঁথিতে আবদ্ধ, আর চলতি বাংলাভাষা জীবন্ত মনের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলছে, তাই চলতি বাংলাভাষাই আমাদের আশ্রয়। এই সত্যটিও গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে চিনতে সাহায্য করে।

সুতরাং অবনীন্দ্র-গদ্য চলতি বাংলা গদ্য, তাই মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলে। শব্দের সঙ্গে রূপের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যবন্ধই অন্বিষ্ট, তাকে বলা যেতে পারে 'উচ্চারিত ছবি', আর সেই অর্থেই ছবির সঙ্গে ভাষার সমধর্মিতা অবশ্যস্বীকার্য। অবনীন্দ্র-গদ্য ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি, অবনীন্দ্র-চিত্র বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। দুয়ের অদ্বৈতসাধনেই অবনীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতা।

অবনীন্দ্রনাথ ভাষা বলতে চিত্রভাষা ও ধ্বনিভাষাকে বুঝেছেন। বরং বলা ভালো, অবনীন্দ্র-ভাষায় চিত্রভাষা ও ধ্বনিভাষা সমীকৃত হয়েছে। বরাবরই তাঁর লক্ষ্য ছিল, এ দুয়ের সমীকরণ। ভাষার উৎসসন্ধানে বেরিয়ে অবনীন্দ্র-নাথ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা এখানে স্মরণযোগ্য: "ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।" [শিল্প ও ভাষা, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী]

'চিত্র-ভাষা'র উপর তিনি জোর দিয়েছেন, বলেছেন 'ছবির ভাষা অনেকটা সর্বজনীন' এবং চিত্রভাষা, ধ্বনিভাষা ও ইঙ্গিতভাষার সমীকরণ চেয়েছেন, দেখিয়েছেন ইঙ্গিত ও ধ্বনি থেকেই চিত্রভাষার উৎপত্তি।

এ কারণে অবনীন্দ্র-ভাষা-আলোচনায় নিম্নধৃত অংশটির তাৎপর্য অবশ্য-স্বীকার্য:

[ক] "এ যেন মানুষের সঙ্গে চারি দিকের যারা কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বসলো মানুষ: জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, জল, তুমি কেমন ক'রে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত ক'রে শব্দ ক'রে জানিয়ে দিলে এমন করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও?' হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে' দিলে—এই এমনই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন। গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কেন?" [শিল্প ও ভাষা, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী]

চিত্রভাষার প্রকৃতিবিচারনিরত অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে যে রূপে দেখেছেন, এই আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি।

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য—চিত্রধর্মিতা। হ্যাভেল সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বকের ছবি দেখেছিলেন আতসী কাচের মধ্য দিয়ে —"কাচের ভিতর দিয়ে দেখি তার প্রত্যেকটি পালকে কি কাজ।" অবনীন্দ্র-গদ্যভাষাও ঐ বকের ছবির মতো -ছোট ছোট ছবিতে ভরা, সহজ সরল অথচ ব্যঞ্জনাময় ও চিত্রসমৃদ্ধ।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমন কেবল সৌন্দর্য দেখে না, দেখায়, সারা জীবন সঞ্চয় করে রাখে, উপযুক্ত অবসরে তার থেকে তুলি ও কলম দিয়ে ছবি আঁকে, সে ছবি কখনো রঙে রেখায়, কখনো বা ভাষাচিত্রে ধরা দেয়। জীবনের বিচিত্র ছবি সঞ্চয়, মনের খাতায় অংকন আর পরবর্তী কালে লেখার খাতায় পরিস্ফুটনের কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

[৫] "এই খড়খড়ি দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এ দিকে সকাল বিকেল্ যখন তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেম। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু হচ্ছে সেখানে—চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কতো চরিত্রের, কতো ঢঙের, কতো সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া—কত কি তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজ-কর্ম এখানে সবই এক-একটা চরিত্র নিয়ে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপর এসে পড়তো একটার ঘাড়ে আর একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ, ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্তলীলা।.....

এক-একদিন শাদা প্রজাপতির মতো এক ফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিয়ে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট্ করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়।" [আপন কথা ১৯৪৬]

অবনীন্দ্র-গদ্যরচনায় এই সব নিখুঁত জীবন্ত ছবি ভাষারূপ লাভ করেছে।

তিনি আগে চিত্ররচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, তার পরে ভাষারচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। চিত্রের পথ ধরেই তিনি ভাষারাজ্যে এসেছেন। এই ঘটনার প্রভাব অবনীন্দ্র-গদ্যে অতিপ্রকট। অবনীন্দ্র-গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা—রেখার সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র বাহার, রঙ ও রেখার নিপুণ আলিম্পন এখানে স্পষ্ট। আতসী কাচ দিয়ে তিনি দেখেছিলেন বকের পালকে কত সূক্ষ্ম কারুকার্য, তাঁর গদ্যভাষায় আমরা দেখি কত সূক্ষ্ম কাজ, কত রঙের সমাবেশ।

॥ দুই ॥

হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপ ও আতসীকাচের মধ্য দিয়ে বকপাখির পালকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অনুধাবনের (১৮৯৭ খৃ) পূর্বেই তাঁর দুটি গ্রন্থ—শকুন্তলা (১৮৯৫) ও ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়েছিল, তাই এ দুটির ভাষাচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋজুতা ও সরলতা। এদের ভাষা সহজ সরল সুষ্ঠু। এখানে ছবির যে ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য, তা সহজের ব্যঞ্জনা, সরল সুষ্ঠুতার সৌন্দর্য। শকুন্তলা ও ক্ষীরের পুতুল রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ-চিত্রাবলী (১০৯৪-৯৬) অংকননিরত ছিলেন। দেশী ও বিদেশী আলংকারিক রূপ এই চিত্রাবলীতে অনুসরণ করেছিলেন। শকুন্তলা (১৩০২) ও ক্ষীরের পুতুলে (১৩০২) তার ছাপ রয়ে গেছে। এ দুয়ের ভাষা ছবির ভাষা। মনে হয়, বই দুটি তুলির টানে আঁকা, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট, প্রতিটি টান অব্যর্থ আর সমস্ত ছবিটা জীবন্ত।

[৬] এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির - আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের ছায়ায় কতগুলি কুটিরের ছায়া। ...

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুড়িয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকাব দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল। [শকুন্তলা]

[৭] সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মাণিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকণ, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে সাড়ি বোনেন। একখানি সাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাস-পিসি মায়া করলেন—দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল, মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা,

খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল; ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল, রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে দুপুরে রাত এল। [ক্ষীরের পুতুল]

এ দুটি গদ্যাংশের সহজ সরল চিত্ররূপ গদ্যরীতিতে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই ভাষা রূপকথাধর্মী, চিত্রময়, ছন্দোময়। সরল স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট ব্যঞ্জনা শকুন্তলা-ক্ষীরের পুতুলের ভাষাচিত্রের প্রাণ।

সাময়িকপত্রে অবনীন্দ্রনাথের যে প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়, তা একটি গল্প, 'দেবীপ্রতিমা' (শ্রাবণ, ১৩০৫, ১৮৯৮ খৃ, রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'ভারতী')। শকুন্তলা প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে ও রাজকাহিনী প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি প্রকাশের ছয় বছর আগে 'দেবী প্রতিমা' প্রকাশিত হয়। ভাষারীতিতে এই গল্প একেবারে স্বতন্ত্র গদ্যরচনা, অবনীন্দ্র-গদ্যসরণিতে নিঃসঙ্গ যাত্রী। এর গদ্যরীতি সাধু। ক্রিয়াপদের সাধু রূপ, গম্ভীরঘোষ তৎসম শব্দর দীর্ঘ পল্লবিত বাক্য, জটিল পদবিন্যাস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হয়ত আড়ম্বরপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ভাষারীতি তাঁর প্রকৃতির কতটা অনুকূল তা'ই পরীক্ষা করছিলেন, এবং পরীক্ষান্তে তা চিরকালের মতো বর্জন করেন। তবু এই গদ্যরীতির মধ্যে চিত্র-নির্মাণক্ষমতার পরিচয় অবনীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন।

[৮] দেবীর চরণামৃতে পবিত্র, গুরুর আশীর্বাদে সৌরভিত, ভক্তসহস্রের প্রীতিরসে প্রফুল্ল শুভ্র বিজয়মাল্য শিরে বহন করিয়া আমি নির্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দারগন্ধা সেই অমলামালা সমস্ত দেহে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া—চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায়, বন্ধুর স্নেহের ন্যায় সুখস্পর্শে আমার হৃদয়পথকে পলকে পলকে বিকশিত করিল।······

আমি সেইদিন সায়াহ্নে—ভক্তের ভক্তির ন্যায় নির্মল, নারীর স্নেহের ন্যায় কোমল, সঞ্চিত পুণ্যরাশির ন্যায়, যশস্বীর সুযশের ন্যায় অমল ধবল লঘুভার বিস্তীর্ণ উত্তরীয়যুগলে শোভিত এবং গুরুর প্রসাদচন্দনে চর্চিত পবিত্র মাল্যদামে ভূষিত হইয়া গুরুদেবের পার্শ্বে লোকেশ্বরীর প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরীর মন্দিরের মহাবিস্তীর্ণ স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ; আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটিতারকায় উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণসন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গভীর

অন্ধকারে, পাষাণময়ী লোকেশ্বরী-প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণবিজড়িত রত্নখচিত আরতি প্রদীপের সহস্র শিখা, সহস্রভক্তের একাগ্রচিত্তের ন্যায়, নিষ্কম্প নিশ্চল নিষ্কলুষ জ্বলিতেছিল। [ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫]

রাজর্ষি-বৌঠাকুরাণীর হাট ও গল্পগুচ্ছের (প্রথম খণ্ড) রচয়িতা ভারতী-সম্পাদক ও অবনীন্দ্র-পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের গত শতকের শেষ দু দশকে রচিত গদ্য ভাষার সঙ্গে এই ভাষার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবনীন্দ্র-গদ্যধারায় 'দেবীপ্রতিমা'র ভাষারীতির কোনো ভূমিকা নেই।

॥ তিন ॥

রাজকাহিনীর (প্রথম খণ্ড, ১৯০৯) প্রথম চারটি গল্পে (শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য ; (ভারতী, বৈশাখ—শ্রাবণ ১৩১১) অবনীন্দ্র-ভাষারীতির স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন ভাষাশিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথ স্বপ্রতিষ্ঠ। ভাষারীতি ও শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আপন পথাবিষ্কারের উপযোগী আত্মপ্রত্যয় এখন তিনি অর্জন করেছেন। দুই খণ্ড রাজকাহিনীর সকল গল্পই ঐতিহাসিক গল্প। তার জন্য চাই ওজস্বী ধ্বনিসমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক গদ্যভাষা, চাই দেশাত্মবোধমূলক কাহিনীর উপযোগী গাম্ভীর্য। রাজকাহিনীর গদ্যে তা আছে, আরো আছে—ঋজুতা ও সারল্য। এ সারল্য আড়ম্বরহীন কারুকার্যবিহীন সারল্য ; এ ঋজুতা বর্ণনার প্রত্যক্ষ ঋজুতা। তা সর্বাংশে বর্ণনার (ন্যারেশন) উপযোগী। অথচ এই নিরাভরণ ঋজু দ্রুতগামী গদ্যে ছন্দের উপস্থিতি প্রতি বাক্যেই অনুভব করা যায়।

[৯] তারপর কি জানি কি মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে-ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত

আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি-কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য করা যায় না। সুভাগা দুইহাতে মুখ ঢেকে বললেন—'হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জলে যায়।' সূর্যদেব বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর।' বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। [শিলাদিত্য, ভারতী, বৈশাখ ১৩১১। রাজকাহিনী, ১ম খণ্ড, ১৯০৯]

[১০] বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশেষে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। [পদ্মিনী, ভারতী, আষাঢ় ১৩১১। তদেব]

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে রাজকাহিনীর গদ্যরীতি অনুধাবন করা যায়। কীভাবে নিরাভরণ ঋজু বর্ণনা ও বিবরণের মধ্য দিয়ে চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, তা এখানে লক্ষণীয়। ধ্বনি ও ছন্দ অবলম্বন করে অবনীন্দ্রনাথ এখানে চিত্রময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই গদ্য আবেগে উচ্ছ্বসিত, বেদনায় করুণ, আনন্দে উল্লসিত, ভয়ে কম্পিত হয়েছে। এই ভাষায় ইতিহাসের বস্তুতে সঞ্চারিত হয়েছে রূপকথার মায়া, লাবণ্য ও সৌকুমার্য। জাদুময়ী ভাষার সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ এই অসাধ্য সাধন করেছেন।

॥ চার ॥

এর পরই অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫), 'নালক' (১৯১৬), 'পথে-বিপথে' (১৯১৯) ও 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯২১)। ভূতপত্‌রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতা—দুখানি ফ্যান্টাসি—তার মাঝে বৌদ্ধজাতক

কাহিনী 'নালক' ও ব্যক্তিগত ভ্রমণস্মৃতি 'পথে-বিপথে'। সবকটিতেই স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়েছে, কম বা বেশি।

অবনীন্দ্র-প্রতিভার অসাধারণ কীর্তি ভূতপত্‌রীর দেশ—আর তার ভাষাও অসম্ভব কল্পনার উপযোগী। অবনীন্দ্র-গদ্যের সরলতা আর চিত্রধর্ম আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলমের মুখে আজগবি ছবি-আঁকার ভাষা। ভূতপত্‌রীর দেশ অতিকল্পনার (ফ্যাণ্টাসি) রাজ্য—ইন্দ্রিয়সীমানার বাইরে অতিকল্পনার অভিযান। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে কল্পনা চলেছে ছুটে, কাহিনীর পথ ছেড়ে অসংলগ্নতার রাজ্যে,—চেনাশোনার বাইরে তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই আজগবি কল্পনার (ফ্যাণ্টাসি) কবিত্বময় জগতে অসংলগ্ন ছায়াছবির সমারোহ। এই জগৎ অবনীন্দ্র-শিল্পমানসের প্রকৃত প্রকাশক্ষেত্র। ভূতপত্‌রীর দেশের ভাষা এই অসম্ভব আজগবি অতিকল্পনার জগতের উপযোগী। সারল্য ও চিত্রধর্ম এই ভাষায় আছে। এই ভাষার মূল উপাদান দীর্ঘায়িত বাক্য—ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্য (পেরেন্‌থিসিস)—এই অন্তর্বাক্যের সাহায্যে বিশেষণ-বর্ণনা—আর অসংলগ্ন ছায়াছবির মতো দ্রুতবিলীয়মান ভাষাচিত্রের মিছিল। (দ্র° শ্রীঅজিত দত্তের প্রবন্ধ 'ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩)। নিম্নধৃত উদাহরণে এই ভাষারীতির পরিচয় অনায়াস-লক্ষণীয়—ভূতপত্‌রীর দেশ যেমন চিত্র ও কবিত্বের আলো-আঁধারিতে মেশা, তার ভাষাও তেমন চিত্র ও সংকেতের আলো-আঁধারিতে ব্যঞ্জনাগর্ভ।

[১১] দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।··· ···

গেছি পাল্কিসুদ্ধু গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে গাছের মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,— বন্‌বন্‌ করে লাঠিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়া গুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে। কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের

মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ো সুতো কাটছে আর একটা খরগোস তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ি! যে চাঁদের ভিতরে বসে থাকে, আর ওই তার চরকা, ওই খরগোস! [ভূতপত্‌রীর দেশ ১৯১৫]

এই ভাষার আর-এক রূপ দেখা গেল খাতাঞ্চির খাতায়। ভূতপত্‌রীর দেশ অসম্ভব আজগবি অতিকল্পনার রাজ্য, খাতাঞ্চির খাতাও সম্ভব-অসম্ভবে মেশা চিত্র ও কবিত্বময় অতিকল্পনা-কাহিনী। এর ভাষাও অসাধারণ। অতিকল্পনার (ফ্যাণ্টাসি) সঙ্গে তাল রেখে খাতাঞ্চির খাতার ভাষা চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সহজ সরলতার পথ ছেড়ে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে—দীর্ঘায়িত বাক্যের পথে—মন্তর্বাক্যের অসংলগ্ন ছায়াছবির পথে। এই ভাষায় সরল কবিত্ব নেই, বিবরণাত্মক ঋজুতা নেই, সুন্দর সুষ্ঠুতা নেই, আছে জটিল বিচিত্রতা রঙের বিচ্ছুরণ, ছায়াছবির আলো-আঁধারি ইশারা। অসাধারণ কল্পনার উপযোগী অসাধারণ ভাষা, ছবি যেমন বাঁকাচোরা ভাষাও তেমনি বাঁকাচোরা। অল্প নমুনাতেই তা অনুধাবন করা যায়।

[১২] দিনের বেলায় সহরের এই যে হাজার-হাজার ইটের বাড়ী আর কলের চিম্‌নি দেখছ, রাত নটার তোপ যেমন পড়বে, সব অমনি বাগান আর বাজার আর মাঠ আর পুকুর হয়ে যাবে। থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়-মহাশয়দের বৈঠকখানা আর জোড়াসাঁকো আর এই তেতলা বাড়ী! বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি! আচ্ছা সকালবেলা পূবদিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও—সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে—আবার সেটা কখনো দেখাবে রূপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দিনের বেলায় আকাশে নীল রং, পাখী আর মেঘ, এ ছাড়া কিছু তো দেখ না—রাতের বেলায় আকাশে দেখো, সব তারা ফুটেছে দেখবে! এ যদি হতে পারে, তবে আর রাত হলেই শহরটা বাগান হতে পারবে না কেন? দুপুর-রাতে ভূতের ভয়ে ছাদে উঠতে পারো না, তাই বলো! না হলে দেখতে

পেড়ে, সব বাড়ী-ঘর-দুয়োর কোথায় মিলিয়ে গেছে; কেবল চারিদিকে সব সারি-সারি আলোর নিশেন ঝুলছে—চৌকো, লম্বা, চওড়া সরু, তরো-বেতরো; আর কেবল রাজার বাড়ীর চূড়ো, রায় মহাশয়দের বৈঠকখানার বারাণ্ডা, আর আমাদের চিলের ছাদটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে—আর কিছু নেই [খাতাঞ্চির খাতা ১৯২১]

॥ পাঁচ ॥

আগেই বলেছি ভূতপত্‌রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতা - এ দুই আজগুবি কল্পনায় ভরা বইয়ের মাঝে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল—নালক আর পথে-বিপথে। এ দুটি সহজ সরল গদ্যগ্রন্থ। অবনীন্দ্র-গদ্যের যে সারল্য, ঋজুতা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে বর্তমান তা এখানে ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে পরিণত শিল্পভঙ্গি; ছন্দোমাধুর্য ও চিত্রগুণে তা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, রাজকাহিনীর ভাষা পথে-বিপথে-র আদর্শ। রাজকাহিনীর ভাষা সরল নিরাভরণ ছন্দোময় গতিশীল গদ্যভাষার আদর্শরূপে তুলনাহীন; বিবরণাত্মক গদ্যে সহজ ও স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ ও চিত্রপ্রবাহ রাজকাহিনীর ভাষাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যরীতির উপর রাজকাহিনীর ভাষার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পথে-বিপথের ভাষার ভিত্তি রাজকাহিনীর ভাষা আর পথে-বিপথের ভাষা পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থগুলির (ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা) ভাষার ভিত্তি। ন্যারেশনের ভাষা, বিবরণের ভাষারূপে রাজকাহিনীর ভাষার উপযোগিতা ও অমেয় শিল্পসম্ভাবনা এইসব গ্রন্থে ও পরবর্তী বাঙালি লেখকদের গদ্যরচনায় বারবার সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত হয়েছে।

পথে-বিপথে যত না ভ্রমণকথা, তার চেয়ে বেশি স্মৃতিচিত্র। এই স্মৃতি-চিত্রময় কাহিনীকে অবনীন্দ্রনাথ যে সরল ছন্দোময় চিত্রময় অপরূপ বর্ণনা ভঙ্গিতে উপস্থিত করলেন, তা অন্তরঙ্গ মাধুর্যময় ভাষা। রাজকাহিনীর ইতিহাস আখ্যান বর্ণনার ভাষা এখানে হার্দ্য ঘরোয়া রূপ পেয়েছে। পথে-বিপথে গ্রন্থে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ ও সাধু রূপ দুই-ই ব্যবহৃত হয়েছে; প্রথমটির ব্যবহার হয়েছে নিসর্গচিত্রধর্মী বর্ণনায়, দ্বিতীয়টি ভাস্কর্যধর্মী বর্ণনায়। পরপর দুটি দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। দুটিই অপরূপ ছবি: প্রথমটি রাত্রিশেষে পুব আকাশে প্রথম

আলোর কাঁপন, দ্বিতীয়টি কোণার্ক মন্দির (বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' রচনাটি স্মর্তব্য)।

[১৩] একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথবীণায় সোনার তারের একটু-খানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন। [গিরিশিখরে, পথে-বিপথে ১৯১৯]

[১৪] পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানসশতদল—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ। [সিন্ধুতীরে, তদেব]

প্রথম ছবিটি নিসর্গচিত্র, তাতে শুনি ভাষার কোমল বীণাধ্বনি: দ্বিতীয়টি ভাস্কর্যচিত্র, তাতে শুনি ভাষার গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি। দুয়েতেই চিত্রভাষা ও ধ্বনি ভাষার সমীকরণ। (এখানে একটি কথা স্মর্তব্য: অবনীন্দ্রনাথ সাধুক্রিয়া-পদিক ভাষা মাত্র দুবার 'দেবী প্রতিমা' গল্পে ও কোণার্ক মন্দির-বিবরণে—ব্যবহার করেছেন।)

পথে-বিপথের সহজ সরল ছন্দ-চিত্র-মাধুর্যময় গদ্যরীতির সার্থকতম প্রকাশ অবিন আর অবুর ষ্টিমার-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে; একজন স্বপ্ন ধরার জাল বোনেন, অপর জন অবাক হন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তারই দুই রূপ অবিন আর অবু। এঁদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিবরণে পথে-বিপথে সমৃদ্ধ। তার ভাষাও ঐ স্বপ্নচিত্রের উপযোগী আধার। অবুর কাছে পুরোনো ছবির গল্প করে অবিন। তাঁদের সাবেকী বৈঠকখানায় পাওয়া গেছে ছবিটি—তার নাম মোহিনী। তাকে নিয়েই গল্প। আশ্চর্য সে গল্প, আশ্চর্য তার ভাষা। বস্তু-জগতের মধ্যে অবাস্তবের কল্পলোকের সৌন্দর্যস্বপ্নের আভাস নিয়ে আসে।

[১৫] আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে, অন্ধকারের পর্দার

ওপারে, মোহিনী। যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি।......
নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামাপাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি। [মোহিনী, তদেব]

নালক প্রকাশিত হয় ভূতপত্রীর দেশের পরে ও পথে-বিপথের আগে। এতে পাই সহজ সরল গদ্য, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রধর্মিতা; এতে নেই ভূতপত্রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতার দীর্ঘায়িত বাক্যের জটিলতা ও ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্যের পল্লবিত বিস্তার। নালকের ছবিগুলি স্থির উজ্জ্বল ছবি। অতিকল্পনা-সৃষ্ট নয় বলে ভূতপত্রীর দেশের মতো দ্রুতাবলীয়মান অসংলগ্ন রূপচিত্র নয়। ভাষাও ছবির মতো স্পষ্ট স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ। বাক্যরীতি সরল ঋজু সুষ্ঠু। সামান্য নমুনায় নালকের ভাষারীতির পরিচয় ফুটে ওঠে।—

[১৬] সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেচে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা একটুকুরো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। কেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নোমো কর্, নোমো কর্'। গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁক-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠেছে—নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পথ যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বলছেন নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন। [নালক ১৯:৬]

সমস্ত বিবরণটি পবিত্র ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে চলেছে, ক্রিয়াপদের গৌরবাত্মক রূপটি লক্ষণীয়—'চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো'। সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম 'গোতমচন্দ্রায় নমো' বলছেন—এই ছবিটি পুণ্য প্রভাত-ছবির মতোই পুণ্য স্নিগ্ধ কোমল। অবনীন্দ্র-গদ্যের শিল্পসিদ্ধির পরিচায়ক এই গদ্যাংশ।

॥ ছয় ॥

এর পর তিনি লেখেন 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) ও 'আলোর ফুলকি' (১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ, ভারতী পত্রিকায় ধারাবহিকভাবে প্রকাশিত ও ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)। 'বাংলার ব্রত' সংকলনে গল্প অপেক্ষা মেয়েলি ছড়ারই প্রাধান্য। 'আলোর ফুলকি'তে ছড়ার বাক্য বয়নরীতি অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে বাংলার রূপকথা সংকলন করেছেন, তিনিও ছড়ার বাক্যবয়নরীতি ব্যবহার করেছিলেন। বলা ভালো, অবনীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জন দুজনেই ছড়ার ছন্দের দোলকে গদ্যরূপে রক্ষা করেছেন। এই গদ্যরীতি থেকে অবনীন্দ্রনাথ চলে গেছেন যাত্রাপালার ও 'রং'-বেরং'-এর ছড়া ও কথকতাভঙ্গিম গদ্যে (চাঁইবুড়োর পুঁথি, মারুতির পুঁথি), 'একে তিন তিনে এক'-এর ও যাত্রাপালার কৌতুকনির্ভর কথার খেলায়। এখানেই তিনি গদ্যপদ্যের নিবিরোধ সাধন করেছেন।

আলোর ফুলকিতে মিশেছে শকুন্তলা-ক্ষীরের পুতুলের সরল কবিত্ব, রাজকাহিনীর শব্দচিত্রময় বর্ণনার ঋজুতা, পথে-বিপথে ও নালকের ছন্দ-চিত্রময় বর্ণনাভঙ্গির মাধুর্য। আলোর ফুলকিতে যে আশ্চর্য গদ্যরীতির ব্যবহার, বুড়ো আংলায় তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ভূতপত্‌রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতার উদ্ভট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গির সঙ্গে ছড়ার সরল সৌন্দর্য ও শৈশবমাধুর্য মিশিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আলোর ফুলকির গদ্যরীতি সৃষ্টি করলেন।

আলোর ফুলকির ভিত্তি ছড়ার সরল সৌন্দর্য, কিন্তু তার ভাষা নিরাভরণ নয়, পরন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত, কখনো লিরিক-আবেগ ও লাবণ্যমণ্ডিত, কখনো বা নির্ভার লালিত্য। অসাধারণ চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই গদ্যগ্রন্থ। অবনীন্দ্রনাথ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শব্দচিত্র ও ধ্বনিচিত্রের সমীকরণে দক্ষ, শব্দভাষা ও ধ্বনিভাষার সমীকৃত শিল্পরূপ সৃষ্টিতে সক্ষম। আলোর ফুলকিতে ছড়ার বাক্যবয়নরীতির ব্যবহার হয়েছে, শুধু তাই নয়, এখানে শব্দ অর্থবহ ধ্বনির অনুগত, ধ্বনির নিয়ন্তা নয়। ধ্বনিই এখানে মূল মাধ্যম, শব্দের ভূমিকা ধ্বনির অনুগত হয়েই, তাকে ছাড়িয়ে নয়। দুটি উদাহরণে এই বিশেষত্ব প্রমাণিত হবে।

[১৭] দেখতে দেখতে দূর আর কাছে রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে

এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু আধটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথমে আস্তে বললেন, "সাফাই", সোনালী ভাবলে কুঁকড়ো বুঝি হাঁফিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু "আরো আলো চাই" বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি তাঁর বুকটা ফেটে গেল, "আলোর ফুল আলোর ফুল। ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র"। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটীরের উপর জলন্ত আখার স'দা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুঁকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালের সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তার সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। [আলোর ফুলকি]

[১৮] পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুর তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল।' আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক —দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা।····· বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, অ-তু-উ-ল অমূল আলো।" [তদেব]

এই দুটি গদ্যাংশেই ছড়ার বাক্যবয়নরীতির ব্যবহার, অর্থবহ ধ্বনির অনুগত শব্দের ব্যবহার, ধ্বনির প্রধান ভূমিকা অনায়াসলক্ষণীয়। এই ভাষা এক স্বতন্ত্র শিল্প, রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী কারুর প্রভাবই এর উপরে পড়ে

নি। এক শিল্প-জাদুকরের হাতে তৈরী এই ভাষা। বাংলা সাহিত্যে এই গদ্যরীতি দ্বিতীয়রহিত। এ ভাষা "পাগলামির কারুশিল্প"—রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধাভাস-উক্তিতে অবনীন্দ্র-প্রতিভাসৃষ্ট গদ্যরীতির অনন্যতাই স্বীকৃত। [দ্র' শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'আলোর ফুলকি', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩]

আলোর ফুলকি থেকে আমরা উত্তীর্ণ হই বুড়ো আংলা (১৯৪১) গ্রন্থের ভাষায়। সেখানেও ভাষার নির্ভার লালিত্য ও অপরূপ চিত্রব্যঞ্জনা আছে, সহজ সরল কবিত্ব আছে। বর্ণনাত্মক ব্যবহারিক ভাষারূপে এর উপযোগিতা বুড়ো আংলা-য় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। বুড়ো আংলা-র কাহিনীপ্রধান গদ্যের সমান আবেদন শিশু ও বয়স্কের কাছে, কারণ তা শিশুকল্পনা ও শিশু-মর্মী বয়স্ক কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে।

বুড়ো আংলার হৃদয় ওরফে রিদয় গণেশঠাকুরের ছোট্ট বক হয়ে চলেছে কৈলাস পর্বতের খোঁজে, গণেশঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আবার মানুষ হবে। বাড়ির বাইরে পা দিয়েই গুগলির সঙ্গে দেখা। গুগলি নাকি গঙ্গা-সাগরে স্নান করতে যাচ্ছে। শুনে রিদয় হেসেই খুন! গুগলি বলে কিনা পুকুরের ওপারটাতেই সমুদ্দুর! তবেই হয়েছে! সমুদ্রে যাওয়া গুগলির কর্ম নয়! গুগলি চটে লাল। রিদয় ঐ সরু সরু ঠ্যাং নিয়ে কৈলাস যাবে! রিদয় যেন সে আশা ছেড়ে দেয়!

বুড়ো আংলার গল্পের এই ভূমিকা।—আশ্চর্য তার উপস্থাপনভঙ্গি, আশ্চর্য তার কথ্যরীতি!

[১৯] "হৃদয় বললে—আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই।

গুগলি বললে—আমিও যেহনে যাত্রা করি বাইরেছি এই বেদ্ধোকালে, সেহনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মু নি।

ঠিক সেই সময় খোঁড়া হাঁস পুকুর থেকে ছপ্ ছপ্ করে উঠে এসে টুপ্ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল।"

বুড়ো আংলা এই ধরনের শতশত মজার ঘটনায়, প্রত্যক্ষ ছবিতে ভরা। রিদয় চলেছে কৈলাস পর্বতের উদ্দেশে। তার যাত্রাপথের বর্ণনায় ভাষার বর্ণবিলাস, চিত্রময়তা ও নির্ভার লালিত্য অনায়াসলক্ষণীয়।

[২০] "এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চূড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে

আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের পাহাড়ের চূড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।"

এই ছবিটি এঁকেছেন চিত্রশিল্পী। মনে হয় কলমকে অবনীন্দ্রনাথ তুলি-রূপে ব্যবহার করেছেন। শব্দবন্ধ নির্মাণও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ধ্বনি-সচেতনতা লক্ষণীয়; 'জায়গায়-জায়গায়', 'জিরিয়ে-জিরিয়ে', 'দেখতে-দেখতে' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। বেগুনী কম্বল, গোলাপী ধোঁয়া, কালো আকাশ,—এই বর্ণসচেতনতা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। "গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের পাহাড়ের চূড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল"—ঠিক যেন চলচ্চিত্রের ক্রমশঃ বিলীয়মান ছবি। এই ভাষাচিত্রের স্রষ্টিকারী প্রতিভা হ'ল চিত্রসাধনা ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গম অবনীন্দ্র-প্রতিভা।

॥ সাত ॥

এর পর অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ—ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪), আপন কথা (১৯৪৬) ও মাসি (মৃত্যুর পর প্রকাশিত ১৯৫৪)।

এই সব স্মৃতিকথার ভাষার আদর্শ মূলতঃ রাজকাহিনী-র ভাষা। রাজ-কাহিনীর ভাষা নালক আর পথে বিপথের ভাষার মধ্য দিয়ে ঘরোয়া-জোড়া-সাঁকোর ধারে-আপন কথার ভাষায় প্রবাহিত হয়েছে। আগেই বলেছি ন্যারেশন বা বর্ণনার আদর্শ ভাষা রাজকাহিনীর ভাষা—তা সরল নিরাভরণ ছন্দোময় গদ্যভাষা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রগুণ। নালক আর পথে-বিপথে গ্রন্থে এই ভাষারই সহজ অন্তরঙ্গ ঘরোয়া রূপ—সারল্য আর ঋজুতার সঙ্গে চিত্রমাধুর্য আর কবিত্বের সমন্বয় হয়েছে। পথে-বিপথের ভ্রমণ স্মৃতি-চিত্রণের পথ ধরেই এসেছে বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা ব্যক্তিগত জীবন স্মৃতিকথা—ঘরোয়া-জোড়াসাঁকোর ধারে-আপন কথা। এই ভাষা যেমন অন্তরঙ্গ তেমন মাধুর্যভরা। সদ্য অতীত কালের বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ সঞ্চার করে দিয়েছেন স্বপ্নের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য আর রূপকথার বস্তুভারহীন লাবণ্য।

এই ভাষার নমুনা প্রবন্ধের সূচনায় দিয়েছি—উদাহরণ [১] ও [২], দুটিই

জোড়াসাঁকোর ধারে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। এখানে ঘরোয়া থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি।

[২১] দেখো সব মনে থাকে। সেই ছেলেবেলা কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকসা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর-এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে; কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর, ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও তাই। [ঘরোয়া ১৯৪১]

এই চিত্রময় ধ্বনিময় স্বপ্নময় ভাষা অবনীন্দ্র-গদ্যের ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবনীন্দ্রনাথ কী ভাবে আমাদের জাদু-কলমের গুণে বর্তমান লোক থেকে স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, তার আর-একটি উদাহরণ উদ্ধারের প্রলোভন সংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

[২২] তা সেই সুরধনী গঙ্গাকে দেখেছি আমি। ছেলেবেলায় কোন্নগরের বাগানে বসে দেখতুম—দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা ভরে উঠেছে, কুলু কুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে; সে ধ্বনি সত্যিই শুনতে পেতুম। ঘাটের কাছে বসে আছি, কানে শুনছি তার সুর, কুল্ কুল্ ঝুপ্, কুল্ কুল্ ঝুপ্—আর চোখে দেখছি তার শোভা—সে কী শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে চলেছে জেলে নৌকা, ডিঙি নৌকা। রাত্তিরবেলা সারি সারি নৌকোর নানারকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত।····· সর্ব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি। এই বর্ষাকালে দুকূল ছাপিয়ে জল উঠেছে গঙ্গার,— লাল টকটক্ করেছে জলের রং—তোমরা খোয়াই-ধোয়া জলের কথা বল ঠিক তেমনি, তার উপরে গোলাপী পাল তোলা ইলিশ মাছের নৌকো এদিকে ওদিকে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে, সে কি সুন্দর! তারপর শীতকালে বসে আছি ডেকে গরম চাদর জড়িয়ে, উত্তুরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে কানের পাশ ঘেঁসে বয়ে চলেছে হু হু করে। সামনে ঘন কুয়াশা, তাই ভেদ করে ষ্টীমার চলেছে একটানা। সামনে কিছুই দেখা

যায় না। মনে হত যেন পুরাকালের ভিতর দিয়ে নতুন যুগ চলেছে কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। থেকে থেকে হঠাৎ একটি ছুটি নৌকো সেই ঘন কুয়াশার ভিতর থেকে স্বপ্নের মত বেরিয়ে আসত। [জোড়াসাঁকোর ধারে ১৯৫৪]

আপন কথায় (১৯৪৬) এই ভাষার চিত্ররূপ আমরা পূর্বেই দেখেছি—উদাহরণ [৫]। ঐ উদাহরণটি নিখুঁত জীবন্ত ছবিতে ভরা।

স্মৃতিচিত্র জাতীয় আর-একটি বই অবনীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে লিখেছেন 'মাসি' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত—১৯৫৪)। এখানেও চিত্রময় ধ্বনিময় ভাষার আধিপত্য। এই ভাষায় স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগেছে। অতীতের বস্তুভার ঝরে গিয়ে থাকে শুধু নির্ভার লাবণ্য, এ হ'ল শিল্পীর নিজস্ব একটা অতীত, তবু তা সর্বজনীন। পাঠকের কাছে তা এক বিশাল মন-কেমন-করা অতীত রূপে ধরা দেয়। টুকরো টুকরো ছবি. রাশি রাশি অকিঞ্চিৎকর খুটিনাটি, মিনে-করা কারুকার্য— এই ভাষার উপাদান। এইসবের সমন্বয়ে অতীত হয়ে ওঠে জীবন্ত। সামান্য নমুনায় এর প্রমাণ পাই। বেদনা সৃষ্টির কৌশলটি লক্ষণীয়।—

[৮৩] এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি, মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তার পরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময় ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে, ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে—ঝালে গাঁথা, চাঁদ-ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয় তো মাসিও আছে। এক ছুটে দোতালায় উঠে গেলাম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে। [মাসি ১৯৫৪]

কথ্যরীতি, প্রত্যক্ষ উক্তি, ঘরোয়া ভঙ্গি, টুকরো টুকরো ছবি,—সবটা মিলিয়ে তৈরী হয়েছে এই চিত্রময় ধ্বনিময় সহজ ভাষা। তৎসম শব্দ বর্জন করে তদ্ভব, দেশী ও আঞ্চলিক শব্দের উপর নির্ভর করে লেখক ছবি এঁকেছেন আর সমাপিকা ক্রিয়াপদ স্থানান্তরিত করে বাক্যে এনেছেন গতিবেগ।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে (১৯২১-২৯) রাজকাহিনীর ভাবাদর্শের অনুসরণ—বর্ণনাত্মক ঋজু সরল কাহিনী-ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগ। এক হিসেবে ঘরোয়া-জোড়াসাঁকোর ধারের ভাষার অন্তরঙ্গ ঘরোয়া সরল চিত্রময় ভাষার প্রতিরূপ।

যে ভাষা স্মৃতিচিত্রাঙ্কনে নিরত, সে ভাষাই এখানে শিল্পতত্ত্ব ব্যাখানে নিযুক্ত হয়েছে। অবনীন্দ্র-গদ্যকে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্য—এভাবে বিভক্ত করা যায় না। তাই স্মৃতিকথার গদ্যভাষা থেকে আমরা অনায়াসে বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধে উত্তীর্ণ হতে পারি। প্রবন্ধের সূচনাংশে উদ্ধৃত দুটি উদাহরণ—[৩] ও [৪] বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী থেকে গৃহীত। তা এই সত্যের পোষকতা করে। সেই একই অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কথ্যরীতি—চিত্রময় ধ্বনিময় মাধুর্যময় ভাষা।

॥ আট ॥

অবনীন্দ্র-গদ্যের শেষ অধ্যায় কথকতাভঙ্গিম গদ্য। এখানেই অবনীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। 'একে তিন তিনে এক' (১৯১৪), 'মারুতির পুঁথি' (১৯৫৬), 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' (১৯৫৮), 'রং বেরং' (১৯৫৮) এবং 'লম্বকর্ণ পালা' (১৯৪৯)-প্রমুখ যাত্রাপালা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্পসামর্থ্যের চরম পরিচয় এই গদ্যরীতি।

এই রীতির সূচনা হয়েছে 'ভূতপত্রীর দেশ' (১৯১৫) 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯), ও 'আলোর ফুলকি' (রচনা ১৯১৯ প্রকাশ ১৯৪৭)—এই তিনটি গ্রন্থে। 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে মেয়েলি ছড়া ও ব্রতকথার সাহিত্যরূপ, 'আলোর ফুলকি'তে ঐ ছড়ার বাক্যবয়নরীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ আর 'ভূতপত্রীর দেশে' ভাষার উদ্ভট বাঁকাচোরা গতি। ভূতপত্রীর দেশ, খাতাঞ্চির খাতা, আলোর ফুলকি ফ্যান্টাসি। কথকপ্রবর চাঁইবুড়োর গল্পজগৎ ফ্যান্টাসির (অতি-কল্পনার) জগৎ। এই জগতে কবিত্ব ও ছবিতে মেশামেশি, অসংলগ্ন ছায়া-ছবির মিছিল, বাস্তব ও আজগুবি কল্পনার গলাগলি। চিত্রব্যঞ্জনাময়, অদ্ভুত কবিত্বভরা, উদ্ভট কল্পনাচিত্রসমৃদ্ধ যাত্রাপালাগুলি অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয়স্থল, এখানে তিনি একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কতোকালের সঞ্চয় চোখে-দেখা অসংখ্য ছবিকে শিশুসুলভ মাধুর্যমিশিয়ে কলমের মুখে ফুটিয়ে তোলার

বিরল নৈপুণ্য এবং অতিকল্পনার রাজ্যে অনায়াসবিচরণের শিল্পসামর্থ্য অবনীন্দ্রনাথের ছিল। যাত্রাপালাগুলি সেই নৈপুণ্য, সেই শিল্পসামর্থ্য, সেই জাদু-ভাষার পরিচয়ক্ষেত্র।

যাত্রাপালার ভাষাবিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে অবনীন্দ্রনাথের দুটি বক্তব্য স্মর্তব্য।

"সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলেম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আবার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কি কাজে তার ঠিক নেই।·····আমার সঞ্চয়ী মন। সঞ্চয়ী মনের কাজই এই—সঞ্চয় করে চলা, ভালোমন্দ টুকিটাকি কত কি। [জোড়াসাঁকোর ধারে]

"আমি তো বলি যে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে—একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী, তারা সব জিনিস তৈরি করে। তারা হচ্ছে সার্ভার, মানে ক্রাফটস্‌ম্যান—তারা একতলা থেকে সবকিছু করে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে থাকে ঝাড়-লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদি, চারদিকে সব-কিছু ভালো ভালো জিনিষ, যা তৈরী হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলার বৈঠকখানায় সে-সব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি—শিল্প-দেবতার সেই হল খাস দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছে-মতো শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে। [ঘরোয়া]

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালার পটভূমিরূপে এই দুই মন্তব্য স্মরণযোগ্য। সঞ্চয়ী মন কতোকাল ধরে ছবি জমিয়েছে, আজ শৈশবকালের সেই সব ছবি কোমল মধুর চিত্রব্যঞ্জনাময় রূপ নিয়ে কলমের মুখে ফুটে উঠেছে। যাত্রাপালা-গুলি শিল্পীর অন্দরমহলের সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ আত্মবিভোর হয়ে সেইসব ছবিকে নোতুন করে সৃষ্টি করেছেন, মা হয়ে ইচ্ছে মতো শিশু-শিল্পকে আদর করে সাজাচ্ছেন। এখানে তিনি শিল্পব্যাকরণ অস্বীকার করেছেন, উদ্ভট অতিকল্পনার রাজ্যে স্বেচ্ছাবিহার করেছেন।

শৈশবে ও কৈশোরে ঠাকুরবাড়িতে ও বাইরের জগতে অবনীন্দ্রনাথ

সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন—সেই সব দাসী ভৃত্য, দারোয়ান কোচোয়ান, লাঠিয়াল বরকন্দাজ, খানসামা বাবুর্চি, খালাসী মাল্লা, খাতাঞ্চি নায়েব, বহুরূপী কথকঠাকুর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অবনীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল, এতে সংশয় নেই। একথা ঠিক, ঠাকুরবাড়ির উচ্চ কোটির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মার্জিত বাচনভঙ্গি থেকে যাত্রাপালার সৃষ্টি সম্ভব নয়। লোকজীবন থেকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রেরণা পেয়েছিলেন। আলোর ফুলকিতে দেখেছি ছড়ার বাক্যবয়নরীতি, যাত্রাপালায় দেখি কথকতা-শৈলী। এই কথনকারু অবনীন্দ্রনাথ বহুযত্নে আয়ত্ত করে তাকে চারুশিল্পে—সাহিত্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্রাম্য পরস্তাব, মেয়েলি গল্প, কিস্‌সা, দস্তান শুনে শুনে অবনীন্দ্রনাথ কথকতার গুণ ও কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির যে আলোচনা এতক্ষণ করেছি তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে—বর্ণনা বা ন্যারেশনের উপযুক্ত ভাষাবাহন তাঁর করায়ত্ত। আমরা জানি বাংলার লোকশিল্প কথকতার যে কথনকারু তা হল খাঁটি ন্যারেশন, কাহিনী-কথনের বিশিষ্ট রীতি। রাজকাহিনী-নালক-পথে-বিপথে- বুড়ো আংলার লেখক অনায়াসেই এই কথনকারুকে আয়ত্ত করেছেন। ভূতপতরীর দেশ-খাতাঞ্চির খাতা-আলোর ফুলকিতে অতিকল্পনার প্রাধান্য ও ক্ষণে ক্ষণে ছবি তৈরী-প্রবণতা এইসব যাত্রাপালায় কাজে লেগে গেল, কথনকারুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা সৃষ্টি করল অবনীন্দ্রনাথের "অন্তরমহলের শিশু-শিল্পের" বিচিত্র রঙীন-সব ছবি।

অবনীন্দ্রনাথের ছিল স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতা ও অভিনয়-প্রবণতা; তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী—বক পাখির পালকের খুঁটিনাটি দেখবার ও দেখাবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন; ছবিতে ভাব দেবার সামর্থ্যও তাঁর ছিল। রং রেখার জগৎকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। শব্দ ও ধ্বনির জগৎকেও নিয়েছিলেন আপন করে। সেই সঙ্গে ছিল অদ্ভুত কবিত্ব ও অলৌকিক কল্পনাশক্তি। এই সঙ্গে যুক্ত হ'ল কথনকারু। কথকঠাকুরদের পাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন তা কেবল পাঠ নয়, তাতে আছে ছড়া-আবৃত্তি, কথোপকথন, লাচাড়ি বা পয়ারছন্দের গান। সেইসঙ্গে যুক্ত হত আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়—অঙ্গভঙ্গি, করমুদ্রা, ঘূর্ণিত নয়ন ও মুখমণ্ডল পেশীর চালনা, কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি ও স্বরক্ষেপ। তার ফলে কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠত। অবনীন্দ্রনাথের কথকতাভঙ্গিম যাত্রাপালায় কথকতার এই সব গুণ

আছে, তার ফলে এখানেও কথক ও পাঠকের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অন্তরঙ্গতা —যা সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। সাহিত্যক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কথক। [দ্র° শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধ 'কথক অবনীন্দ্রনাথ' বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩]

কথকতার সাবলীল কথকশৈলী, আমরা জানি, ধরা-বাঁধা পথে চলে না। চলতে চলতে তা সৃষ্টি করে নানা ভাষাচিত্র। বল্গাহীন কল্পনার আবেগে আঙ্গিক বাচিক অভিনয়যোগে সৃষ্ট হয় কাহিনী। প্রাকৃতভাষা উপভাষার শব্দচ্ছটায়, উপমা ও বিশেষণের ঘটায় নাটুকে ভঙ্গিতে গড়ে ওঠে এক কল্প-জগৎ, শ্রোতারা তখন শোনে শোনার আনন্দে আর কথক ঠাকুর বলেন বলার আনন্দে। গদ্য পদ্যের সীমানা বারবার কথক লঙ্ঘন করে যান, গান ছড়া-আবৃত্তি ও গদ্য-ব্যাখ্যান একাকার হয়ে যায়। 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' ও 'মারুতির পুঁথি'তে বারবার তা হয়েছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৌতুকপ্রিয়তা, তার ফলে ভাষা হয়েছে তরল উজ্জ্বল স্বচ্ছ বেগবান।

কথকপ্রবর চাঁইবুড়ো বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত স্মরণীয় চরিত্র। পাকা অভিনেতা, যেমন তাঁর কথনকারু, তেমন তাঁর লোকচরিত্রজ্ঞান। এইবার আসরে প্রভুর আগমন, উপবেশন, কথকতা-সূচনা, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় লক্ষ্য করি।

[১৪] চাঁইবুড়ো পাকা কথক; আগের দিনের আসর দেখেই বুঝেছিলেন 'মহিষ বধ' 'বালি বধ' হবে না। শুনে ভক্তগণ কিছু পাতলা হয়েছেন, তাই হনুমানকে পিতৃলোকের পঙ্ককুণ্ডে ফেলে, শেষ কি হল শ্রোতাদের বুঝতে না দিয়েই—"হনুমান কি কল্ল, শুনিবা কল্য"—বলে পাঠ বন্ধ করেছিলেন। লোকে ভাবছে কতক্ষণে কল্য আসে; ঘড়ি যেন পা টিপে চলে, কল্য আর আসে না; যদি বা এলো তো লোক এসে ফিরে গেল। "শনি মঙ্গল পুঁথির শয়ন, অতএব মঙ্গল উর্দ্ধে বুধে পা'র ধুলো দেবেন অনুগ্রহ করে ভক্তগণ ঐ দিন—সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুঁথি-জাগরণ। ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, চৈত্র শুদ্ধি ৮।৭।১৯ গতে গো সহস্রী যোগে শ্রবণ। ফল—স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ।"

বুধবারে আসরে লোক আর ধরে না। চাঁইবুড়ো মৃদুমন্দ হাস্য করে অতি নম্রস্বরে পাঠ আরম্ভ করলেন। [মারুতির পুঁথি]

পুঁথিপাঠের নানা নিয়ম আছে। চাঁইবুড়ো আসন গ্রহণের পূর্বে বলেন,

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে', আসরত্যাগের সময় বলেন, 'মধুসূদন মধুসূদন'। পুঁথিপাঠের পূর্বে গণ্ডুষ করেন, তারপর মন্ত্রপাঠ করেন—

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং। [মারুতির পুঁথি]

কেবল গণ্ডুষ, মন্ত্রপাঠ, আচমন ও শান্তিজল প্রক্ষেপণ নয়, আরো আছে, মাঝে মাঝে চাঁইবুড়ো অভিনয়ও করেন।

[২৫] ভাব লেগে চাঁইবুড়ো যেন মূর্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন—'ঐ তিনি এসে গেছেন—

মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে-স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে ॥'

সবাই আকাশের পানে চায়—মাথার 'পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—হেলে না দোলে না। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন—'যদি বা তিনি এসে থাকেন তো সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাশ্য হতে পারেন না। অতএব বিলেম্বনালম্—" [মারুতির পুঁথি]

যাত্রা-পাঁচালির সঙ্গে সঙ্গে কথকতার যথেচ্ছ বিস্তার মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ মারুতির পুঁথি ও চাঁইবুড়োর পুঁথি রচনা করেছেন। যাত্রাপালার টেকনিকে আছে নাটকীয়তা, কিন্তু যথেচ্ছ বিস্তারের সুযোগ তাতে নেই। সেকারণে কথকতার বিস্তার -কাহিনীর বহমানতা, যথেচ্ছ ঘটনা উদ্ভাবনা, ইচ্ছে-মতো-পয়ার ছন্দকে দীর্ঘ হ্রস্ব করে শেষকালে কোনোক্রমে মিল জোগানো, কখনো ক্রতুলয়ের ছড়া আবৃত্তি, কখনো বা গল্পব্যাখ্যান—যার তলায় তলায় ফল্গুর মতো ছড়ার স্রোত বইছে। ঘটনা পরম্পরার বাধ্যবাধকতা নেই, গাম্ভীর্যে, চাপল্যে হাসি-কান্নায় অম্ল-মধুরে এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। যেমন, রাগের সময়ে রাবণের প্রথমে হিন্দি, পরে ইংরেজী ব্যবহার—'রাবণকে তখন ইন্‌জিরীতে পাওয়ার যোগাড় হচ্ছে দেখে সকলের পলায়ন'; আবার মধু দৈত্যের কীর্তি—রাবণ-ভগ্নী কুম্ভনসীকে হরণ করে তারপর ধরা পড়ে নিজেকে একটা ছারপোকা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস—'মধু আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁট মেলে ছার খিলাও, ছার খিলাও বলে রাবণের দিকে এগোতে লাগল, রাবণও দুত্তোর বলে দুদ্দাড় প্রস্থান।' [চাঁইবুড়োর পুঁথি]

'রং-বেরং' ও 'একে তিন তিনে এক' সংকলনদুটিতে পাঁচমিশেলি রচনার সমাবেশ: ভাঙা যাত্রাগান, টুকরো পাঁচালি, নাটক (চর্ভটি) ও গল্প (সিকস্তিপয়স্তি কথা) আর অতিকাল্পনিক কাহিনী। শব্দ প্রয়োগ ও কথার খেলা অবনীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ে সব গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ননসেন্স-রাইম্, অর্থবাহী ছড়া, পোর্টম্যান্টো শব্দরাজি, আজগুবি ছড়া, উর্দু-হিন্দী ইংরেজী-ফার্সী শব্দযোগে বিচিত্র ধ্বনিচিত্র—সবই আছে। অল্প-কিছু নমুনায় এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

গর্দবাদের ওর্দানশীল কোর্মা ক্ষেতের খোসবু
জিলদে ধরা বুলবুলির গান খুঞ্চে ঢাকা বস্তু। (রং-বেরং)

দেখহে খালাসিগণ কইরা খুব নিরীক্ষণ
বিপদে পইরাছে জানি হবে কোন্ মোহাজন!
কিবা কোন্ ছওদাগর যেতেছিল ছপর
তুফানে পইরা ডিঙ্গা হৈল তর এইক্ষণ। (রং-বেরং)

শির বিরিঞ্জি ফালুদা আর গোলাপী সরবৎ,
কালিয়া কোর্মা কোফ্‌তা কাবাব দল্লকৎ।
আখরোটি মনাক্কা কিসমিস বাদাম,
খোরমা ও খেজুর কত ভাল ভাল আম।
শিরা ও মালাই ফিরণী চৌরসের দুধ,
চিনি মিছরি নিয়মিত খাইনু বহুৎ। (একে তিন তিনে এক)

এই পর্যায়ের রচনায় অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন করেছেন। তাঁর একই রচনায় একই প্রবাহে গদ্য-পদ্য মিশে যায়। পর পর বাক্যবন্ধে গদ্য পদ্যর সহাবস্থান অনায়াসলক্ষণীয়। গদ্য থেকে পদ্যে, পদ্য থেকে গদ্যে চলে যাবার বিস্ময়কর অনায়াস সামর্থ্য অবনীন্দ্রনাথের ছিল। তার উৎস অবনীন্দ্র-প্রতিভা—যার বাক্‌বিভূতি অসামান্য, বাক্-ভাণ্ডার অফুরান, কল্পনা- ও অতিকল্পনাশক্তি তুলনাহীন। এই শক্তি যুগপৎ গদ্য- ও কাব্য-ধর্মী। বহুচারী প্রতিভা একই সঙ্গে ঘরোয়া ও আকাশচারী, বাস্তবনির্ভর ও কল্পনা-বিহারী, আবেগস্পন্দিত ও কৌতুকপ্রিয়। পুনরায় স্মরণ করি অবনীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরোধাভাস-উক্তিটি—'পাগ্‌লামির কারুশিল্প'। অবনীন্দ্রনাথের বাক্‌রীতি একান্ত ভাবে নিজস্ব, স্বমহিমায় দীপ্যমান।

কেবল যাত্রাপালাতেই অবনীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধন করেছেন, একথা মনে করা ভুল। পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যচর্চার সূচনা থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রূপকথা, উপকথা, খোশ গল্প, ছড়া, কথকতা, যাত্রাপালা—সর্বত্রই অবনীন্দ্রনাথ এই পরীক্ষা করেছেন। তাঁর সকল গদ্য-রচনায় ছন্দোস্রোত ফল্গুর মতো প্রবাহিত। তাঁর রচনার কালানুক্রমিক নিদর্শন থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ক) তারপর কি হল? |

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, | মাধবীর পাতায় ফুল ফুটল, | নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, | সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল। |

আর কি হল? |

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল। |

আর কি হল? |

পৃথিবীর রাজা | আর বনের শকুন্তলা | —দুজনে মালা বদল হল। | দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। |

[শকুন্তলা]

(খ) ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য | — সেখানে কেবল | ছেলে-ঘরে ছেলে, | বাইরে ছেলে, | জলে স্থলে, | পথে ঘাটে, | গাছের ডালে, | সবুজ ঘাসে, | যেদিকে দেখে | সেই দিকেই | ছেলের পাল, | মেয়ের দল। |

[ক্ষীরের পুতুল]

(গ) মনে হল, | আকাশ ঘুরছে, | তারা ঘুরছে, | পৃথিবী ঘুরছে, | পেটের ভিতর | আমার মাসীর | মোয়াগুলোও | যেন ঘুরতে | লেগেছে। |

[ভূতপত্‌রীর দেশ]

(ঘ) মায়ের কোলে | ছেলে শুনছে | 'নমো নমো | গোতমচন্দ্রিমায়; | ঘরের দাওয়ায় | দাঁড়িয়ে মা | শুনছেন 'নমো নমো'; | বুড়ি দিদিমা | ঘরের ভিতর থেকে | শুনছেন 'নমো'; | অম্‌নি তিনি | সবাইকে ডেকে | বলছেন—'ওরে | নোমো কর্‌ | নোমো কর্‌।' |

[নালক]

(ঙ) বর্ষাকালের | কাজলমাখা | পিছল রাত। | নিখুঁত রাত। | কালোর

পরে | একটি খুঁত | তারার টিপ। | ভয়ংকরী নিশীথিনী, | বিরূপা ঘোর, | ছায়ার মায়া, | থাকুন, তিনি রাখুন। | নিশাচর নিশাচরী, | রক্তপাত করি, | আচম্বিতে | নিঝুম রাতে, | দুপুর রাতে, | নষ্টচন্দ্র, | ভ্রষ্টতারা, | ভিতর-বার | অন্ধকার-রাত | সারা রাত। | নিঝুম দুপুর, | নিখুঁৎ দুপুর, | অক্ষুর রাত। |

[আলোর ফুলকি]

(চ) কানা কুকুরটা | ঘেউ ঘেউ করে | থামলে | হাঁসেরা | হাসতে হাসতে | বললে | —আরে মুখ্যু, | আমরা কি তোর | রাজার কথা, | না রাজবাড়ির কথা, | না মাটির কেল্লার কথা | শুনেছি ? |

[বুড়ো আংলা]

(ছ) ধরা ছিল মনে। | কালে কালে | সে সঞ্চয় কাজে এল ; | আবার লেখার কাজে, | ছবি আঁকার কাজে, | গল্প বলার কাজে, | এমনি কত কি কাজে | তার ঠিক নেই। |

[জোড়াসাঁকোর ধারে]

(জ) মাসি, মাসি বলে | ডেকে ডেকে | গলা চিরে গেল। | একবার মনে হল | যেন অন্দরবাড়িটার দিকটায় | কে যেন ডাকল | মাসি গো মাসি। | তারপরেই | যে চুপ | সেই চুপ, | নিঃসাড়া পুরী। | ছুটলুম অন্দরের দিকে, | বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। |

[মাসি]

(ঝ) দ্রম্ দদ্দড়্ | ধ্রম ধদ্ধড়্ |
কিপ্‌পোলো | কিপ্‌পোলো।
যমজয়ন্তীর তোপ্‌পোলো। |
যমদণ্ড ভঙ্গ হলো |
দশখণ্ড হলো |
কালদণ্ড ফাল হলো, | ফাল্লালো ॥ ||

[চাঁইবুড়োর পুঁথি]

(ঞ) এস করি হিড়িকিড়ি |
হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি | —করি ফাঁক ! ||
সেই পথে প্রাণপাখি | বারায়ে যাক | —তিড়িবিড়ি |
ঝট্ হোক্ কাজ সাফ ||
ঢুকে যাক্ লাফালাফ | —আড়ি ভাব, | দন্ত কিড়িমিড়ি |

আমরা এখানে পড়ে থাকি।
দেশে উড়ে যাক প্রাণপাখি। — যেখানে তার ইস্তিরী।
বসে চিবোচ্ছে কাঁচা পাকা তিন্তিড়ী ॥ ||

[মারুতির পুঁথি]

(ট) কৌতুকে তাদের। আপত্তি নেই, | যৌতুকেই আপত্তি। |

[তদেব]

(ঠ) দুবার 'ওয়াক থক' করে। একটা পটল তুলে। বুড়ো দাদার দমবন্ধ। —শিবনেত্র। —অজ স্থির, | অক্ষয় স্বর্গ। লাভ করলেন। হক্কিয় রায়। |

[তদেব]

(ড) খুঁড়ে লঙ্কার ভিত্তি, | তুমি রাখলে কিত্তি।
বিত্তি লাভ। করতে এসে। পিত্তি পলো।

[চাঁইবুড়োর পুঁথি]

(ঢ) 'বলি ক' ছিলুম। হয়েছে ?'
আমি বল্লুম। — 'ছিলুম আবার কি ?। এই তো রয়েছি।'

[তদেব]

(ণ) হুকুমও আসবে না, | হাকিমও আসবে না, | দরজাও খুলবে না, | দর্জিও পাওয়া যাবে না ?

[একে তিন তিনে এক]

এইসব উদাহরণে গদ্য-পদ্যের বিভেদ নগণ্য। অবনীন্দ্র-প্রতিভাগুণে এখানে গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধিত হয়েছে, একথা বলা যেতে পারে।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যসাধনায় অবনীন্দ্রনাথ যে কীর্তি রেখে গেছেন, গদ্যরীতি ও বাক্‌রীতি নিয়ে যে বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন, মহৎ চিত্রশিল্পীর স্বভাব নিয়ে গদ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য কবিত্বগুণ ও চিত্রধর্মিতা আরোপ করে যে অমেয় ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন, তা আপন মহিমায় বর্তমান। ভারতী-কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠীর লেখকদের উপর অবনীন্দ্র-গদ্যের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ন্যারেশনের আদর্শ ভাষা (রাজকাহিনীর ভাষা) সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য, সেইসঙ্গে স্বীকার্য এই সত্যটি যে, অবনীন্দ্রনাথ এমন একজন গদ্যশিল্পী যিনি নিজের সৃষ্ট ভাষারীতিকে বারবার অতিক্রম করে গেছেন। বাংলার প্রধান গদ্যশিল্পীদের অন্যতমরূপে অবনীন্দ্রনাথের নাম অবশ্যউল্লেখ্য।

২৩ | রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রবন্ধ-গদ্য ও প্রবন্ধ-রীতির একটা আদর্শ তত্ত্ববোধিনীর যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যে দেখা গেল। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনায় এই আদর্শের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রবন্ধ-গদ্যের স্বরূপ বর্ণনা করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড, 'The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity, precision and balance.'

ঊনবিংশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ-গদ্যে এইসব গুণেরই চর্চা হয়েছে: শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, সংহতি, যথাযথতা, আভিধানিক স্পষ্টতা, অলংকার-বিরলতা ও বক্তব্যপ্রাধান্য। প্রবন্ধ-রীতিটি এই গদ্যরীতির অনুগামী—সমাজ-কল্যাণাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিষয়ক তত্ত্বমূলক ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আলোচনা।

এই প্রবন্ধ-গদ্যকে বলা যায় যুক্তির গদ্য, চিন্তার গদ্য। ইতিহাস সমাজ ব্যক্তি সম্পর্কিত সকল ঘটনায় প্রাকৃতিক নীতিনিয়ম আরোপ করে তার অনুকূল নোতুন সমাজগঠনের পথনির্দেশ গত শতকের বাংলা প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই এর ভঙ্গি নির্বিকার, নৈর্ব্যক্তিক। বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও গাণিতিক যুক্তিনির্ভরতা এই প্রবন্ধ-গদ্যের প্রধান লক্ষণ। তারই ফলে ভাষা পেয়েছে আভিধানিক স্পষ্টতা, আতিশয্যবর্জিত স্বচ্ছতা ও দ্ব্যর্থহীনতা। আর সে কারণেই ভাষারূপ নিরাভরণ নিরলংকার—এতে নেই উপমা-উৎপ্রেক্ষা, নেই ধ্বনিরোল ও ধ্বনিবহুলতা, নেই চিত্রগুণসম্পন্ন

বিশেষণ, আর যে-বিশেষণ আছে তাও সংখ্যাল্প। অনেক সময়ে মনে হয় এই প্রবন্ধ-রীতি গাণিতিক যুক্তি আশ্রয় করেই ক্ষান্ত হয় নি, জ্যামিতিক সূত্র-প্রণয়নেও ব্রতী হয়েছে, আর পদার্থবিজ্ঞানের মিতভাষণকে আশ্রয় করেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে এইসব বৈশিষ্ট্য অনায়াসলক্ষণীয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অক্ষয়কুমার, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-গদ্যের আলোচনায় এ সব বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

বিংশ শতকে এই চিন্তা-গদ্যের প্রধান শিল্পী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪--১৯১৯)। তাঁর গদ্যের আদর্শ এই প্রবন্ধ-গদ্য, প্রবন্ধের আদর্শ এই প্রবন্ধ-রীতি। রামেন্দ্র-গদ্যে উপরিধৃত বৈশিষ্ট্যগুলি অনায়াসলক্ষণীয়। যুক্তিনির্ভর তথ্যাশ্রয়ী নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যপ্রধান নিরাভরণ দ্ব্যর্থহীন অথচ প্রাঞ্জল ও সরস রামেন্দ্র-গদ্য প্রবন্ধ-গদ্যের আদর্শরূপে এই শতকের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজমান। এই শতকের প্রবন্ধক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নন,—(এই তিনজনেই বঙ্কিম-শিষ্য), আর প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তার সচেতন চতুরতা ও বিদগ্ধ বাগ্‌ভণিতি-প্রাধান্যের কারণে। রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে বাদ দিচ্ছি এইজন্যে যে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ-গদ্য ও প্রবন্ধ-রীতি তাঁর প্রতিভার অনুকূল নয়। একালের অন্যতম গদ্যলেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রামেন্দ্র-প্রবন্ধরীতির কাছে ঋণ স্বীকার করেন। এই স্বীকৃতি রামেন্দ্র-রীতির জয় ঘোষণা করে।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যচর্চার কাল তিরিশ বৎসর—গত শতকের শেষ দশক, বর্তমান শতকের প্রথম দু দশক। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় বিজ্ঞান ও দর্শন। গৌণ বিষয় সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি। আমাদের কালে চিন্তামূল্যের বহুল পরিবর্তন ঘটেছে, তা সত্ত্বেও প্রবন্ধকার ও গদ্যশিল্পী রামেন্দ্র-সুন্দর সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আপন গদ্যরীতি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

"প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল ; তাঁর মত গম্‌গমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভালো করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল ; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশ

দেখলাম যে, আমি যে-সব কথা বলতে চাই, তা ও-ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হল।" [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' জীবনীতে উদ্ধৃত, দ্র° সাহিত্যসাধক চরিতমালা]

প্রথমে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের আতিশয্যপূর্ণ আড়ম্বর-ভরা গদ্যে তাঁর কাজ হবে না, এ সত্য অচিরেই বুঝলেন। তাঁর দরকার স্বচ্ছ ঋজু অনলংকৃত যথাযথ যুক্তিনির্ভর আবেগবর্জিত ভাষা। অর্থাৎ বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্যভাষা। বঙ্কিম-অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। তৎসম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম রচনা পাঠিয়েছিলেন। "সম্পাদকের ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত" হয়ে সংশোধিত আকারে সেই রচনা প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করেছেন এতে তাঁর উপকার হয়েছিল। চিন্তার ভাষায় উচ্ছ্বাস সর্বথাবর্জনীয়,—এই শিক্ষা এ ঘটনায় তিনি পেয়েছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-আলোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখতে লিখতে দুটি বিশ্বাসকে গ্রহণ করলেন। এক, চিন্তার ভাষার স্বচ্ছতা, নিরাভরণতা ও যথাযথতায় বিশ্বাস; দুই, বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী যুক্তিশৃঙ্খলায় বিশ্বাস। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি ও প্রবন্ধরীতির মূল এখানেই।

রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখেছিলেন। জ্ঞান তাঁর কাছে বিজ্ঞান। এই বিশ্বচরাচরে তিনি লক্ষ্য করেছেন 'নিয়মের রাজত্ব'—জগতে কোথাও অনিয়ম নেই, সকল ঘটনার অন্তরালে নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন রয়েছে, মির‍্যাকল বা অলৌকিক ঘটনা মানুষের কল্পনা মাত্র, যতক্ষণ মানুষ বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে না ততক্ষণই মির‍্যাকলের আধিপত্য, যখনি বিশ্বরহস্যকে বিজ্ঞান-যুক্তি দিয়ে দেখি, তখনি নিয়মের রাজত্ব।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' গ্রন্থে নিয়মের রাজত্বেরই স্বীকৃতি। তাঁর কাছে 'ধর্মের জয়' কথাটির অর্থ বিশ্বচরাচরব্যাপী 'scheme of things'-এর জয়, তাই হ'ল ঋত, তাকেই বলে Law। জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম তাঁর কাছে নীতি নিয়ম বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি কোথাও ঈশ্বরের কথা বলেন নি, তাঁর কাছে ঈশ্বর 'ধর্ম' বা 'মহানিয়তি', আপনার নিয়ম শৃঙ্খলায় আপনি-বদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিবাদিতার প্রধান অবলম্বন ছিলেন গত শতকের দুই ইংরেজ মনীষী—চার্লস ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেনসার। ডারউইনের

বিবর্তনবাদ জগৎ ঈশ্বর ও মানবসৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল, চিন্তায় শৃঙ্খলা প্রাধান্য পেয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ও হার্বার্ট স্পেন্সারের জীবন-সংজ্ঞা ('জীবন একটা সামঞ্জস্য স্থাপন') গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁর চিন্তায়, রচনায় ও গদ্যরীতিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রাধান্য লাভ করেছিল।

রামেন্দ্র-মনীষার এই সামান্য রেখাচিত্র তাঁর গদ্যরীতির আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে তাঁর গদ্যরীতিতে চিন্তাপ্রক্রিয়ায় ছাপ পড়েছে। জ্ঞানই শক্তি, এই বিশ্বাস রামেন্দ্র-রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে, তার ফলে তাঁর গদ্যরীতিতে এসেছে ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। বিশ্বে বিজ্ঞাননিয়মেরই রাজত্ব,—এই বিশ্বাস জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে তাঁর গদ্যরীতিতে এসেছে যথাযথতা, আভিধানিক স্পষ্টতা, আবেগবর্জিত পারিপাট্য ও নিরাভরণ স্বচ্ছতা।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান প্রধান রচনা: নানা কথা (রচনা ১৮৯০-১৯০০। প্রকাশ, মৃত্যুর পরে), প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬), কর্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪), শব্দকথা (১৯১৭), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত—বিচিত্র জগৎ (১৯২০), যজ্ঞকথা, জগৎকথা (১৯২৬)।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক। বিজ্ঞান-নিয়মের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। এই নিয়মই তাঁর ঈশ্বর। বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকে তিনি নিরাভরণ সংহত ঋজু বক্তব্যপ্রধান করে তুলেছিলেন, কিন্তু তা নীরস শুষ্ক বিজ্ঞান বিবৃতি নয়, পরন্তু তা সরস প্রাঞ্জল ও ঘরোয়া পরিহাসমণ্ডিত। 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা'য় এই পরিহাসনৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়; 'কর্মকথা' ও 'নানাকথা'য় গুরু চিন্তার প্রাঞ্জল উপস্থাপন লক্ষণীয়। রামেন্দ্র-গদ্যের প্রসাদগুণ রামেন্দ্র-রচনাকে দিয়েছে স্বাদুতা ও প্রসন্নতা; প্রবন্ধ-গদ্যে তা খুব সুলভ নয়, এর উৎস লেখক-ব্যক্তিত্ব। প্রাকৃত-বিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যগুলিকে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন আত্মস্থ করেছিলেন, অপ্রাকৃত অধ্যাত্মচেতনা ও স্বাদেশিক চিন্তা-বেদনার আনন্দে অন্তর্জীবনকে তেমনি সরল, সুন্দর ও সুমধুর রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী মনীষার চিরসহচর ছিল সহজ ও স্বাভাবিক রসবোধ। দুয়ের মিলনে রামেন্দ্র-ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল রসমধুর। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তিত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—"তোমার হৃদয় সুন্দর,

তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।" (৫ ভাদ্র ১৩২১)

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বই 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। লোকরঞ্জন ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা বিষয় ও তথ্য প্রচারের গুরু দায়িত্ব এই গ্রন্থে তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পালন করেছেন। এই সময়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয় (১৩০১ বঙ্গাব্দ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে)। পরিষদের মুখপত্র পরিষৎপত্রিকাও একই সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষেই রামেন্দ্রসুন্দর 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। "বিচার্য বিষয় তিনটি—(১) বিজ্ঞানে পরিভাষার প্রয়োজন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা নির্মাণ-বিধি। এই তিন বিষয়ে তাঁহার আলোচনা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী, কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নবীনের অনুরাগী। তাঁহার ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল ; বাগ্‌রীতি প্রসন্ন।" ['রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪]

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণ ও লোকরঞ্জন ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের গুরু দায়িত্ব রামেন্দ্রসুন্দর সারা জীবন বহন করেছিলেন। 'শব্দকথা' গ্রন্থে (১৩২৪ বঙ্গাব্দ। ১৯১৭ খৃ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিবিচার ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা বিধৃত হয়েছে। শব্দ ও পরিভাষা নির্মাণ ও ব্যবহারে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রযত্ন আজীবন ছিল।

এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-আলোচনায় তাঁর সমান উৎসাহ ও যোগ্যতা ছিল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০১ বঙ্গাব্দে। ১৮৯৫ খৃ) প্রকাশিত হয়। পরিষৎ থেকেই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' পুস্তক প্রকাশিত হয় (১৩১২ বঙ্গাব্দ। ১৯০৫ খৃ)। প্রবাসী ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁর নানা বিজ্ঞান-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই পরিষদের অধিনায়ক-রূপে রামেন্দ্রসুন্দর যোগেশচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। দুজনেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দুজনেই সাহিত্যসেবী, দুজনেই বিজ্ঞানপ্রচারে যত্নবান। এপ্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, '৬০।৭০ বৎসর পূর্বে লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অনুরাগী হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্যেরা উদাসীন থাকিতেন। তৎকালে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যল্প শিক্ষিতের শ্রদ্ধা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ও আমি বাংলা মাসিকপত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কেহ কেহ দয়া করিয়া পড়িতেন, কেহ বা পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল তথ্য প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম।" (উল্লিখিত প্রবন্ধ)

এই বিবরণ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ও যোগেশচন্দ্রের মানসিকতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় পাই। এই বিজ্ঞান-মনস্কতার অপর দিক দর্শন-চিন্তা। যোগেশচন্দ্রের কথায়, "তাঁহার 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়া ছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু এই বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্র-সুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।" [তদেব]

রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র যে-কাজের গোড়াপত্তন করেন, রামেন্দ্রসুন্দর ও যোগেশচন্দ্র তাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেন—লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-প্রবন্ধের দ্বারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। জগদীশচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ রায় সে-কাজকে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। এই কাজে তাঁরা সহযোগী রূপে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

এখন রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যভাষার চারিত্র্য ও প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন নয়। আভিধানিক স্পষ্টতা, আতিশয্যবর্জিত স্বচ্ছতা, ঋজুতা, যুক্তিনির্ভরতা, নিরাভরণতা, বক্তব্যপ্রাধান্য, ও নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা আর সেই সঙ্গে সরসতা —রামেন্দ্র-গদ্যরীতির প্রধান লক্ষণ। এইবার রামেন্দ্র-রচনা থেকে নমুনা উদ্ধার করে এই-সব লক্ষণের সন্ধান করা যাক্।

(১) জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেননা জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নির্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জা বোধ হয়। পক্ককেশের প্রাচুর্য ও লোলচর্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা

মিলাইলে অতিবড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে। [পৃথিবীর বয়স, প্রকৃতি]

(২) গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যত গতির সহিত, গৌণত জড়ের সহিত। যদি একটা জডজগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিব না কেন?

জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। যাহা জড় তাহাই গতিশীল, অথবা যাহা গতিশীল, তাহাই জড, এইরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিলে জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি? না, যাহা গতিশীল। গতি কি? না, স্থান-পরিবর্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কিনা, উহা এইক্ষণ এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণে আর পরক্ষণে, এখানে আর ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্তনকে আমরা কালগত পরিবর্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে দেশগত পরিবর্তন বলিয়া থাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে পরিবর্তন, তাহারই নাম গতি। আমরা জডদ্রব্য অনুভব করি না, আমরা উহার গতির অনুভব করিয়া থাকি। ['এক না দুই', জিজ্ঞাসা]

(৩) ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিয়োরি প্রচলিত আছে। একটার ইংরেজী নাম individualism ব্যক্তিতন্ত্রতা আর একটার নাম socialism সমাজতন্ত্রতা। একদল বলেন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্তিলাভ করিতে দাও; সমাজের যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফূর্তির অনুকূল তাহাই বজায় রাখ; তবে কিনা সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই; সেজন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। অন্য পক্ষ বলেন যখন সমাজের কুশলের উপরেই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

তজ্জন্য ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে। ['অরণ্যে রোদন', নানা কথা]

(৪) বাঙ্‌লা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙ্‌লার লক্ষ্মী বাঙ্‌লাদেশ জুড়ে বসলেন। [বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা]

(৫) জগৎটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের সহিত যদি আমার মুখ্যভাবে ও গৌণভাবে সম্বন্ধ আলোচনা করা যায়, তবে এইরূপ দাঁড়ায়। আমার সহিত মুখ্য সম্বন্ধ প্রথমে আমার শরীরের: পরে পরে আমার পুত্র পৌত্রাদির, পরে আমাব পত্নী-বন্ধু-আত্মীয়বর্গের। এইরূপে ক্রমশঃ মুখ্য গৌণ পরম্পরায় জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, কুল, বর্গ এইরূপে চলিয়া শেষে মানবজাতি জীবকুলে ও জড়জগতে গিয়া শেষ হয়। শেষ হয়—ঠিক বলা যায় না; কেননা প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া আর একটা প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে যাহা হয়তো কোন কালেই প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। ['জীবন ও ধর্ম', কর্মকথা]

(৬) রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কিনা, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ['ঈশ্বরচন্দ্র', চরিত-কথা]

এই কয়টি নমুনা যথেষ্ট। এর থেকেই রামেন্দ্র-গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে যে-সব লক্ষণের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছি, তার শিল্পসম্মতরূপ এখানে অনায়াসলক্ষণীয়। মিতভাষিতা, বক্তব্যপ্রাধান্য, নিরাভরণ স্বচ্ছতা, যুক্তি নির্ভরতা, প্রাঞ্জলতা, ঋজুতা, সর্বোপরি সরসতা—রামেন্দ্র-গদ্যের এইসব গুণ এখানে সাবয়ব হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর সাধু ক্রিয়াপদিক রূপ অবলম্বন

করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁকটা ছিল কথ্যভঙ্গির প্রতি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ উদাহরণে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর চতুর্থ উদাহরণটি ব্যতিক্রম—কথ্যভঙ্গিম গদ্যরীতিতে তাঁর অনায়াসদক্ষতা এখানে প্রমাণিত। তিরিশে আশ্বিনের রাখিবন্ধন ও বঙ্গভঙ্গনিরোধ-আন্দোলনের কাহিনী-কথনে রামেন্দ্রসুন্দর মেয়েলি ব্রতকথার বাক্‌স্পন্দ নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। এখানে পুনঃস্মর্তব্য, প্রবন্ধ-গদ্যের আদর্শ রূপটি রামেন্দ্রসুন্দর সারা জীবন বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করে গেছেন।

২৪ প্রমথ চৌধুরী

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা, লেখ্যরীতি ও কথ্যরীতি নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক শতাব্দী ধরে চলছে। দ্বন্দ্বটা আসলে সাধু চলিত রীতির দ্বন্দ্ব নয়, এই সত্য আমরা বুঝেও বুঝি না। দ্বন্দ্বটা আসলে নোতুন গদ্যভঙ্গির সাহিত্যরূপ নিয়ে। সাহিত্যিক কথ্যরীতি ও আটপৌরে কথ্যভঙ্গি এক নয়,—এই সত্য সর্বদা স্মরণে থাকে না বলেই ভ্রান্তি ঘটে। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের কথ্য রূপ মানেই সাহিত্যিক চলিত রীতি নয়।

"গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা বাদলদিন আজও রয়ে গেছে, আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে" (ছেলেবেলা)—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আটপৌরে কথ্যরীতি নয়। রসসৃষ্টি ও কবিত্বমাধুর্যে তুলনাহীন এই উক্তি সাহিত্যিক কথ্যরীতি, একে কবিতা বললে ভুল হয় না।

সাহিত্যিক কথ্যভঙ্গি ক্রিয়াপদাশ্রিত—এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পাঠে। সাধুক্রিয়াপদ ব্যবহার করেও জীবনস্মৃতির গদ্যকে কথ্যভঙ্গিম গদ্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। "প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে; পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।" (বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি)—এই গদ্যাংশের কথ্যভঙ্গিম রীতি ও প্রাণচঞ্চল বাক্‌পদ্ধতি সাধু ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও পাঠককে মুহূর্তমধ্যে গ্রাস করে ফেলে। বারবার পাঠককে সম্বোধন করেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র কথোপকথনের স্পন্দন জাগাতে পারেন নি, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তা অনায়াসেই পেরেছেন। জীবনস্মৃতি-রচনা ও সবুজপত্র প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক কথ্য-রীতির প্রাণশক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং ক্রিয়াপদের পরিমার্জনায় তাঁর উদ্যম পরবর্তীকালে সজীব ছিল।

চলিত বাংলা—কথ্যরীতি ও উচ্চারণভঙ্গি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই আগ্রহী ছিলেন ও তা নিয়ে ভেবেছিলেন, তার প্রমাণ 'শব্দতত্ত্ব' বইটি। লিখিত ও কথিত বাংলা ব্যাকরণে প্রভেদ আছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ধ অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণ গড়ে উঠতে পারে না,—এ দুইটি কথা রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আচরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।........ বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। ...

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে।.........

মাতাকে (বাংলা ভাষাকে) সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিত প্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঙ্কর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনীবেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।" ['ভাষার ইঙ্গিত, ১৩১১ ; শব্দতত্ত্ব]

বাংলা উচ্চারণরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—হসন্তপ্রবণতা। শব্দের আদ্যস্বরের উপর ঝোঁক পড়ে, ফলে শব্দান্তের স্বর লুপ্ত হয়, হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলা উচ্চারণে স্বরধ্বনির চেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংঘাত সৃষ্টি করে আর শব্দ-মধ্যস্থ স্বরধ্বনিগুলির স্পষ্ট উচ্চারণে মন্থর ধ্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। শব্দ-উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য সুললিত তৎসম শব্দকে ভেঙে দেয়—'নিখিল' হয়ে যায় 'নি-খিল্'। ব্যঞ্জনধ্বনি সংঘাতে শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে যায়—'যাইতেছি' হয়ে যায় 'যাচ্ছি', রূপান্তরে 'যাচ্চি'। দীর্ঘ সুললিত ধ্বনিপ্রবাহসমৃদ্ধ বাক্য কতকগুলি বাক্যখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতে বাক্য ও শব্দ সুরবর্জিত হয়ে যায়। একঘেয়েমি দেখা দেয়।

এইসব অসুবিধার সমাধানের পথ অনেকেই খুঁজেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশ বিদ্যানিধি, অবনীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন, রবীন্দ্রনাথও খুঁজেছেন। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, ছিন্নপত্র,

গল্পগুচ্ছ ও গদ্যনাটকের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আসছিলেন। সুরবর্জিত মৌখিক ভঙ্গির সঙ্গে ছন্দঃস্পন্দের বিরোধ আছে—এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সুরেলা কাব্যধর্মী ছন্দঃস্পন্দযুক্ত গদ্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

সবুজপত্র (১৯১৪) সেই মুক্তির প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করেছিল, আর সবুজ-পত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) সেই ক্ষেত্রের প্রধান পুরুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ, খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশ, যুগল ক্রিয়াপদ, শব্দের বিভিন্ন অর্থাভাস, বাক্যের আকস্মিক বিভাগ, বাগ্‌ভণিতি, বাগ বৈদগ্ধ্য ও ভাষার গাঢ়বদ্ধতা, কথ্য বাংলার ফ্রেজ ও ইডিয়ম, পদবিন্যাসের কথ্যভঙ্গি-সুলভ রীতি—সব-কিছুই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা বীরবলী গদ্যরীতি নামে প্রখ্যাত।

প্রমথ চৌধুরী বাংলাভাষাকে কী দিয়েছিলেন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, তিনি বাংলা গদ্যকে জীবনীশক্তি দিয়েছেন, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তিনি বুঝেছিলেন, ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও তা বুঝেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী সে কথাই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। গদ্যচর্চা বিবেকানন্দের পরিপূর্ণ মনোযোগে পায় নি, প্রমথ চৌধুরী জীবনের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ গদ্যচর্চায় আরোপ করেছিলেন। ফলে বিবেকানন্দে যা ইঙ্গিত মাত্র, বীরবলে তা ফলবান। সেই কারণে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি যেন আমাদের সঙ্গেই ঘরোয়া আলাপ করছেন। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। তাই তিনি কথ্যরীতির সার্বত্রিক অনুশীলনে মন দিয়েছিলেন।

অনুশীলন শব্দটি বীরবলী গদ্যরীতি, চিন্তাপদ্ধতি ও মননের সার্থকতম অভিধা।

অনুশীলিত দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস বলেছেন যে, সে দেহ মেদচ্ছেদকৃশোদর, প্রগুণ, প্রাণসার, উৎসাহযোগ্য; সে দেহ ভার বর্জন করেছে, সার অর্জন করেছে, তা অদম্য প্রাণশক্তির আধার; সে দেহ পলিমাটির লতাপাতা-খাওয়া হোঁৎকা হাতীর দেহের মতো নয়, তা গিরিচর নাগের দেহের মতো। কালিদাসের এই বর্ণনা অনুশীলিত মনেরও বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই মনের অধিকারী। তিনি অতি যত্নে তাঁর মনটি

তৈরি করেছিলেন, তাই তাঁর মন সমস্ত ভার ঝেড়ে ফেলে লঘু ও সারবান, সরস ও প্রাণসার হয়েছিল। ভট্টবানের ভাষায় প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বলা যায়, তিনি 'অখিলকলাকলাপলোচন-কঠোরমতিঃ নিখিলশাস্ত্রাবগাহনগম্ভীর বুদ্ধিঃ'।

প্রমথ চৌধুরীর অনুশীলিত মনের সার্থক প্রতিরূপ তাঁর গদ্যরীতি। সবুজপত্র মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপে তিনি সাহিত্যে নোতুনকে সাদর আহ্বান জানান। বীরবলী গদ্যরীতি সে আহ্বানের মন্ত্রভাষা। এই কাজে তিনি একা নন, একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অধিনায়করূপে তিনি ভাষা ও চিন্তারীতিতে নোতুনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুনরায় ভট্টবানের ভাষায় তাঁকে বলতে পারি, 'প্রবর্ত্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানম্'।

বাংলা গদ্যকে প্রমথ চৌধুরী দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। একারণেই তিনি সাহিত্যে কথ্যরীতির সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি নিরলস প্রয়াস করেছিলেন; চলতি রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টির ভূরিভূরি পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তার পক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন।

এখানে চলতি গদ্যরীতির সমর্থনসূচক তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করি।

১. 'লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন তা হলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।' ('মলাট-সমালোচনা : প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

২. 'আমি বাংলা ভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।··· যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।······ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নইলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না।' ('কথার কথা', তদেব)

৩. 'একথা নিশ্চিত যে, আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহংকারের এবং গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। সেই বিবাদ ভঞ্জন করবার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য বলে মনে করি। সেই

কারণেই এদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজের 'স্থূলহস্তাবলেপ' হতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করবার জন্ম আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন।' ('বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা,' তদেব)

এইসব অভিমত থেকে অনুধাবন করা যায়, প্রমথ চৌধুরী কথ্যভঙ্গিকে সাহিত্যে ঠাঁই দিতে চান, প্রয়োজন মতো বাইরে থেকে শব্দ গ্রহণে তাঁর আপত্তি নেই। এ-সব কথাই বিবেকানন্দ এক দশক পূর্বেই বলেছেন 'ভাববার কথা' গ্রন্থে (দ্র° গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ অধ্যায়)।

সাহিত্যিক কথ্যরীতির ভিত্তি হবে কোন্ উপভাষা ?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

'যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।' (১৯০০ খৃ, 'ভাববার কথা'য় গৃহীত)

হুবহু একথাই বলেছেন প্রমথ চৌধুরী—

'আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। তার কারণ, কলকাতা রাজধানীতে বাংলাদেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাস করেন। ঐ একটিমাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে পরস্পরের কথার আদানপ্রদানে যে নব্যভাষা গড়ে তুলছেন, সে ভাষা সর্বাঙ্গীণ বঙ্গভাষা।' ('বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা', পৌষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ডিসেম্বর ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

ভব্য ভাষা ও আটপৌরে ভাষার মধ্যে শেষোক্ত রীতিই আমাদের আশ্রয়, একথা প্রমথ চৌধুরী বারবার বলেছিলেন। দক্ষিণ বঙ্গে, ভাগীরথীর উভয় কূলে, পশ্চিম বঙ্গে—নদীয়ায়, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে, যে ডায়ালেক্‌ট্ প্রচলিত ছিল, তারই সংস্কৃত রূপ বাংলা সাধুভাষা বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, "ঐ দক্ষিণদেশি ভাষাই তার আকার ও বিভক্তি নিয়ে এখন সাধুভাষা বলে পরিচিত। অথচ আমি তার বন্ধন থেকে সাহিত্যকে কতকটা পরিমাণে মুক্ত করে এ যুগের মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে নিয়ে আসবার পক্ষপাতী। এবং আমার মতে, খাস-কলকাত্তাই নয়,

কিন্তু কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্তব্য।” (তদেব)

'আধুনিক কলকাতার ভাষা', 'বাঙালি জাতির ভাষা' বলতে তিনি শিক্ষিতসমাজের ভাষাকেই বুঝেছেন। তারই ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক কথ্যরীতি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী বারবার ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর ও কৃষ্ণনগরের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এর কারণ কি? ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে গাঢ়বন্ধতা, প্রসাধনদক্ষতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য লক্ষ্য করা যায়, তা সহজলভ্য নয়। মৌখিক ভঙ্গি ও আটপৌরে শব্দের অকুণ্ঠ ব্যবহারকে ছাপিয়ে উঠেছে ঐ বাক্‌পদ্ধতি—তা বিদগ্ধ, অভিজাত, তির্যক। তা আসলে অষ্টাদশ শতকের শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষা। প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষা আসলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষা। তা মোটেই চলিত ভাষা নয়, আটপৌরে অনভিজাত অশিক্ষিত লোকব্যবহারের ভাষা নয়, তা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিশ্রম্ভালাপ—তার অন্তরালে বুদ্ধিদীপ্ত প্রসাধননিপুণ অভিজাত শিল্পীমন ক্রিয়াশীল। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী বিদেশি রাজপুত্র সুন্দরকে বলেছিল,

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে,
কথায় তাহারা সব মনের গাঁট কাটে।

যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও প্রসাধিত ভাষায় মনের গাঁট কাটা যায়, তার ওপর ভারতচন্দ্র রায় ও প্রমথ চৌধুরীর অনায়াসদখল ছিল। তাতে আছে চিন্তা ও প্রকাশ ভঙ্গির মারপ্যাঁচ, তির্যক ভঙ্গি, শাণিত বক্র উক্তি। তার জন্য প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেছেন অর্থাভাসযুক্ত বাক্যাংশ ও শব্দ, আশ্রয় নিয়েছেন বিরোধাভাস (প্যারাডক্স) ও বিষমের (এপিগ্রাম), শ্লেষ (পান্) ও ব্যঙ্গের (স্যাটায়ার), বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তির (আয়রনি)। এ সবই বিদগ্ধ ভাষাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চলিত বাংলাভাষার সাহিত্যরূপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়; সে-কারণেই পরবর্তীকালে বীরবলী রীতির অন্ধ অনুসরণ হয় নি। তবে তিনিই প্রথম 'চলিত রীতিকে সাহিত্যের আম-দরবারে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বীরবলী গদ্যরীতি সম্পর্কে পূর্বেকার ভাবালুতাপূর্ণ উচ্ছ্বাস এখন তিরোহিত। তার ফলে এর আন্তর মূল্য সম্পর্কে আমরা ক্রমশই মোহমুক্ত ও সচেতন হয়ে উঠছি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির

অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, কিন্তু কবিত্বশক্তির অভাববশত গদ্যকে স্থায়ী শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ কথ্যরীতির গদ্যে যে শিল্পসাফল্য লাভ করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর তা অনায়ত্ত ছিল। তাই পরবর্তী লেখকদের ক্ষেত্রে —যেমন, গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথের উপর,—তাঁর প্রভাব বিশেষ নেই। আবার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে গদ্যরীতির যে-ঋণ স্বীকার করেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছে তা করেন নি। কথ্যরীতির নিত্যসঙ্গী উচ্চাঙ্গের শিল্পীস্বভাব, অলংকার-প্রযুক্তি তার সার্থক বিকল্প নয়,—এই সত্যটি গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে সত্যতর বলে মনে হয়। বাক্‌চাতুরী, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শাণিত বক্রোক্তি গদ্যের মৌল শিল্পলক্ষণ নয়—একথা অবশ্যস্বীকার্য। বীরবলী রচনায় শ্লেষ-যমক, বিষম-বিরোধাভাস, ব্যাজোক্তি-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য গদ্যকে সুখপাঠ্য করেছে বটে, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সেই গাম্ভীর্য ও কমনীয়তা, লাবণ্য ও দার্ঢ্য, যা উৎকৃষ্ট গদ্যের তর্কাতীত লক্ষণ। কিন্তু ভাষার বহিরঙ্গ প্রসাধনে প্রমথ চৌধুরীর নৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। সংহত পরিপাটি ক্ষিপ্র লঘু তীক্ষ্ণ পরিচ্ছিন্ন মিতভাষী শাণিত গদ্যরচনায় তিনিই আধুনিক বাঙালিকে দীক্ষিত করেছিলেন।

মিতভাষিতা ও হীরককাঠিন্য বীরবলী গদ্যরীতি ও রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে মিতভাষণের যে আদর ছিল তা বুঝা যায় এই থেকে যে, বৈয়াকরণ তাঁর সূত্রে একটি স্বরবর্ণ কমাতে পারলে পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরী মিতভাষণের এই ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। অল্প কথায় অনেক ভাবপ্রকাশের দুরূহ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। আমাদের অতিকথন ও অতিলেখনের দেশে তাঁর এই আত্মসংযম ও মিতভাষণ বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর কথা শিরোধার্য: 'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।' (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ। বীরবলের হালখাতা। প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

হীরা মালিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'কথাতে হীরার ধার হীরা তার নাম'। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে আছে হীরককাঠিন্য, হীরার ধার ও ঝলক। বস্তুত এটাই তাঁর অন্বিষ্ট, 'ভাষার এমন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।' শ্লেষ (পান্), বিষম (এপিগ্রাম) ও

আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করি নি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছি। [তেল-মুন-লকড়ি. 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত, ১৯০৬]

এখানে শ্লেষ (পান্) ও বিরোধাভাস (অ্যান্টিথিসিস ও প্যারাডক্স) অলংকারের ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়। পদবিন্যাসে সচেতন বিপর্যয়সাধনের কৌশলটিও লক্ষণীয়। বাক্যগুলি কাটা-কাটা, স্বরবর্জিত, পরস্পর-বিযুক্ত, কথ্যভাষার শব্দের পাশেই তদ্ভব তৎসম শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, কথ্য ইডিয়মের পাশেই তৎসম বাক্যাংশ বসানো হয়েছে। 'স্বাভাবিক ঢিলেমি ; 'চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব', 'ফিরে ধরবার ইচ্ছেয়'—বাক্যাংশগুলি এর পরিচায়ক। এই রচনার ভিত্তি কথ্যভাষা,—এখানে তারই শিষ্ট মার্জিত তির্যক উপস্থাপনা। 'পহিলা-সমিতি' ও 'মহিলা-সমিতি'—বিরোধভাসযুক্ত শব্দবন্ধ দুটি লক্ষণীয়। 'বিদেশীয়তা' ও 'স্বদেশীয়তা'—এ দুটি শব্দবন্ধও বিরোধাভাস-অলংকারের প্রয়োগস্থল। আগাগোড়া বিদ্রূপ ও কৌতুকের প্রচ্ছন্ন স্বর সতর্ক পাঠকশ্রুতিতে পৌছয়।

[২] আমি শত চেষ্টা করেও 'রিণী'র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারিনি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধুলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার ফুর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত ; আমার নাক ধরে টান্‌ত, চুল টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত। [চার-ইয়ারি-কথা, ১৯১৬]

খাঁটি বাংলা ফ্রেজ, ইডিয়ম ও স্ল্যাং-এর সঙ্গেই তৎসম শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, তার ফলে এক ধরণের বিরোধাভাস ও কৌতুক-পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে।

[৩] তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ, আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের

রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকার শাস্ত্রে। [আমরা ও তোমরা, 'ভারতী' শ্রাবণ ১৩০৯, বীরবলের হালখাতা, ১৯১৭]

অ্যান্টি-থিসিস ও প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি এই গদ্যাংশে। বস্তুত বিরোধাভাস অলংকারের উপর লেখাটি দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত রচনাটি জ্যামিতিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ, বাক্যগুলি কাটাকাটা, পরস্পর বিযুক্ত; তর্কবিদ্যার স্বল্পাক্ষর গাঢ়ার্থক প্রস্তাবের চেহারা নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু এখানেই এর দুর্বলতা। তুচ্ছ ক্ষীণ বিষয়বস্তুর উপর ভাষার চটককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ফলে রচনা বাক্‌চাতুরিতে পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষিপ্র বাকচাতুর্য এখানে অগভীর রসিকতায় পরিণত হয়েছে। শস্তা মনোরঞ্জন চেষ্টা অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই না প্রমথ চৌধুরী লিখতে পেরেছেন অগভীর কথা—'আমাদের বিবাহ হয়, তোমরা বিবাহ কর'। ভাষাতেও এই দুর্বলতা প্রকট।

[৪] জর্মান বৈজ্ঞানিক হেকেল এবং জর্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এসব দার্শনিক হাত সাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহমনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শনবিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়। [প্রাণের কথা, সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪, নানা-কথা ১৯১৯]

বীরবলী গদ্যরীতি আটপৌরে সংলাপ ও গদ্যরীতি থেকে যে ক্রমশই দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শিষ্ট অতি-মার্জিত উচ্চাঙ্গের ভাষা-সংলাপে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ এই গদ্যাংশ। প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌ভণিতি, বৈদগ্ধ্য, পরিহাসকুশলতা, বক্র কটাক্ষ ও তির্যক প্রকাশভঙ্গি মিলে এই ভাষা-রীতিকে সর্বজনের পক্ষে দুরূহগম্য করে তুলেছে। ব্যাজোক্তি ও বক্রোক্তি

গদ্যরীতির শেষ কথা নয়, অলংকার-প্রযুক্তি কথ্যরীতির নিত্যসঙ্গী উচ্ছাসের শিল্পীস্বভাবের সার্থক বিকল্প নয়, বাক্‌চাতুরী ও চটক ভাষার দার্ঢ্য ও লাবণ্যের উপযুক্ত বিকল্প নয়,—এই সত্য এখানে প্রতিভাত।

[৫] আমি বাইরের দিক তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশযোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জন এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে সম্মুখে যা পড়ে আছে, তা একটি—বালির নয়, পোড়ামাটির পাহাড়,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি, শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা তা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে, আর সে ইট এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ; কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুক্‌নো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ, মাটি, আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেন না, আমারই গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। [আহুতি, ১৯১৯]

গল্পের মধ্যে প্রকৃতিচিত্রাঙ্কনে প্রমথ চৌধুরী এখানে যে-রীতি অবলম্বন করেছেন, তা আমাদের সমস্ত পূর্ব ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। নির্জন নিস্তব্ধ প্রাণহীন রাঙা পোড়ামাটির রাজ্যের ভৌতিক শিহরণ সৃষ্টিতে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন নিজস্ব পথে। বর্ণনাভঙ্গির নির্বিকার ছাড়া-ছাড়া ভাব ও কথ্য-ভাষার শব্দব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

[৬] ভট্টাচার্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামি-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা-ভাতেরই ব্যবস্থা আছে। ……

সমাজে আগে হয় বিয়ে পরে সন্তান, তারপর মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর বিয়ে, নয় মৃত্যু। এককথায় মানুষের জীবনে যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত ! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই। [ফরমায়েসি গল্প, আহুতি, ১৯১৯]

বিষম-অলংকারের (এপিগ্রাম) উদাহরণরূপে এই অংশটি গ্রহণ করা যায়। তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত দ্যোতক জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক এইসব এপিগ্রাম। এই গদ্যরীতি, সন্দেহ নেই, সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতাকে ছাড়িয়ে যায়।

[৭] লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছমাংস কখনো খেয়ো না, যেমন আমি খাই নে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো যেমন আমি খাই ; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুকরো মাছ কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও— এই বলে'।......

আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।......যার মুখের ভাষা ভাল, সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণ-নাগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী।......এজন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।......সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনেরই লেখায় আর গুণের অভাব থাক রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়। ['রূপ ও রীতি' পত্রিকায় (১৯৪০) প্রথম প্রকাশিত ; 'আত্মকথা' ১৯৪৬]

প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য এখানে নিজেই কবুল করেছেন— ইচ্ছে মতো ভাষাকে বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন। বীরবলী গদ্যরীতির দুটি প্রধান গুণ—বাক্‌চাতুরী বা স্থিতিস্থাপকতা আর রসিকতা—এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর প্রথম গদ্যরচনা স্বনামে প্রকাশিত ও বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লেখা— 'জয়দেব' ('ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭/১৮৯০), 'আদিম মানব' ও

'ফুলদানী' ('সাহিত্য', ১২৯৮/১৮৯১)। বীরবল ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন 'ভারতী'তে (১৩০৯ বৈশাখ/১৯০২)—কথ্যভাষাশ্রয়ী বীরবলী রীতির এখানেই রীতিমত সূত্রপাত হয়। চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বীরবলী গদ্যরীতির চর্চা করেছিলেন এবং বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তিনি সমস্ত জীবন ধরে পালন করেছেন। তাতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নি, কিন্তু তাতে প্রমথ চৌধুরীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ঋণের পরিমাণ কমে না।

॥ তিন ॥

প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। সাহিত্যে আনাড়িপনা, বাক্যরচনায় ঢিলেমি, শব্দপ্রয়োগে শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে চান নি। তিনি বাঙালি লেখককে ইংরেজি গদ্যরীতি বর্জন ও ফরাসি গদ্যরীতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ।······ইংরেজি সাহিত্যের amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই। ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুই-ই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়।' ('ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। নানা কথা। প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

ফরাসি সাহিত্য লেখককে লঘু ও তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছিন্ন ও পরিপাটী, সংযত ও ভদ্র ভাষারচনায় উদ্বুদ্ধ করে, এই হ'ল প্রমথ চৌধুরীর অভিমত। 'এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ, জর্মানের ন্যায়

অলকার গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাষ্টারপিস্ বলে গণ্য হত।' (তদেব)

ফরাসি সাহিত্য ও গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় প্রমথ চৌধুরীর যে উদ্যম ও উৎসাহ, তা থেকে তাঁর মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ফরাসি গদ্যের যে-সব গুণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হ'ল—সারল্য, ঐক্যসমতা, স্বচ্ছতা ও সংযম (simplicity, unity, clarity, restraint)। আমরা জানি (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), ভোলত্যের্-এর হাতে ফরাসি গদ্য লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ্ হয়ে ওঠে। পরে উগো, ফ্লোবেয়র, মোপাসাঁ ও দোদে-র হাতে ফরাসি গদ্য লাবণ্য, কমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা ও সাবলীলতা-গুণ লাভ করে।

ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলকে বলে প্রভাঁস। এই দক্ষিণ-ভূমি ফ্রান্সকে দিয়েছে অনেক কবি ও বাক্‌শিল্পী। তাঁদের অন্যতম আলফঁস্ দোদে (১৮৪০-৯৭)। দোদে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকথা মেলা লিখেছেন। সাহিত্যজীবনের সূচনায় পারীর সংবাদপত্রের জন্য রচিত 'আমার জলযন্ত্রের চিঠি' Lettres de mon Moulin (Letters from my Windmill, 1869) ও Tartarain de Tarascon (1872)—গ্রন্থদুটিতে তিনি আপন দেশের কথা বলেছেন। এই লেখায়, বিশেষত 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে ভাষার যে কমনীয়তা, লাবণ্য, মাধুর্য, আনন্দ ও বেদনা ধরা পড়েছে, তা তুলনাহীন।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষ্ণনগরের অধিবাসী প্রমথ চৌধুরী যখন কৃষ্ণনগর, নদীয়া ও কবি ভারতচন্দ্রের কথা বলেন তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করেন। দোদে-ও তা'ই করেছিলেন, প্রভাঁস-অঞ্চলের কথা যখন লেখেন তখন তিনি সবচেয়ে সুখী। বীরবলী প্রবন্ধ ও 'আত্মকথা'য় যেমন আনন্দ বেদনা লাবণ্য মাধুর্য ব্যক্ত, দোদে-র 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে তেমনি ব্যক্ত। ব্যঙ্গপ্রধান, অথচ প্রয়োজন ঘটলে যা বেদনায় সজল, আনন্দে রঙীন হাত পারে, গদ্যরীতির উপর দোদে র ছিল সচ্ছন্দ অধিকার। প্রভাঁস-অঞ্চলের নানা রসালো কাহিনী পাই 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে ('Letters de mon Moulin'), আর দ'খ্ণে ফরাসিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার ছবি পাই Tartarin de Tarascon গ্রন্থে। এই ধরনের বার্লেস্ক-জাতীয় আধা-গম্ভীর-আধা-ব্যঙ্গ-মেশানো ভঙ্গিতে সযত্ন-চয়িত শাণিত বাক্যাংশ ও শব্দের ছিটাগুলিতে তিনি প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত

করে ফেলতেন। ব্যঙ্গপ্রধান আপাতগম্ভীর রচনার উপযোগী আয়ুধ দোদে-র ছিল। এপিগ্রাম (বিষম), প্যারাডক্স (বিরোধাভাস), পান্ (শ্লেষ), আয়রনি (বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তি) দোদে ব্যবহার করেছেন অনায়াস-নৈপুণ্যে।

প্রমথ চৌধুরী দোদে-র গদ্যরীতি, বাক্‌পদ্ধতি, কথনকারু ও জীবনদর্শন দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। সে-কারণেই বীরবলী গদ্যরীতি ও দোদে-র গদ্যরীতির মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার দুরূহ নয় বলেই আমার মনে হয়। বীরবলী প্রবন্ধ, গল্প ও স্মৃতিকথা এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রমথ চৌধুরী যেমন ন্যাকামিভরা জোলো রোমান্টিকতাকে গদ্যে পদ্যে বিদ্রূপ করেছেন, দোদে-ও তেমনি সেকালের রোমান্টিক স্বাধীনচেতা বড় বড় আদর্শে ভরা অথচ ভীরু বোকা টাইপের কবিদের ব্যঙ্গকষাঘাত করেছেন। উগোর বিখ্যাত উপন্যাসের (Notre Dame de Paris, 1831) একটি চরিত্র—কবি মঁসিঅ পিয়ের গ্রঁ্যাগর-এর প্রতি উদ্দিষ্ট একটি চিঠিতে (Le chevre de M. Seguin, 'মঁসিঅ সগ্যাঁর ছাগল' কাহিনী, Letter de mon Moulin গ্রন্থভুক্ত) দোদে এই শ্রেণীর ন্যাকাবোকা কবিদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এখানে ছাগল-কাহিনীর সূচনাংশ উদ্ধার করে তার আক্ষরিক অনুবাদ করে দিচ্ছি। বীরবলী রচনারীতি ও বিশিষ্ট ভঙ্গির সঙ্গে এর মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

La Chevre de M, Seguin

A M. Pierre Gringoire, poete lyrique a Paris. Tu seras bien toujours le meme, non pauvre Gringoire !

Comment ! on t' offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as l'aplomb de refuser.........
Mais regerde-toi, malheureux garcon ! Regarde ce pourpoint troue, ces chausses en deroute, cette face maigre qui crie la faim.

Voila pourtant on t'a conduit la passion des belles rimes ! Voila ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du sire Apollo......Est-ce que tu n'as pas honte, a la fin ?

Fais-toi done chroniqueur, imbecile ! fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux nobles a la rose, tu auras ton couvert chez Brebant, et tu pourras te montrer les jours de premiere avec une plume neuve a ta barrette……

Non ? Tu ne veux pas ? Tu pretends rester libre a ta guise jusqu'au bout……Eh bien ecoute un peu l'histoire de la chevre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne a vouloir vivre libre.

॥ মঁসিঅ সগ্যাঁর ছাগল ॥

॥ পারীর গীতিকবি মঁসিঅ পিয়ের গ্রঁ্যাগর-এর উদ্দেশে ॥

বেচারী গ্রঁ্যাগর, তুমি চিরকাল একই রয়ে গেলে!

কি! পারীর একটা ভালো সংবাদপত্রে রিপোর্টারের কাজ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, আর তুমি সেই কাজ প্রত্যাখ্যান করলে! ……কেন, নিজের দিকে তাকাও, বেচারী আমার! তোমার আঙরাখার ছেঁদাগুলি দেখ, তোমার মোজার সুতোগুলি দেখ। তোমার সারা মুখে ক্ষুধার ছাপ পড়েছে, তা দেখ!

হ্যাঁ, কবিতা লেখার নেশা তোমাকে এইসব দিয়েছে! দশটি বছর দেবরাজ আপোলোর অনুচরবৃন্দের বিশ্বস্ত সেবা করে এই তোমার পুরস্কার!…

তুমি কি লজ্জিত নও? চলে এসো, বাছা!

যাও, বোকারাম, রিপোর্টার হও গে যাও! রিপোর্টার হলে কী হবে! তুমি অনেক টাকা রোজগার করবে, ব্রাবাঁ-তে (নামকরা রেস্তোরাঁ) খেতে পারবে, আর প্রথম রজনীতে (নাচের আসরে) টুপিতে নোতুন পালক গুঁজে নিজেকে দেখাতে পারবে।……

না? তুমি তা করবে না? তোমার ইচ্ছেমত যা খুশি করার স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও? ……বেশ, তাহলে মঁসিঅ সগ্যাঁর ছাগলের গল্পটি শোনো। স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকতে চাইলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে, তা এই গল্পে দেখতে পাবে॥'

এই অনুবাদে দোদে-র ব্যঙ্গবিদ্রূপ নৈপুণ্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। বাক্‌পদ্ধতি ও অলংকারপ্রয়োগকৌশলের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি দোদে-র গদ্যরীতির সহযাত্রী, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন, গদ্যরচনাও আর্ট, তা যত্নসাধ্য, সাধনাসাপেক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন ভাষা যখন গদ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। বাংলা গদ্যকে তিনি দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। ফরাসি গদ্যে এই জীবনীশক্তির প্রাচুর্য দেখেই প্রমথ চৌধুরী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সে-দিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বীরবলের প্রয়াস বিফল হয় নি।

আনাতোল ফ্রাঁসের গদ্যরীতির প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর এক সতীর্থ লিখেছিলেন, Si le crystal pouvait parler, it parlerait ainsi—অর্থাৎ, স্ফটিক যদি কথা কইতে পারত, তবে সে এমনি ভঙ্গিতেই কথা কইত। ভাষার এই স্ফটিক স্বচ্ছতা গদ্যশিল্পীর শ্রেষ্ঠ গুণ। গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড, লোকসাহিত্য, রাজাপ্রজা, সমূহ, সমাজ, সাহিত্য, জীবনস্মৃতি, সাহিত্যের পথে, কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থের রবীন্দ্র-গদ্যে এই স্ফটিক-স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়, অবনীন্দ্র-গদ্যেও তা দেখা যায়। বীরবলী গদ্যে স্বচ্ছতাগুণ, দুঃখের বিষয়, প্রায়শই অন্য গুণ বা অবগুণে ঢাকা পড়ে গেছে, লেখক-মন ও পাঠক-মনের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে বাক্‌চাতুরী ও চটক। ফলে তা চলতি বাংলা গদ্যের প্রবাহ থেকে দূরে সরে গিয়ে এক গণ্ডীবদ্ধ অভিজাত বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মার্জিত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

২৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের অবিশ্রাম প্রয়াস সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটে নি, যদিচ বাঙালি পাঠকসমাজের এক বৃহদংশ এখনো শরৎচন্দ্রীয় আকর্ষণের বশীভূত। নৈর্ব্যক্তিক জীবন-প্রজ্ঞার শোচনীয় অভাব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তম কথাশিল্পী, আজ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের বিক্রয় ঈর্ষাযোগ্য। বুদ্ধির অভাবে, ভাবালুতার সংযোগে, উপলব্ধিবর্জিত বর্ণনা-যোগে, বাংলা উপন্যাস শরৎচন্দ্রের হাতে রমণীয় কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র পাঠক তৈরী করেন নি, পাঠকই তাঁর জন্য তৈরী হয়ে বসে ছিল, অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো আকস্মিক নয়, বাংলাদেশের জলবায়ু ও বাঙালি মানস-প্রকৃতির পক্ষে তা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও গতানুগ। তাঁর উপন্যাসে মহৎ উপন্যাসের উপাদান নেই। যে-সব সর্বজনীন মূল্যবোধের ফলে উপন্যাসে গভীরতা আসে, তা শরৎ-উপন্যাসে নেই। এখানে মানবতার প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে স্বকীয় মূল্যবোধের মিলন ঘটে নি। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কারণ কি? কোন কারণে পাঠকের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব অনায়াসেই নিশ্চিহ্ন হল? আসলে শরৎচন্দ্র পাঠকের নাড়ী টিপে তার অভাববোধ ও প্রত্যাশা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলাদেশের সমতল ভাবালুতাপূর্ণ স্যাঁৎসেতে পরিবেশে 'তিন সঙ্গী'র মতো গল্পগ্রন্থ, অথবা 'গোরা' 'যোগাযোগ'-এর মতো উপন্যাস-রচনা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। তাই গোড়া থেকেই তিনি সারল্যের অঙ্গীকার নিলেন। তাঁর উপন্যাসে ভাবপ্রবণতার ষড়যন্ত্র বুদ্ধি ও মননকে পাঠালো নির্বাসনে, আর প্রেমের স্থান গ্রহণ করলো মধ্যযুগীয় রোমান্স। চরিত্রগুলি লেখকের ইচ্ছাশক্তির পদানত হলো, মানুষী স্বভাবের অনটনে তারা হয়ে উঠলো লেখক-করধৃত পুতুল। এ সবই জনপ্রিয়তার উপাদান, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল শরৎচন্দ্রের ভাষা। যে-কালে তিনি উপন্যাস লিখছিলেন সে-কালে বাংলা গদ্যরীতির কতো-না পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যরূপের

ভিত্তিতে শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনা করে গেলেন। রবীন্দ্র-গদ্যের যে পর্বটি ন্যারেশনের উপযোগী ভাষার অনুকূল, শরৎচন্দ্র তাকেই আশ্রয় করলেন। গল্প-বলার রমণীয় পটুত্ব এবং হার্দ্য বর্ণনা গুণে এত সহজেই পাঠকগোষ্ঠী তাঁর কাছে এসেছিল যে, খ্যাতির কলরবমুখরিত প্রাঙ্গণ ছেড়ে অন্তরঙ্গ ও দুরূহের সাধনায় তাঁর সময়াভাব ঘটলো। ভাবালু বর্ণনা ও অতিকথন-প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হলো গল্পকথনের রমণীয় পটুতা ও প্লটের দুর্বল উদ্‌ভাবনা। এই সবের যোগফল তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। আর এই জনপ্রিয়তার মোহ শরৎচন্দ্রকে এমন পেয়ে বসেছিলো যে, শিল্পীর সাধনা যে সত্যোচ্চারণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একথা তিনি কখনই বুঝতে চান নি। কল্পনা ও মননশক্তির যৌগপদ্য শরৎ-উপন্যাসে নেই, আছে তার শোকাবহ অনটন। শরৎ-উপন্যাসের ভাষাতেও বুদ্ধি ও মননশক্তির শোচনীয় অভাব অনায়াসলক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) ভাষাব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। মাত্র দুটি উল্লেখ আছে। বঙ্কিমের ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত।" ['আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', ১৯১৯]

অন্যপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন যে, তিনি পঞ্চাশবার পড়েছেন গোরা উপন্যাস (১৯১০), তবে তাঁর ভাষাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

গোরা-র ভাষা ঋজু, প্রাঞ্জল, নিরলঙ্কার, প্রসাদগুণবিশিষ্ট। শরৎচন্দ্রের ভাষায় এই সব গুণের অভাব নেই, কিন্তু ভাবালুতা ও রোমান্স-অতিরেক মাঝে মাঝে ভাষার শিল্পসংযম নষ্ট করেছে। তবু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বীরবলের মতো শক্তিশালী গদ্যশিল্পীদের প্রভাব অস্বীকার করে একটিমাত্র ভাষারূপে শতাব্দীর একপাদ (১৯১৩-৩৮) শরৎচন্দ্র অবিচল নিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩) ও শেষ উপন্যাস 'শুভদা'। কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখলেও শরৎচন্দ্র মুখ্যত কথাগদ্যের শিল্পী। তাঁর গদ্য কথাগদ্য রূপেই বিচার্য।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এসে পাকাপাকিভাবে সাহিত্যচর্চাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। সে সময়েই সবুজপত্রে (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষা রীতির জয়পতাকা ওড়ালেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই চলিত বাংলাকে ব্যবহার করে আসছিলেন, এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ভারতী-প্রবাসী-বিচিত্রা-কল্লোল-কালিকলম-মানসী ও মর্মবাণী-শনিবারের চিঠি-বঙ্গশ্রী-ভারতবর্ষ পত্রিকায় যে-সব শক্তিশালী লেখক দেখা দিলেন, তাঁদের অধিকাংশই কথ্যরীতিকে আশ্রয় করলেন, কেবল দুই জনপ্রিয় কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধুরীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তবে এদের সাধুগদ্যরীতির অন্তরালে কথ্যরীতি-প্রবণতা দুর্লক্ষ্য ছিল না। আসল কথা, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপ সাধু ও চলিত গদ্যরীতির সীমানাচিহ্ন নয়, এই সত্য স্বীকার করে নিলে শরৎচন্দ্রের কথাগদ্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। ক্রিয়াপদের সাধু-ত্ব ঘোচালেই কথ্যরূপ আসে না; 'করিতেছে' কথ্যরূপে হয়ে যায় 'করছে'- ক্রিয়াপদে হসন্ত-প্রাধান্যের ফলে সমস্ত বাক্যেই একটা পরিবর্তন আসে—বাক্যের ধ্বনিরূপটাই মনে হয় বদলে যাচ্ছে, তাই ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপটা আমাদের মনকে খুব টানে। কিন্তু তা ছাড়াও আরো বিচার্য বিষয় আছে। তৎসম শব্দ গ্রহণ বর্জনের সমস্যা, ঘরোয়া ইডিয়মের সমস্যা, বাক্-পদ্ধতির মৌল রূপের সমস্যার সমাধান না হলে ক্রিয়াপদের সাধুরূপ বদলে গেলেই মৌখিক রীতির প্রতিষ্ঠা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস (১৯১৬) সাধু ভাষার লেখা হলেও তার অন্তরপ্রকৃতি মৌখিক ভাষার। চলিত রীতির প্রতি চতুরঙ্গ উপন্যাসের ঝোঁকটা এতই বেশী যে মাঝে মাঝে সাধুবাংলার এলায়িত শব্দকে 'পিণ্ড পাকিয়ে' তোলা হয়েছে। এ রবীন্দ্রনাথেরই কথা। তার ফলে ক্রিয়াপদে ও দেশী শব্দে সংকোচন ঘটে। চতুরঙ্গ বিশুদ্ধ সাধুরীতির গদ্যে লেখা,—একথা মেনে নেওয়া কঠিন। আবার 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৬) ক্রিয়াপদ মৌখিক রীতিকে মেনেছে,—চলতি ক্রিয়াপদের উপর বর্ণনা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মৌখিক রীতির সঙ্গে ঘরে-বাইরের বাক্‌পদ্ধতির মিল কোথায়? অলংকারবাহুল্য, উপমা-উৎপ্রেক্ষার অসাধারণ দ্যুতি, দীর্ঘ পল্লবিত বাক্য, ধ্বনিসজ্জা, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, শিল্পকৌশলসমৃদ্ধ প্রকাশভঙ্গি ঘরে-বাইরের ভাষাকে করে তুলেছে অ-সাধারণ, তা মৌখিক রীতি থেকে অনেক দূরে

সরে গেছে। তার চেয়ে গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডের (প্রাক-সবুজপত্র যুগের গল্প) ভাষা অনেক বেশি লঘু ও স্বচ্ছ, যদিচ তার ক্রিয়াপদ-সাধুরূপের। জীবনস্মৃতি (১৯১২) সাধু ক্রিয়াপদকে বর্জন করে নি, কিন্তু তার স্বচ্ছতা, লাবণ্য, লঘুতা ও স্পষ্টতা রবীন্দ্র-গদ্যে আর কোথায় আছে? বীরবলী গদ্যে এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার অভাব আছে। গল্পগুচ্ছ ও জীবনস্মৃতির ভাষার তুলনায় তির্যক ভঙ্গিঅলা বীরবলী গদ্যরচনা সহজবোধ্য নয়, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের কথাগদ্য বীরবলী গদ্য ও 'ঘরে-বাইরে'-'শেষের কবিতা'র গদ্য অপেক্ষা সহজবোধ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না।

তাঁরা দুজনেই জনপ্রিয় কথাশিল্পী ছিলেন, অর্থাৎ পাঠকমনকে টানবার ক্ষমতা তাঁদের ভাষায় ছিল। তাঁদের গল্প-উপন্যাসের শিল্পমূল্য কম হতে পারে। কিন্তু তার ভাষাবাহন জনচিত্তজয়ী ছিল, একথা অবশ্যস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন, তখন তাঁর চোখের সামনে জীবনস্মৃতি, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। 'চার ইয়ারি কথা' (১৯১৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯), 'আহুতি' (১৯১৯), 'দু-ইয়ারকি' (১৯২০), 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১), 'রায়তের কথা' (১৯২০) প্রকাশিত হয়েছে—বীরবলী গদ্যের শাণিত ঔজ্জ্বল্য ও বাক্‌চাতুরী আঁধি লাগিয়ে দিয়েছে, তবু শরৎচন্দ্র তার প্রতি প্রলুব্ধ হন নি।

'লিপিকা' (১৯২২), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৩), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)—এইসব রবীন্দ্র-উপন্যাসে কথাগদ্যের ঐশ্বর্যরূপ ও চমৎকারিত্ব শরৎচন্দ্র খুব কাছের থেকে দেখেছেন। তবু তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন নি। এর কারণ কি?

আসল কথা, গদ্যশিল্পীরূপে শরৎচন্দ্র স্থিতধী, সতর্ক, সাবধানী লেখক।

শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাস-সূচী এই: শুভদা (রচনা ১৯০২ ? প্রকাশ ১৯৩৮), বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজ-বৌ, বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া (১৯১৪-১৬); শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন (১৯১৭); স্বামী, দত্তা, শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮): গৃহদাহ (১৯২০), দেনা-পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব (১৯২৭), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩), বিপ্রদাস (১৯৩৫)।

শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির কাঠামো সাধু গদ্যের। কিন্তু তার প্রবণতা কথ্যভঙ্গির প্রতি। সংলাপে মৌখিক রীতির স্বীকৃতি ত আছেই, সেই সঙ্গে বাকপদ্ধতি ও পদবিন্যাসে চলতি রীতির প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। চলতি গদ্যের স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা তিনি আপন গদ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। বুদ্ধি ও মননশক্তির শোচনীয় অনটন শরৎ-গদ্যে লক্ষণীয়; কিন্তু হৃদয়ানুভূতি ও আবেগের বাহনরূপে এর উপযোগিতা তর্কাতীত।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অতি-সতর্ক লেখক। পাণ্ডুলিপি একাধিকবার সংশোধন না করে তিনি তৃপ্ত হতেন না। সচেতন গদ্যশিল্পীর শব্দ-সচেতনতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যজ্ঞান ও পরিমিতিবোধ তিনি বহু আয়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। ভাগলপুর ও রেঙ্গুন প্রবাসকালে তিনি গদ্যচর্চাকে সাধনার বিষয় করে তুলেছিলেন। সেই দুরূহ সাধনার ইতিহাস পাঠকের অজ্ঞাত থেকে গেছে বলেই আমরা শরৎচন্দ্রের কলানৈপুণ্যে বিস্মিত হই। গোরা উপন্যাসের ভাষার সতর্ক অনুসৃতি তাঁকে শিখিয়েছিল যে ভাষার প্রধান গুণ—প্রাঞ্জলতা, সারল্য ও স্পষ্টতা। এই প্রসাদগুণ শরৎচন্দ্রের ভাষারীতিতে অনুস্যূত হয়ে আছে, তাই এত সহজেই তিনি পাঠকহৃদয়কে জয় করতে পেরেছিলেন।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে আমার অভিযোগ অনপনেয়, কিন্তু ভাষাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর ভাষা সতর্ক, সংযত, শান্ত। তাঁর ভাষায় যে মাধুর্য, তা সংযমের মাধুর্য। তাঁর ভাষার যে লাবণ্য, তা সারল্যের শিল্পলাবণ্য। শরৎ-উপন্যাসের রচনাসৌষ্ঠব অবশ্যস্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির লক্ষণগুলি এই—সংযম, শান্তি, স্বচ্ছতা, মাধুর্য, কমনীয়তা, সারল্য ও লাবণ্য। বস্তুত এইসব গুণের বলেই শরৎচন্দ্র পাঠককে অতিসহজে পরাস্ত ও অভিভূত করতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে—বস্তুসচেতনতা, পর্যবেক্ষণ-প্রবণতা, খুঁটিনাটির প্রতি আগ্রহ। তার ফলে শরৎচন্দ্রের ঝোঁকটা পড়েছে লাগ্‌সৈ শব্দের প্রতি, উপমা ও রূপকের প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতার প্রতি, শ্লেষ ও কৌতুকের প্রতি এবং কখনো-কখনো কবিত্বগন্ধী শব্দচিত্রের প্রতি। শরৎচন্দ্র দুরূহ তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, শব্দগাম্ভীর্য এড়িয়ে চলতেন। তাঁর ভাষা উত্তরোত্তর মৌখিক ইডিয়মের প্রতি ঝুঁকেছে, একথাও স্বীকার্য। গদ্যরচনায় রবীন্দ্র শিষ্য হয়েও শরৎচন্দ্র আপন গদ্যরীতি নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

এবার শরৎ-গদ্যরীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়সাধন করি।

[১] জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে কিম্বা মানুষে সখ করিয়া কাঁদে, কিম্বা দায়ে পড়িয়া কাঁদে অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া এক চোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। [শুভদা, রচনা ১৯০২ ? প্রকাশ ১৯৩৮]

[২] যে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দিক-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে,—সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ নির্মল সরোবরে তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে, সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারে অশ্বত্থবৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই। [কাশীনাথ, প্রথম প্রকাশ 'সাহিত্য' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ মার্চ-এপ্রিল ১৯১৩]

শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের কথাগদ্যের এই দুটি নমুনায় দীর্ঘ বাক্যের ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ্য করি। বর্ণনার পক্ষে এই ভাষা কতটা উপযোগী তা এখানে শরৎচন্দ্র পরীক্ষা করেছেন। এই সময়কার গদ্যকে শরৎচন্দ্রের প্রস্তুতি-পর্বের গদ্য বলা যায়। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রীতি এখনো পরিস্ফুট হয় নি। পদবিন্যাস, বাক্যগঠন ও শব্দব্যবহারে তিনি যে নিশ্চিত নন, তার পরিচয় এখানে লক্ষ্য করা যায়। অচিরেই এই দ্বিধার অবসান হ'ল।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাসে (বড়দিদি, ১৯১৩) শরৎচন্দ্র পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে

দেখা দিলেন। সেদিন থেকে পরবর্তী পঁচিশ বৎসর বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অপ্রতিহত গতি। পূর্ববর্তী বিশ বৎসর তাঁর অজ্ঞাতবাস। এইকালে তাঁর লেখক হবার সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'বড়দিদি' থেকে 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) পর্যন্ত গল্পে-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যে গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন তা সূচনাতেই পূর্ণরূপে প্রকাশিত। 'শুভদা', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রাথমিক রচনার সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে তিনি 'বড়দিদি' ও 'বিরাজবৌ' (১৯১৪) নিয়ে দেখা দিলেন। 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে'—এই তিনটি গল্প যমুনা পত্রিকায় যথাক্রমে ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯, বৈশাখ ১৩২০ ও শ্রাবণ ১৩২০ (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের আকাশে নবচন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বড়দিদি-রামের সুমতি-বিন্দুর ছেলে-তেই তাঁর গদ্যরীতি পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত।

[৩] সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা! ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, 'তুমি বড়দিদি?'

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্ত-বিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

'তুমি বড়দিদি?'

'আমি মাধবী।'

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদু-মৃদু স্বরে বলিল, 'আঃ তাই!'

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে! অধরের কোণে সরক্ত হাসিও তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বড়দিদি, যে কষ্ট!' [বড়দিদি, প্রথম প্রকাশ 'ভারতী' বৈশাখ —আষাঢ় ১৩১৪। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৩২০ বঙ্গাব্দ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ]

কথাগদ্যের উপর শরৎচন্দ্রের অধিকার এখানে প্রতিষ্ঠিত। তবু শব্দ-ব্যবহারে রক্ষণশীলতা একেবারে যায় নি, 'ক্রোড' 'অঞ্চল' 'অবগুণ্ঠন' শব্দ ও 'কহিল' ক্রিয়াপদ তার প্রমাণ। তবু কথ্যসংলাপরচনায় তাঁর নৈপুণ্য অনায়াসলক্ষণীয়। সাধু ভাষার কাঠামো-আশ্রিত এই গদ্যাংশের ঝোঁক মৌখিক ভাষার দিকে, তার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। সে ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়েছে পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে।

[৪] শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাবটা নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যূষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন। ....

শুভ সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয়া কন্যা দশমবর্ষীয়া অন্নাকালী। সে বলিল, 'বাবা, চল না দেখবে।'

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মা, এক গেলাস জল আন্ ত খাই।'

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল, সূতিকা-গৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেসনে গাড়ী আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁট্‌লা-পোঁট্‌লি লইয়া পাগলের মত যে ভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার্ মার্ শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হু-হু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। [পরিণীতা, প্রথম প্রকাশ 'যমুনা' ফাল্গুন ১৩২০, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১৪]

শরৎচন্দ্রের স্টাইলের পূর্ণ পরিণতি এখানে (ও রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে গল্পত্রয়ে) অনায়াসলক্ষণীয়।

এই গদ্যাংশের বাক্‌পদ্ধতি মৌখিক ভাষার অনুগামী। ঘরোয়া ইডিয়ম উপস্থাপন ও প্রয়োগকৌশল এখানে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ও শেষ বাক্যটি দীর্ঘ, একথা বলে না দিলে পাঠকের খেয়ালই থাকে না, এমনই তাদের বয়নবৈপুণ্য। "শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাবের" সঙ্গে "গুরুচরণের মুখের ভাব ও চেহারার" সাদৃশ্যসন্ধান, এবং "ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ী আসিলে দোর খোলা পাইলে" থার্ডক্লাসের যাত্রীদের মার্‌মার্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে গুরুচরণের মগজে দুশ্চিন্তারাশি হু-হু করে প্রবেশের তুলনা—এই দুটি উপমাচিত্র কেবল স্মিত কৌতুকে ও সমবেদনায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট নয়, সেই সঙ্গে কথ্যরীতির প্রতি নিবিশেষ আনুগত্যও ব্যক্ত হয়েছে। যে-সময়ে প্রমথ চৌধুরী আমাদের কথায় ও লেখায় অমিল দূর করবার জন্যে বাঙালি লেখকদের চেষ্টা করতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন ও কথ্যরীতিকেই একমাত্র আশ্রয় বলে ঘোষণা করছিলেন (দ্রষ্টব্য—'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'ভারতী' পৌষ ও চৈত্র ১৩১৯,

প্রবন্ধসংগ্রহ ১) সে-সময়েই শরৎচন্দ্র রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে গল্পত্রয়ী ও পরিণীতা উপন্যাস (ফাল্গুন ১৩১৯ থেকে ফাল্গুন ১৩২০, 'যমুনা') লিখে সে-সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান করেছিলেন। সাধুভাষার কাঠামোতেই তিনি অবলীলাক্রমে চলতি ভাষার প্রাণশক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন, গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্রের এটাই প্রধান কৃতিত্ব। এটাই তাঁর ভাষাকৌশল—যার দ্বারা তিনি পাঠকসমাজকে জয় করে নিয়েছিলেন। কথ্যভাষার বাক্‌পদ্ধতি, ঘরোয়া ইডিয়ম, লঘুতা, বৈচিত্র্য, আটপৌরে ভঙ্গি, শব্দব্যবহারে ঔদার্য—সব-কিছুই শরৎচন্দ্র আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর ছিল না বীরবলী শুচিতা বা হুতোমী অশালীনতা, কিন্তু কথ্যরীতির প্রাণশক্তিকে তিনি অধিকার করেছিলেন।

[৫] কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর-বয়স্ক দু'টি বালক। প্রকৃতি-দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিঃস্তব্ধ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দ্রংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা-হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশে-পাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিতেছে। [শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ' মাঘ-চৈত্র ১৩২২, বৈশাখ-মাঘ ১৩২৩। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১৭]

এই গদ্যাংশ সম্পর্কে দুটি সত্য স্মর্তব্য। এটি অনুভূতিশীল কবির উপযোগী বর্ণনা, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তম উপন্যাসের অংশবিশেষ। এর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠক, আজো এর জনপ্রিয়তা সীমাহীন। কেবল কাহিনীতে নয়, ভাষাতেও এমন এক জাদু আছে, যা অর্ধ-শতক ধরে পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছে। কাব্যগুণসমৃদ্ধ বর্ণাঢ্য উপমাঋদ্ধ অলংকৃত গদ্যরচনায় শরৎচন্দ্রের ক্ষমতা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই গদ্যাংশের ছন্দ ও ধ্বনিসজ্জা সতর্ক

শ্রুতিতে ধরা পড়ে। এর বাক্যগুলি দীর্ঘ, পল্লবিত, পর্বে পর্বে বিভক্ত। উদ্দাম জলস্রোতের মতোই এই গদ্যস্রোত দ্রুতবেগে ধাবিত, কিন্তু তা পর্বে পর্বে নিরূপিত, ছন্দ-তরঙ্গের নিয়মিত লয়যুক্ত। বিশেষণ-ব্যবহারে ও উপমাচিত্র-রচনায় লেখকের সতর্কতা ও নিপুণতা বিশেষ লক্ষণীয়। সাধু গদ্যকাঠামোয় লেখক গতি সঞ্চার করেছেন মাঝে মাঝে প্রাকৃত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের দ্বারা। 'লেপিয়া একাকার হইয়া গেল', 'রহিল শুধু—', 'উন্মত্ত জলস্রোত তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে', 'আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে', 'জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে'। এই সব শব্দ, ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ফলে গদ্যপ্রবাহে এসেছে লেখকের অভিপ্রেত তীব্র গতি। উপমাচিত্রাঙ্কনে লেখকের ঝোঁক স্পষ্টতার প্রতি, প্রয়োজনে বহুসংখ্যক বিশেষণ-ব্যবহারে তাঁর আপত্তি নেই। নিশীথিনীর চারটি বিশেষণ পরপর ব্যবহৃত—'বায়ুলেশহীন', 'নিষ্কম্প', 'নিস্তব্ধ', 'নিঃসঙ্গ'; তারপর ঐ বাক্যেই পাই উপমাচিত্র— 'সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি'। আর একটি ছবি: 'সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দ্রংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা-হাসির মত বিচ্ছুরিত হইয়াছে।' উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলংকারের ছড়াছড়ি! আশ্চর্য, তবু শরৎ-ভক্ত পাঠকসমাজ কোনো আপত্তি না করেই এই চিত্রবহুল সাধু গদ্যবর্ণনাকে মেনে নিয়েছে ও সম্ভোগ করেছে, যেমন করেছে প্রথম খণ্ড গল্পগুচ্ছের সাধুগদ্যাশ্রয়ী বর্ণনাকে।

[৬] রাত্রে বড়কর্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া চোখে চস্‌মা আঁটিয়া গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মোকদ্দমার দলীল-পত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজকর্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পারো? কেবল শূয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কাণে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, না, আর দেরী নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্চি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বল্‌চে! আমি বল্‌চি, ছোট বৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল, সে খবর শুনেচ কি?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হুঁ, শুনেচি বৈ কি। ছোট-বৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মোকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এই ভাবেই থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—আমার একটা কথাও কি তোমার কাণে তুলতে নেই? আমি কি বল্‌চি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ। ছোটবৌরা যে বাড়ী থেকে চলে যাচ্চে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চেন?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্চে, তার আমি কি জানি?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না।

[নিষ্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, আংশিক—'যমুনা' বৈশাখ ১৩২১, সম্পূর্ণ—'ভারতবর্ষ' ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ১৩২৩। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯১৭]

সংলাপরচনায় শরৎচন্দ্রের অশেষ নৈপুণ্য এখানে প্রকাশিত। অল্প আয়োজনে রসসৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এখানে কৌতুক প্রতি কথায় উচ্ছলিত। এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সংলাপ যে মনে হয় যেন নাট্যসংলাপ। এই কথ্য সংলাপকে ধরে আছে সাধুক্রিয়াপদিক ভাষা। দুয়ের সমাবেশ এত চমৎকার হয়েছে যে পাঠকের মনেই থাকে না যে, সাধুভাষায় লেখা গল্প পড়ছি। বীরবলী গদ্যরীতির তুলনায় এই গদ্যরীতি অনেক ঘরোয়া ও আটপৌরে। পাঠক এখানে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ততটা কখনই বীরবলী গদ্যক্ষেত্রে করে না।

[৭] আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেল্‌চি তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জলা বিষের আগুনে কল্‌জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

[স্বামী, প্রথম প্রকাশ 'নারায়ণ' শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯১৮]

শরৎচন্দ্রের যে সামান্য কথ্যরীতি-আশ্রয়ী রচনা তারই অন্যতম 'স্বামী' গল্পটি। এখানে সম্পূর্ণভাবে চলতি গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। সাধুভাষাশ্রয়ী গদ্যে শরৎচন্দ্রের শিল্পসাফল্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে কথ্যরীতি গ্রহণে আগ্রহী করে নি। সে কারণে এই গদ্যরীতি শরৎচন্দ্রের পূর্ণ মনোযোগ পায় নি। আসল কথা, শরৎচন্দ্র তাঁর সাধুভাষাশ্রয়ী গদ্যরীতিতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

[৮] কেরাসিনের উজ্জ্বল আলোক পুরোভাগে লইয়া মেঝের উপর সাবিত্রী পান সাজিতে বসিয়াছিল। মাথায় কাপড নাই, আর্দ্র কেশভার মস্তক পিঠ ব্যাপিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! দু' একটা চূর্ণ কুন্তল আঁচলের কালো পাড়ের সহিত মিশিয়া কাঁধ হইতে কোলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। নারীর রোগক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের যে নিজস্ব গোপন মাধুর্য আছে, তাহাই এই কৃশাঙ্গীর সদ্যঃস্নাত মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। সে কিছু অন্যমনস্ক চিন্তামগ্ন। সহসা দূরবর্তী জুতার পদশব্দ সন্নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তথাপি তাহার কানে গেল না। যখন গেল, তখন উপেন্দ্র-সতীশ একেবারে দরজার উপর দাঁড়াইয়াছে। ধ্যান ভাঙ্গিয়া মুখ তুলিয়াই সাবিত্রী বিবর্ণ আত্মহারা হইয়া গেল এবং সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে বঙ্গ-রমণীর জন্ম-জন্মার্জিত অন্ধ সংস্কার তাহাকে অপরিসীম লজ্জায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং পরমুহূর্তেই সে দুই হাত বাড়াইয়া তাহার আরক্ত মুখের উপর আবক্ষ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল। [চরিত্রহীন, প্রথম প্রকাশ—'যমুনা', কার্তিক-চৈত্র ১৩২০ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯১৭। সংশোধিত ১৯৩৭]

ন্যারেশনের গদ্যরূপে শরৎ-গদ্যরীতির উপযোগিতা এখানে পরীক্ষিত হয়েছে। নায়িকারূপবর্ণনায় তাঁর কৌশলও এখানে ব্যক্ত। বিশেষণ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে তাঁর সতর্কতা ও সাবধানতা লক্ষণীয়। বাক্যগুলি জটিল, সরলবাক্য একটিমাত্র। পদবিন্যাসে মৌখিকভাষার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। পদ্যবিন্যাসে বিপর্যয় ও কর্তৃপদের বিলোপের দ্বারা সাধুভাষায় কথ্যরীতির বেগ সঞ্চারিত হয়েছে।

[৯] বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল,

কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিল। [গৃহদাহ, প্রথম প্রকাশ—ভারতবর্ষ ১৩২৩-২৬ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯২০]

এখানে একটিমাত্র দীর্ঘ জটিল বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাক্যটি দৃশ্যতঃ পাঁচটি পর্বে বিভক্ত, কমা-চিহ্নের দ্বারা পর্ববিভাগ সূচিত। বাক্যটির অন্তর্নিহিত ছন্দঃস্পন্দন ও ধ্বনিসজ্জা সতর্ক শ্রুতি এড়িয়ে যায় না। পদবিন্যাস, বাক্যাংশ (পর্ব) গঠন ও বাক্যনির্মাণে লেখকের শিল্পসচেতনতা এখানে অনায়াসলক্ষণীয়। মনে হয় ধ্বনিসচেতন কথাশিল্পী সতর্ক পরিমার্জনা অন্তে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করেছেন। প্রায়শই কাব্যোপযোগী শব্দচিত্র ও শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—'মত্ত রাত্রি', 'অন্ধ হৃদয়তলে'। বাক্যে বেগ সঞ্চারিত হয়েছে কথ্যরীতি-আশ্রয়ী ক্রিয়াপদ ও নামধাতুর ব্যবহারে। এই কৌশলটি পঞ্চম উদাহরণে লক্ষ্য করেছি। চিত্র-ধ্বনি-বহুল সাধু গদ্যবর্ণনা, দু ক্ষেত্রেই, এই কৌশল প্রয়োগে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

[১৩] নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোন দিন দেখিতে পায় না। সেই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত নারী-রূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্যস্ত চুলে, তাহার উপবাস-কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়,—তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস লীলা এই বিশ বর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়াছে,—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্য্যই যে এই ব্যভিচারের ঘূর্ণাবর্তে অতলে তলাইয়াছে তাহার দাগটুকু পর্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই; লালসার সেই অগ্নিজিহ্বা আজ যখন অকস্মাৎ বাধা পাইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য এই অপরিচিত বিস্ময়ে তাহার মদোন্মত্ত বিকৃত দৃষ্টি স্তব্ধ, গম্ভীর এবং আবিষ্ট হইয়া রহিল। [দেনা-পাওনা, প্রথম প্রকাশ—'ভারতবর্ষ' ১৩২৭-৩০ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯২৩]

/ এই রচনাংশে বাক্যের সংখ্যা তিন। প্রথমটি বাদ দিলে বাকি দুটি বাক্য বেশ দীর্ঘ। কাব্যগুণ ও চিত্রগুণ বাক্যগুলিতে পরিব্যাপ্ত। বিশেষণ-ব্যবহারে, উপমা-প্রয়োগে লেখকের উৎসাহ লক্ষ্য করার মতো। ষোড়শী ভৈরবীর

সন্ন্যাসিনীরূপের বর্ণনায় লেখক খুবই সতর্ক। পরম্পরিত বাক্যাংশগুলি নিয়মিত পর্বের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্তটায় ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন শ্রুতিগম্য রূপলাভ করেছে। তৎসম শব্দের আধিক্য অনায়াসলক্ষণীয়, কিন্তু তার জন্য বাক্যের গতি বাধাগ্রস্ত হয় নি। বাক্যাংশ, শব্দবন্ধ ও দীর্ঘ বাক্যের অধীন উপবাক্যগুলির গঠন ও প্রয়োগে লেখকের শিল্পসচেতনতা এত ক্রিয়াশীল যে কোথাও বাধে না; সাবলীলতা এর প্রধান গুণ, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাব্যগুণ।

[১১] নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এম্‌নি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠতো না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়ি নি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাও নি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস, কাড়া-কাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না – অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণ-ধী কমল এক নিমেষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, এ সকল নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলোমেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ বৃথা—আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব-পশ্চিম-দিক্‌-নির্ণয় না করিয়াই সে ইহার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল। [শেষ প্রশ্ন, প্রথম প্রকাশ—'ভারতবর্ষ' ১৩৩৪-৩৮ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯৩১]

সন্দেহ নেই, এই অংশে কথ্যভঙ্গির প্রাধান্য। দীর্ঘ পল্লবিত বাক্যের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্যাংশ ও শব্দবন্ধকে একটি বাক্যের কাঠামোয় রাখা হয়েছে। তবে বিশেষণ-উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রতি শরৎচন্দ্রের অনুরাগ কমে নি। মনে হয় প্রথম খণ্ড গল্পগুচ্ছ, গোরা ও জীবনস্মৃতির স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক, সাবলীল সাধু গদ্যই শরৎচন্দ্রের আদর্শ। তারই ভিত্তিতে শরৎ-গদ্যরীতি গড়ে উঠেছে। এটাই শরৎ-গদ্যের ভিত্তি। কাব্যোপম উপমা ও

বিশেষণ এই সাধুভাষাশ্রয়ী গদ্যরীতিতে যতটা খাপ খায়, ততটা আর কোনো ভাষাশ্রয়ে নয়। এই অংশের ভাষারীতির কথ্যভঙ্গিপ্রবণতা কেবল সংলাপে নয়, ন্যারেশনেও প্রকট। 'সুন্দর মুখখানি', 'এক নিমেষে বুঝিল', 'কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে'—এইসব বাক্যাংশের প্রবণতা মুখের ভাষার প্রতি।

রবীন্দ্র-গদ্যরীতির প্রভাব উপরের সব উদাহরণেই লক্ষণীয়।

[১২] বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিম্বা, এমনই হয়ত সকল মেয়ের প্রকৃতি, ভালবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তারপরেই বলিয়া উঠিল,—কিম্বা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিষ নয় মুখুয্যে মশাই, ওটা মরীচিকা। [বিপ্রদাস, প্রথম প্রকাশ—'বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৬ ৩৮, পরে 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৯-৪১ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১৯৩৫]

এই অংশেও পূর্বধৃত উদাহরণটির সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। শরৎচন্দ্রের ভাষার মুদ্রাদোষ এই অংশে প্রকট—'হয়ত', 'এমনই হয়ত', 'কিম্বা', 'কিম্বা হয়ত' প্রভৃতিতে গদ্যাংশ সমাচ্ছন্ন।

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে শরৎ-গদ্যের আরো কিছু মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করা যায় —'অবধি নাই', 'এমনই বটে', 'বোধ করি', 'কিন্তু। তা ছাড়া আছে অতিশয়োক্তিমূলক প্রত্যয়ের ব্যবহার। 'ই' প্রত্যয়ের অতিব্যবহার অমনোযোগী পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না।

তা থাক্। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের এই ভাষা অর্ধশতাব্দীকাল বাঙালি পাঠকসমাজকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে ও দিচ্ছে, তা অস্বীকার করা মূঢ়তা। সাবলীলতা, মাধুর্য, স্থিতিস্থাপকতা, লাবণ্য, স্বচ্ছতা ও কোমলতা গুণে শরৎ-গদ্য সমৃদ্ধ। বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, 'What is style? The way of expressing oneself most effectively.' শ'-এর কথা যদি আস্থা করি, তবে স্বীকার করতে হয়, শরৎচন্দ্রের গদ্য-স্টাইল সার্থক, কারণ তা খুবই effective। এই অভিধার তাৎপর্য শরৎ-রচনায় ছড়িয়ে আছে। বোধ করি, গদ্যরচনার অন্বিষ্টও তা'ই।

২৬ | উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংবাদিক গদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-অধ্যায়ে। প্রসঙ্গটি পুনরায় স্মরণযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের হাতে গদ্যভাষা নমনীয়তা, ক্ষিপ্রচারিতা ও লঘুতার দ্বারা সর্বজনব্যবহারযোগ্যতা অর্জন করেছিল। সংবাদপত্রের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে তা শব্দের আভিধানিক অচলতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল, নিত্য নোতুন শব্দ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সর্বকার্যে ব্যবহারযোগ্যতা অর্জন করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক গদ্যভাষা আটপৌরে, তার চাল হাল্কা, গতি দ্রুত। একথা স্বীকার্য যে তা সাহিত্যগুণবর্জিত ও সমকালের সেবায় নিযুক্ত। সাহিত্যিক গদ্যের অব্যবহিত-পূর্ব স্তর এই সাংবাদিক গদ্য। ঈশ্বর গুপ্তের এই সাংবাদিক গদ্য বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক গদ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িকপত্র-সম্পাদনাকালে তাঁর সাহিত্যিক গদ্যকে ক্ষিপ্রচারী, লঘু ও কথ্যভঙ্গিম করে তুলেছিলেন। সাময়িকপত্র সম্পাদনার পরোক্ষ প্রভাব বঙ্কিম-গদ্যে লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্র-গদ্যে এরকম কোনো প্রভাব পড়ে নি। সাময়িকপত্র সম্পাদনা করলেও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বনে লিখিত গদ্যরচনায় সাংবাদিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বস্তুত রবীন্দ্র-গদ্য সকল অবস্থায় কবিত্বমণ্ডিত বলে তা অন্য প্রভাবকে অস্বীকার করেছিল। রবীন্দ্র-গদ্যে সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা এসেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে, সাময়িকপত্রসেবার থেকে নয়।

সেকালে একালে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রসেবার মধ্যে দিয়ে যে-সব গদ্যলেখক খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবীপ্রসন্ন

রায়চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনবিহারী গুপ্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কুমার সরকার, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সজনী কান্ত দাস, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, মাখনলাল সেন। এঁদের মধ্যে অনেকে সাহিত্যিকের বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছেন ; আবার অনেকে সাংবাদিক বলেই পরিচিত। শেষোক্তদেব হাতে বাংলা গদ্য যে উন্নতি ও গতি লাভ করেছে তা আমরা অনেক সময় স্মরণে রাখি না। অথচ গদ্যভাষায় যে প্রাণশক্তি, সাবলীলতা, ধাবৎশক্তি, ঔদার্য ও গ্রহিষ্ণুতা এঁরা দান করেছেন, তা কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

যে কোনো ভাষায় গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছতে গেলে সাংবাদিক ভাষার মধ্য দিয়ে, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সোপান উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হয়। সাহিত্যিক গদ্য একবার গঠিত হয়ে গেলেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না ; বারবার তাকে সাংবাদিক গদ্যের সংস্পর্শে আসতে হয়, কারণ এই সংস্পর্শে গদ্যসাহিত্যের শব্দসম্ভার বাড়ে, নমনীয়তা বাড়ে, সর্বকার্যে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে, সংসারের স্রোতের সঙ্গে সংযোগের ফলে জীবনীশক্তি বাড়ে।

'সাংবাদিকতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নয় সত্য, কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়"—শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর এই মন্তব্য (বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ভূমিকা) অবশ্যস্বীকার্য।

সাংবাদিকতায় যিনি তিরিশ বছর ব্যাপৃত ছিলেন, দেশসেবায় চরমতম বিপদের ঝুঁকি যিনি নিয়েছিলেন, বারো বছর (১৯০৯-২০) আন্দামানে নির্বাসনের অসহ্য যন্ত্রণা যিনি সহ্য করেছিলেন, অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবী-নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ৬ জুন ১৮৭৯, মৃত্যু ৪ এপ্রিল ১৯৫০) সাংবাদিক গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্যরচনার কিছু অংশ সাময়িকতার সীমা অতিক্রম করে সাহিত্যপংক্তিভুক্ত হয়েছে, একথা স্বীকার্য।

উপেন্দ্রনাথের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৯২১) ও 'উনপঞ্চাশী' (১৯২২) অবশ্যই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সাধু ও চলতি বাংলা গদ্য সাংবাদিকের কলম-গুণে কতটা সরস, উজ্জ্বল, আবেগস্পন্দী ও সচ্ছন্দগতি হতে পারে, তার উদাহরণ এই দুটি বই। উপেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে সংযুক্ত। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সাপ্তাহিক 'বিজলী' (১৯২০), চিত্তরঞ্জন দাসের মাসিক 'নারায়ণ' (১৯১৫ দৈনিক), 'স্বদেশ' (১৯২৩) প্রভৃতি বাংলা ও ফরোয়ার্ড, লিবার্টি, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি ইংরেজি দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের সঙ্গে (১৯২৬-৪০) যুক্ত ছিলেন। সাপ্তাহিক আত্মশক্তি (মার্চ ১৯২২), দৈনিক বাংলার কথা (১৯২৭) ও দৈনিক বসুমতীর (এপ্রিল ১৯৪৫ থেকে এপ্রিল ১৯৫০) সম্পাদক ছিলেন। যুগান্তর দলের মুখপত্র, ভূপেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক যুগান্তরে' (১৯০৬) তাঁর সংবাদপত্র-চর্চার হাতেখড়ি হয়।

স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাস আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জারদের কলহ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ও গান্ধিজীর দান, রাজনীতিক সংগ্রাম বনাম সামাজিক অনুদারতা, জাত্যভিমান ও ধর্মকলহ প্রভৃতি নানা সমকালীন বিষয় নিয়ে উপেন্দ্রনাথ বিজলী, নারায়ণ, আত্মশক্তি, স্বদেশ, বাংলার কথা ও বসুমতীতে তিরিশ বছর (১৯২০-৫০) লিখেছেন। এইসব লেখার কতকাংশ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, বাকি সাময়িকপত্রে ও সংবাদপত্রে থেকে গেছে। পূর্বোক্ত দুখানি গ্রন্থ ছাড়া উপেন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বইগুলি উল্লেখযোগ্য : সিন্ ফিন্, বর্তমান সমস্যা, অনন্তানন্দের পত্র, পথের সন্ধান, ধর্ম ও কর্ম, জাতের বিড়ম্বনা, স্বাধীন মানুষ।

উপেন্দ্রনাথ সাধু ও চলিত, দুই রীতিতেই লিখেছেন, দুটি থেকেই আপন কাজ পুরো আদায় করে নিয়েছেন। সাধু গদ্যভাষা কত উজ্জ্বল উপভোগ্য সরস লঘু হতে পারে, তা তিনি 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় দেখিয়েছেন। তাঁর সাধু গদ্যরীতির ছাঁচ কথ্যভঙ্গিম, চাল লঘু, গতি দ্রুত।

এই গ্রন্থ থেকে দুয়েকটি উদাহরণ চয়ন করি।

[১] বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারীন সেখানে নাই। সে কংগ্রেস উপলক্ষে সুরাত গিয়াছে। সুরাতে যে সেবার একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে, তা মেদিনীপুরের কন্‌ফারেন্সে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দুই

এক দিন পরে বারীন ফিরিয়া আসিল। সুরাতে নরম, গরম, অতি-গরম, সব রকম নেতারাই একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বারীন যাহা সার-সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা সে এক কথায় বলিয়া দিল—'চোর, বেটারা চোর'।

সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—'কেন? কেন? কেন?'

বারীন বলিল—'এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তারা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাংলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঁ ঢুঁ। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্ত্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু'একটা ছেলে একটু আধটু কাজ করবার চেষ্টা করছে, তাও কর্ত্তাদের লুকিয়ে, খুব কসে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।'

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়া আছেন; আর আজ এই সব ফক্কিকারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। [নির্বাসিতের আত্মকথা, ১৯২১]

দেশি-বিদেশি-তদ্ভব শব্দ ও প্রাদেশিক ইডিয়মকে লেখক নিপুণভাবে সাধুগদ্যের কাঠামোয় ভরে দিয়ে গদ্যে দীপ্তি ও গতি সঞ্চার করে দিয়েছেন।

[২] সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত, কয়জনেই বেশ গাহিতে পারিত; কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ—বড় একটা গাহিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত। গান বা পদ্য কস্মিনকালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতের সেই গানটার দুই এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল!
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি,
বীর-রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচল-ব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্ত-চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখন স্পর্শও করিতে পারিবে না। [তদেব]

তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত রীতির সমাসবদ্ধ পদযুক্ত সাধু বাংলা গদ্যে ওজস্বিতা, লাবণ্য ও গতি সঞ্চারের আশ্চর্য পরিচয় এখানে পাই। উদ্বেল ভাবাবেগকে কীভাবে শিল্পসংযমে বিধৃত করা যায়, তার উদাহরণ এই গদ্যাংশ।

[৩] 'প্রথম যখন ফিরিঙ্গি সভ্যতা এদেশে এসে আমাদের বাপ-পিতাম'র নাম দিলে ভুলিয়ে, তখন আমরা ইংরেজের মুখের দিকে দেখতুম আর ভাবতুম—হায়, হায়! ভগবান কি ভুল করেই আমাদের এ দেশে জন্ম দিয়েছেন। সে ভুল শোধরাবার জন্যে একদিকে যেমন আমরা সাবান মেখে, ঝামা ঘসে, র‍্যাঁদা বুলিয়ে চামড়টাকে কটা করবার চেষ্টায় ফিরতে লাগলুম, অপরদিকে তেমনি ইংরেজীতে হেসে, ইংরেজীতে কেসে, ইংরেজীতে স্বপন দেখে মনটাকেও যতদূর পারি ফিরিঙ্গি মার্কা করে তুলতে লাগলুম। আমরা যে ইংরেজ নই, এতে আমরা তখন মনে মনে বেশ একটু লজ্জিত। এইটেই হোলো তোমার সেকেলে কংগ্রেসী যুগের মনস্তত্ত্ব। আমাদের রাজনীতিক এটা তামস যুগ। যথাসাধ্য ইংরেজের মত হওয়া সত্ত্বেও যখন ইংরেজ আমাদের হাতে রাজপাট ছেড়ে দিলে না, তখন আমরা আরম্ভ করলুম আন্দোলন আর ক্রন্দোলন।'

'ক্রন্দোলন!—ওটা কি জিনিষ, পণ্ডিতজী?'

'আরে ওটা আর বুঝলে না, ক্রন্দন আর আন্দোলন একসঙ্গে জমাট বেঁধে গিয়ে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম ক্রন্দোলন। ওটার সারমর্ম হচ্চে এই—'বাবা ইংরেজ—তোমার চেয়ারের পাশে আমাদের একটু বসতে জায়গা দাও, বাবা! উঃ অত ঠেসে ধর কেন? আমাদের যে দম বেরিয়ে যাচ্ছে! আরে বাপ! অত দাঁত খিঁচুচ্চ কেন? দেখ না, আমরা লেখাপড়া শিখে প্রায় তোমার মত হয়েছি; একটু পাউডার মাখলে আর চেনবার জো নেই!' [ক্রন্দোলন, উনপঞ্চাশী, ১৯২২]

চলতি গদ্যভাষায় শাণিত ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এখানে ছিটকে বেরুচ্ছে।

কথোপকথনের ঢঙে এই বইটি লিখিত। সংলাপের ধর্ম পুরোমাত্রায় বজায় রেখে লেখক তর্কসংকুল রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করেছেন। এ ধরনের আলোচনায় প্রয়োজন শ্লেষ, বিরোধাভাস, বিষম অর্থালংকারের নিপুণ ব্যবহার ও শব্দকে ভেঙে চুরে দুমড়িয়ে নোতুন শব্দ উদ্ভাবন ও অপ্রত্যাশিত অর্থে প্রয়োগ দ্বারা চমক সৃষ্টি। লেখক যে তাতে সফল হয়েছেন তার পরিচয় আছে এই গদ্যাংশে।

[৪] সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোলদীঘির ধারে একজন প্রকাণ্ড স্বদেশী পাণ্ডার লেকচার শুনে খুব খানিকটা হৈ-চৈ করে বাসায় এসে খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়িছি। খোলা দোর জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না বিছানার উপর যেন ঢেউ খেলছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টেরও পাই নি। আধা রাতে হঠাৎ যেন বুকটা দুড়্‌দুড়্‌ করে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি মনটা আমার ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে। আঃ, সে কি কান্না! বুকটা যেন মুচড়ে মুচড়ে নিঙড়ে নিঙড়ে কথার ধারা ছুটছে। আমাকে জাগতে দেখে মন আমার খানিকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চুপ করলে। অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁরে, তোর কি হয়েছে বল্ না? কি কর্‌লে তুই সুখী হোস্?

আবার ফোঁপানি সুরু হলো।...... .

ছুট, ছুট, ছুট।—একেবারে ছুট্‌তে ছুট্‌তে তুর্কীস্থান, কাবুল, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ভেদ করে বাংলার মাটিতে ন্যাংটা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় তুমি আমার স্বপ্নের বাংলা?—কোথায় তুমি, মা! দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে তুমি একদিন বাঙ্গালী সাধকের মানস-পটে এঁকে উঠেছিলে, আর আজ দেখি সবাই আমারই মত জীর্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষত-বিক্ষত দেহ প্রাণ নিয়ে পরের পায়ে ধরনা দিয়ে পড়ে আছে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম মন আমার চোখ বুজে একেবারে চুপ হয়ে গেছে! শুধু অন্তর্যামিনীর পদপ্রান্তে তার কাতর প্রার্থনা উঠেছে—একবার, এসো মা, এসো মা! [মন আমার, উনপঞ্চাশী]

স্বদেশসাধনার আবেগ এই গদ্যাংশে শিল্পরূপ লাভ করেছে। গভীর আন্তরিকতা ও প্রবল মাতৃঅনুরাগ এখানে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু লেখক তাকে শিল্পসংযমে বেঁধেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, প্রাকৃত শব্দ ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া, বিশেষণের ব্যবহার যেমন আছে, তেমনি আছে তৎসম শব্দের ধ্বনিরোল। বঙ্কিমের কমলাকান্তের মাতৃবন্দনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় উপেন্দ্রনাথের মাতৃ-

বর্ণনা। সাধুভাষার বাক্‌পদ্ধতিকে ভেঙে মুখের ভাষার আদলে বাক্য-ও পদবিন্যাসের কৌশলটি এখানে অনুসৃত হয়েছে।

[৫] ওগো বৈশাখের রুদ্র দেবতা, আজ আমাদের সহস্র বৎসরের দিন গণনা শেষ করো। বসন্তের মলয়-হিল্লোল আজ বন্ধ হোক, দুগ্ধফেননিভ-বিলাস-শয্যা আজ কণ্টকময় হোক, স্নেহ-কাতর মন আজ তিক্ত হয়ে উঠুক, করুণ-অশ্রু আজ চোখের কোণে শুকিয়ে যাক, মায়া-মমতার বন্ধন আজ বিষধরের মত আমাদের দংশন করুক।

আজ বাঙ্গালীর বুক ভরে তোমার প্রলয় বিষাণ বেজে উঠুক। বজ্রের মত কর্কশ স্বরে আজ তুমি জানিয়ে দাও যে মরণই সত্য, যন্ত্রণাই সত্য, দুঃখই সত্য, কারাগারই সত্য, ধ্বংসই সত্য, হলদিঘাটই সত্য, পাণিপথই সত্য, জালিয়ানওয়ালাবাগ সত্য, চৌরিচৌরা সত্য। আজ বাঙ্গালার শ্মশান জুড়ে—'ভীম রুদ্র তালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ।' [নববর্ষ, স্বাধীন মানুষ]

প্রথম অনুচ্ছেদে যুগ্ম শব্দের ও চলতি ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের দ্বারা হ্রস্ব বাক্যনিচয়কে একটি দীর্ঘ বাক্যের আধারে সাজানো হয়েছে, অথচ লঘু গতি নষ্ট হয় নি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে একটি ক্রিয়াপদের অধীনে নয়টি বিধেয় পদকে আনা হয়েছে একই বাক্যের আধারে। তার ফলে এখানেও এসেছে লঘুতা।

গদ্যশিল্পী উপেন্দ্রনাথ আপন কীর্তির দ্বারাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

২৫ | রাজশেখর বসু

বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম একটি দ্বিতীয়রহিত নাম। তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যজগৎকে সচকিত করে তোলেন। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। সেদিন থেকে পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি বাংলা সাহিত্যে স্বনামে ও ছদ্মনামে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। গ্রন্থকাররূপে তাঁর আবির্ভাব 'গড্ডলিকা' গল্প সংকলন (১৯২৪) নিয়ে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে চমকের সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

"সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি, আশ্চর্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাওরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।"

তাঁর আসল নাম রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। স্বনামে ও ছদ্মনামে তিনি বিশখানি বই লেখেন। পরশুরামের বই: গড্ডলিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৮), হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প (১৯৩৭), গল্পকল্প (১৯৫০), ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প (১৯৫২), কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (১৯৫৩), নীলতারা ইত্যাদি গল্প (১৯৫৬), আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প (১৯৫৭), চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প (১৯৫৮)।

রাজশেখর বসুর বই: চলন্তিকা (অভিধান, ১৯৩০), লঘুগুরু (১৯৩৯), কুটিরশিল্প (১৯৪৩), কালিদাসের মেঘদূত (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, ১৯৪৩), ভারতের খনিজ (১৯৪৩), বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ, ১৯৪৬), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত (সারানুবাদ, ১৯৪৯), হিতোপদেশের গল্প (চুম্বকানুবাদ, ১৯৫০), বিচিন্তা (১৯৫৫), চলচ্চিন্তা (১৯৫৮)।

কি গল্প প্রবন্ধ রচনায়, কি অভিধান পরিভাষা সংকলনে, কি ক্লাসিকের

সারানুবাদে রাজশেখর বসু অতন্দ্র ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে গেছেন। পঁয়ত্রিশ বৎসরের সাহিত্যজীবনে মাত্র এক শ' গল্প লিখেছেন, কয়েকটি ক্লাসিকের সারানুবাদ করেছেন এবং অভিধান ও পরিভাষা সংকলন করেছেন। সাহিত্য-জীবনের এই সংযম তাঁর জীবনেরও মূল কথা। সংযম, শুচিতা ও বিনয়—তিনটি মন্ত্র রাজশেখর অবলম্বন করেছিলেন। ভাষার সংযম, শুচিতা ও বিনয় (ডিসিপ্লিন) তাঁর রচনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে তিনি একটি স্বতন্ত্র গদ্য-স্টাইল সৃষ্টি করেছেন। এই স্টাইলের ভিত্তিভূমি মাত্রাজ্ঞান ও সুবুদ্ধি (কমন সেন্স), বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি (ডিট্যাচমেণ্ট ও ইম্পার্সন্যালিটি), বিনয় (ডিসিপ্লিন) ও বিন্যাসশৃঙ্খলা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন-রসরসিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অতিসূক্ষ্ম সুমার্জিত রসবোধ। তিনি ব্যবহার করেছেন তিনটি আয়ুধ—হিউমর, উইট, আয়রনি। এই তিনের সহযোগে পরশুরামের গল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে। অলংকার শাস্ত্রোক্ত শুভ্রবর্ণ কৌতুকরসে তাঁর ছিল অনায়াস অধিকার, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল প্রখর মাত্রাজ্ঞান, পরিমাণবোধ ও সুবুদ্ধি। রাজশেখর বসুর গদ্যরীতির উৎস এই প্রখর ব্যক্তিত্ব।

রাজশেখর বসুর গদ্যরীতির অন্তরালে বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানচেতনা, মাত্রাজ্ঞান ও সুবুদ্ধি ক্রিয়াশীল। সেকারণেই তাঁর গদ্যে উচ্ছ্বাস ও ভাবাতিরেকের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখায় আছে স্মিত কৌতুকহাস্য। এই হাসির অন্তরালে ক্রিয়াশীল যে চিত্তবৃত্তি, তা কঠোর সংযম ও বিনয়ে বাঁধা। "তাঁর রচনা পডতে পড়তে মনে হয়, আজকালকার এক বিখ্যাত ফরাসী লেখকের উক্তির ঝলক যেন তাঁর চোখের কোণে কৌতুক-স্মিতের মত স্থির-চপলা রূপে বিরাজ করছে; বিচারের সংযম দিয়ে যারা উদ্দাম বিশ্বাসকে পরিচালিত করতে চায়, তারা তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নিজেদেরই চিত্তবৃত্তির প্রতিস্পন্দন পেয়ে পুলকিত হচ্ছে: J'ai passe l'age heureux ou on admire les choses qu'on ne comprend pas. J'aime la lumiere—'আমি সেই সদানন্দ বয়স কাটিয়ে উঠেছি যে বয়সে লোকে যে-সব জিনিস বুঝতে পারে না তাই নিয়ে মাতামাতি করে। আমি আলো পছন্দ করি।'" [ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুবুদ্ধিবিলাস রাজশেখর, 'কথাসাহিত্য', রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা]

রাজশেখর বসুর সকল রচনায় স্মিত-কৌতুকহাসি আর বিচারশীল

শুভবুদ্ধির আলো পড়েছে। তাই তাঁর গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—স্বচ্ছতা আর মাত্রাজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি (ক্ল্যারিটি আর স্যানিটি)।

রাজশেখরের স্টাইলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সহৃদয় সর্বজ্ঞর বিশ্বমানবিকতা (আবৃধ্যানিটি)। জ্ঞাননিষ্ঠ সমীক্ষা আর উদার স্বাধীন চিত্তের চিন্তা এই বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে ক্রিয়াশীল। একালের বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারশীলতা তাঁর গদ্যরীতির সঙ্গে মিশে আছে।

তাঁর স্টাইলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—সংযত রসিকতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংযম রসিকতার প্রাণ (ব্রেভিটি ইজ দি সোল্ অফ উইট)। গা-ঢেলে দেওয়া ফুর্তি (গ্যেইটি) তাঁর লেখায় নেই, আছে সূক্ষ্ম শাণিত উইট আর আয়রনির ব্যবহার।

রাজশেখর বসু ছিলেন অভিধান-সংকলিতা ও শাব্দিক। চলন্তিকা অভিধান তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। শাস্ত্রাধিকারী বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আর কেউ অভিধান প্রণয়ন ও পরিভাষা সংকলন করতে পারেন না। কারণ শব্দ-নির্বাচনে, শব্দের অর্থ-নির্দেশে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অর্থের বিবর্তন প্রকাশে যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তির আবশ্যকতা, তা বিজ্ঞানী ছাড়া সাধারণ লেখকের পক্ষে দুরধিগম্য। রাজশেখর বসুর সেই বিরল যোগ্যতা ছিল। তাঁর রচনায় তার ছাপ পড়েছে—শব্দ-ব্যবহারে ও নির্বাচনে তিনি বিশেষ সতর্ক ও যত্নবান। এটাই তাঁর স্টাইলের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।

রাজশেখর বসুর স্টাইলের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—অব্যর্থতা ও স্মরণীয়তা। ভারত-চন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বাক্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে, জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। স্মরণীয় উক্তির রচয়িতা রূপে তাঁরা স্মরণীয় লেখকপদে বৃত হয়েছেন। পরশুরামের অনেক বাক্যই স্মরণীয় উক্তি বা প্রবাদে পরিণত হয়ে তাঁর রচনাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

এখানে কয়েকটি উল্লেখ করি। চিকিৎসাসংকটের কবিরাজের উক্তি 'হয়, কিন্তু Zানৃতি পারো না', 'এংগ্লো-মোগলাই কেফ'-এর 'ডবল-ডিমের রাধাবল্লভী আর মুর্গির ফ্রেঞ্চ মালপো', 'চ্যাম্পিয়ন ওয়ানেগার', চলচ্চিত্র 'লুটে মিল মন', 'মার্গিতব্য', 'লড়কে লেঙ্গে ঝুমঝুম্মা', 'প্রভু, আপ হিন্দীমেঁ বোলিয়ে, রামরাজ্যকী ভাষা', 'গো-হিতায় গোভির্গবাং শাসনম্', বাবু গণ্ডেরী-রাম বাটপারিয়ার 'কুছ্ভি নেহি, কুছ্ভি নেহি', ইটের পাঁজার বক্সির 'সব বজ্জকী তমসুক দাদা', কারিয়া পিরেতের 'ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্লুকে বিটিয়া',

মিস্টার সেনের 'মাই ঘড্', বালখিল্যদের 'রে রে রে রে', ক্যাদার চাটুজ্জের 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক', নকুড় মামার 'ছ্যাঃ, এই তোমাদের দার্জিলিং', শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর কোম্পানির অপূর্ব অভিধা 'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনারেল মার্চেন্টস', নন্দবাবুর বন্ধু নিধুর 'তোমার পয়হার অভাব কি বাওয়া? একটু ফুর্তি করতে শেখ', বৌ-অন্তপ্রাণ উদয় ওরফে উদোর 'আমার বউয়ের বিনুনীটাই তো তিন ফুট হবে। তাহলে কি বলতে চাও বউ আট ফুট লম্বা?'—এইসব উক্তি একালের বাঙালিসমাজে প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর পর আমাদের কালে রাজশেখর বসু একমাত্র গদ্যলেখক যিনি আমাদের চিন্তা ও ভাষাকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত করেছেন। তিনি বরাবরই চলিত ভাষার পক্ষে। তাঁর বড়ো কৃতিত্ব এই যে, চলিত বাংলার ভিতর থেকে এক নোতুন শক্তি আবিষ্কার ও আহরণ করেছেন। এই ভাষার ভিত্তিভূমি যুক্তি ও বিচার। লঘু ও গুরু বিষয়ে সমান সাফল্যের সঙ্গে এই চলিত ভাষাকে রাজশেখর ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষার দ্যোতনা ও ইঙ্গিত অসাধারণ, প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত, প্রতিটি বাক্য ভাবগর্ভ। অল্প কথায় তিনি বিস্তর কথা বলেন, সামান্য ইঙ্গিতে অনেকটা ভাবকে ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, সাহিত্যজীবনে তারই প্রতিফলন হয়েছে, সেখানে তিনি মিতবাক্ সুবুদ্ধিশীল মননশীল কৌতুকশিল্পী। তাঁর ভাষায় এই পরিচয় পাই।

চলিত ভাষা নিয়ে রাজশেখর যে আলোচনা করেছেন তা নানাদিক থেকে মূল্যবান। কেবল তাঁর গদ্যরীতি নয়, সেইসঙ্গে একালের বাঙালির বাক্‌রীতির পরিচয়ও আমরা এই আলোচনা ('সাধু ও চলিত ভাষা' প্রবন্ধ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, লঘুগুরু) থেকে পাই।

চলিত ভাষায় রূপান্তর আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একটি সত্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, গদ্যরীতির বিবর্তন আলোচনা কালে তা স্মরণযোগ্য :

"কোনও ব্যক্তি বা বিদ্বৎসংঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হতে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গড়ে

না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হতে পারে। অতএব সাধু আর চলিত ভাষার সমস্যায় হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই।"

রাজশেখর বসু এই সত্যের পটভূমিতে সাধু ও চলিত ভাষার রূপ ও প্রকৃতি বিচার করেছেন। সবুজপত্র থেকে শুরু করে ত্রৈমাসিক পরিচয় পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ (১৯১৪-৩৪ খৃ) যে বিতর্ক চলেছে, তার কোনো মীমাংসা হয় নি। সাধু ভাষারীতির সমর্থক ও চলিত ভাষারীতির সমর্থকদের মধ্যে কোনো আপোষ-রফা হয় নি। রাজশেখর বসু এই বিতর্কের প্রসঙ্গ থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। গোড়াতেই তিনি আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করেছেন। চলিত ভাষার দুই রূপ—মৌখিক ও লৈখিক—এ দুই এক নয়। আমাদের তর্ক লৈখিক চলিত ভাষা নিয়ে, মৌখিক ভাষা নিয়ে নয়—এটা আমরা সব সময় মনে রাখি না বলেই বিতর্কে ভ্রান্তি বেড়ে চলে, কমে না। রাজশেখর বসু বলেছেন:

"একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিত ভাষা আর পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষা সর্বাংশে সমান। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিকভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিকভাষা দেখে অর্থাৎ প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই তার সর্বস্ব। লৈখিকভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষা সর্বসাধারণের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হ'ক!"

এই প্রস্থানভূমি থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। সাধু ও চলিত ভাষায় অধুনা যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার লক্ষণাবলী বিচার করে তিনি যেসকল ভেদাভেদ লক্ষ্য করেছেন, তা সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন। এই সূত্রাবলী বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানত—সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন।'

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্বনাম কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিকরূপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা,

শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধু-ভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্বনাম আর ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা' চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এইরকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান পেয়েছে। 'আজিকালি, চাউল, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, একচেটে, লতানে' চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ। কিন্তু সাধারণত চলিত ভাষায় কিছু কম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফারসী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিত ভাষায় কিছু বেশী দেখা যায়। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিকরূপ চলিত ভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সে সকল শব্দের মূল রূপ চলিত ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়। যথা—'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

সাহিত্যের চলিত ভাষা আসলে লৈখিক ভাষা, আমরা এই সত্য বিস্মৃত হতে পারি না, একথা রাজশেখর বসু জোর দিয়ে বলেছেন। "লৈখিক ভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিক ভাষা হ'তে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য। মোট কথা, চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হ'তে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়।"

আজ থেকে চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে রাজশেখর বসু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। আজও এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। চলিত ভাষার নামে ভাষায় স্বৈরাচার তিনি সমর্থন করেন নি, আবার সাধুভাষা গুরু চিন্তার দ্বিতীয়-রহিত বাহন—এই মতকেও সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, "এমন লৈখিক

ভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিত জনের মৌখিক ভাষা দুই-এরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিত ভাষার লেখকরা একটু অবহিত হলেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে সব রকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।"

রাজশেখর বসুর এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে মার্জিত চলিত ভাষার পক্ষপাতী। এ'কথা স্মর্তব্য যে যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে —চলিত ভাষায় লেখা দুটি অসাধারণ গল্পগ্রন্থ গড্ডলিকা ও কজ্জলী, আর দ্বিতীয়রহিত অভিধান চলন্তিকা—তাতে শব্দ নির্বাচনে, শব্দের অর্থ-নির্দেশে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অর্থের বিবর্তন প্রকাশে ও পরিভাষা বা সংক্ষেপার্থ শব্দ সৃষ্টিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন নিয়তক্রিয়াশীল।

মার্জিত লৈখিক চলিত ভাষাব রূপ ও প্রকৃতি বিচার করে তিনি যে প্রস্তাব সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেছেন, তার প্রয়োজন আজও রয়েছে।

"(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজি ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছু-মাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হ'ক।

(৩) অন্যান্য অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হ'ক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হ'ক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওয়া হ'ক,—যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠোন, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠান, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিত ভাষায় অচল নয়—অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিত ভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ

নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধুভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '........ হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দু-দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবি পরতে হয়। এই রকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে—চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিত ভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।"

সূত্রাকারে নিবদ্ধ এই বক্তব্য মারফৎ লৈখিক চলিত ভাষা সম্পর্কে রাজশেখর বসুর অভিমত আমরা পাই। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি এই বক্তব্যের অনুসরণ করেছেন। এই অভিমত প্রকাশের এক যুগ পরেও তিনি এ কথাই সমর্থন করেছেন ('বাংলা বানান' প্রবন্ধ, ১৩৫১, লঘু গুরু)—তা স্মরণযোগ্য:

"চলিতভাষা এবং কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা সমান নয়, যদিও দু-এর মধ্যে কতকটা মিল আছে। লোকে লেখবার সময় যত সতর্ক হয় কথা বলবার সময় তত হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান। লেখার ভাষা, বিশেষত সাহিত্যের ভাষা কোনও জেলার মধ্যে আবদ্ধ হ'লে চলে না, তার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। এজন্য চলিত ভাষাকে সাধুভাষার তুল্যই নিরূপিত বা standardized হ'তে হবে। মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লেখার বা সাহিত্যের ভাষা প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সাহিত্যের ভাষা সর্বজনীন, তার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হলেও ক্ষতি হয় না। চলিতভাষা সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং তার বানান অবহেলার বিষয় নয়।"

গদ্যভাষা ও চলিতভাষার লৈখিক রূপ সম্পর্কে রাজশেখর বসুর এই অভিমতের সমর্থন এখন তাঁর রচনায় অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানে আছে

আনন্দ, কারণ পদে পদে তা উপভোগের দ্বারা পুরস্কৃত হয়। এই উপভোগের মাধ্যমে রাজশেখরের গদ্যরীতির সামগ্রিক চিত্রটিও পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

রাজশেখর বসুর কৌতুকরস শব্দক্রীড়া বা শব্দের মার প্যাঁচের উপর নির্ভর করে না। তা বুদ্ধিগ্রাহ্য, সহজ বোধ্য, মননজাত। আমাদের জীবনের বহু সুলভ ভ্রান্তি ও অহমিকার উপর তাঁর বিজ্ঞানী মনের আলো পড়েছে, তাদের ফাঁকি ধরা পড়েছে। মানবিক দৌর্বল্যের প্রতি তাঁর বিদ্বেষবিহীন পরিহাস ও সহনশীলতা তাঁর রচনায় দেখা যায়। তাই তাঁর ভাষা বিদ্রূপে নিষ্ঠুর আক্রমণে নির্মম, উষ্মায় উত্তপ্ত নয়। তা পরিহাসস্নিগ্ধ, কোমল ও সংযত।

তাঁর ভাষার এই সকল গুণ প্রথম দিকের গল্পগুলিতে অনায়াসলক্ষণীয়।

[১] এই কেদার চাটুর্য্যেকে সাপে তাড়া করেচে, বাঘে পিছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ-কোর্টের উকিল জেরা করেচে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো ঘটে নি। বছর ষাট বয়েস, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ ক'বে লজ্জা এসে আমায় আকর্ণ বেগনি করে দিলে। থাকতে না পেরে বল্লুম—মেম সাব, কেয়া দেকতা ? (স্বয়ম্বরা, গড্ডলিকা)

[২] বাংলার নদ-নদী ঝোপ-ঝাড, পল্লী-কুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম্, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner Sir, at Shikohabad ? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু পাশে আকের ক্ষেত স্রোতেব মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান বনানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই

কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লকড়ে চাকার ঠোকরে ঝিঝিরে ডাণ্ডাব ঝঞ্ঝমাঝ্‌ মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্‌ অস্ত্‌, ওয়া হমীন্‌ অস্ত্‌। (কচি-সংসদ, কজ্জলী)

[৩] এই নূতন বস্তুর (ঘনীকৃত তৈল) ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইওরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—'vegetable product' বা 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ'। ব্যবসায়িগণ প্রচার করলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—বনস্পতি বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতেব জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্বি ভেজাল দিবার দরকার হয় না, বনস্পতি-মার্কা মিশালেই চলে। সুদূর পল্লীতে অনেক গোয়ালার ঘরে খোঁজ করিলে এই জিনিসের টিন মিলিবে। ঘি ভেজালের প্রথম পর্ব এখন গোয়ালার ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। ('ঘনীকৃত তৈল', ১৩৩৭, লঘুগুরু)

[৪] তারপর অসিতনয়না কৃষ্ণা তাঁর সুবাসিত সুন্দর বক্রাগ্র মহাভুজঙ্গ-সদৃশ বেণী বাম হস্তে ধ'রে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি যখন সন্ধির কথা বলবে তখন আমার এই বেণী স্মরণ ক'রো—যা দুঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীমার্জুন যদি সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পুত্রগণ কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, অভিমন্যুকে অগ্রবর্তী ক'রে আমার পাঁচ বীর পুত্রও যুদ্ধ করবে, দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলিলুণ্ঠিত না দেখি তবে আমার হৃদয় কি ক'রে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত অগ্নির

ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে আমি তের বৎসর কাটিয়েছি, এখন ধর্মভীরু ভীমের শান্ত বাক্য শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত ক'রে কম্পিত দেহে গদ্গদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। (মহাভারত সারানুবাদ, ১৯৪৯)

[৫] চণ্ডোদরী তার শূল ঘুরিয়ে বললে, আমার সাধ হচ্ছে এর যকৃৎ প্লীহা বক্ষ মুণ্ড সমস্তই খাই। প্রঘসা বললে, আমরা একে গলা টিপে মারব। অজামুখী বললে, বিবাদের প্রয়োজন কি, এস আমরা সবাই এর মাংস ভাগ করে খাই। শূর্পনখা বললে, আমারও সেই মত,—

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী ॥

মানুষং মাংসমাসাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্। (২৪/৪৪-৪৫)

—সর্বশোকবিনাশিনী সুরা শীঘ্র নিয়ে এস, মানুষের মাংস খেয়ে নিকুম্ভিলার কাছে নাচব।

শোকে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে সীতা বিলাপ করতে লাগলেন—আমার হৃদয় লৌহনির্মিত অজর অমর, তাই এত দুঃখেও বিদীর্ণ হচ্ছে না। ধিক, আমি অনার্য অসতী, সেজন্য রামের বিরহেও এই পাপজীবন ধারণ ক'রে আছি। রাক্ষসীগণ, কেন প্রলাপ বকছ, ছিন্ন ভিন্ন বা দগ্ধ করলেও আমি রাবণের কথা শুনব না। আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি জানলেই রাম এই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন, রাক্ষসীরা অনাথা হয়ে গৃহে গৃহে আমার মতই রোদন করবে। (রামায়ণ সারানুবাদ, ১৯৪৬)

[৬] সকাল বেলা হংসেশ্বর বললেন, দেখ বংশী, রাজমহিষীকে খাওয়াবার সময় তুমি আমার পিছনে থেকে প্রম্‌ট করবে, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে গুঁতিয়ে দেবে না। আর একটা কথা—শুধু তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ থাকলে আমি গাইতে পারব না।

বংশীধর বলল, ঠিক আছে, অন্য কারও থাকবার দরকারই নেই।

দু বালতি রাজভোগ বংশীধর রাজমহিষীর জন্যে বয়ে নিয়ে গেল, হংসেশ্বর তা গামলায় ঢেলে দিলেন। বংশীধর পিছনে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এইবার গানটা ধরুন।

মোষের পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে হংসেশ্বর মধুর স্বরে বললেন, লক্ষ্মী সোনা আমার, পেট ভরে খাও, নইলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন, দুধ আসবে কেন, সেই মুলতানীটা যে তোমাকে হারিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ হুঁ—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে—

ঘোষ ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বংশীধর ফিসফিস করে বলল, থামবেন না কাকাবাবু, বেশ দরদ দিয়ে বারবার গাইতে থাকুন, শেষ লাইনের সুরে ভুল করবেন না, ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয় ঝমে ঝমে ঝঁয়—নিনি ধাপ্‌পা পা মা মাগ্‌গা গা রে সা।

তাল মান-লয় ঠিক রেখে হংসেশ্বর তিনবার গানটা শেষ করলেন, তারপর চতুর্থবার ধরলেন—সোনামুখী রাজভঁইসী ইত্যাদি।

সহসা ঘোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তারপর সেই নির্জন প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠল—চবৎ চবৎ চবৎ। রাজ-মহিষী ভোজন করছেন। (রাজমহিষী, আনন্দীবাঈ)

এই ছয়টি উদাহরণ থেকেই রাজশেখর বসুর গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম উদাহরণ চলিত ভাষায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধু ভাষায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চলিত ভাষায় লিখিত। প্রথম উদাহরণে মৌখিক ভাষার লৈখিক রূপটি পাই; এখানে মৌখিক ভাষার ভিত্তি সাধু ভাষার কাঠামো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণ—সাধু ভাষার দুটি স্বতন্ত্র রূপ। দ্বিতীয় উদাহরণের মেজাজ মৌখিক ভাষার; এর আয়রনি ও শ্লেষ আপাতগাম্ভীর্যের অন্তরালবর্তী কৌতুককে প্রকাশ করছে; অভ্যস্ত প্রকৃতি-বর্ণনা এখানে বিপর্যস্ত হয়ে এক নোতুন উপভোগ্যতা পেয়েছে। তৃতীয় উদাহরণের সাধু ভাষা বিষয়গুরুত্ব-নির্ভর। বিজ্ঞান-বিষয়কে সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করার কৌশলটি এখানে লক্ষণীয়। জাতিচরিত্রের প্রতি তির্যক কটাক্ষ এই বর্ণনা উপভোগ্য করে তুলেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণ যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণের সারা-নুবাদ। মার্জিত লৈখিক ভাষা সম্পর্কে সূত্রাকারে যে প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেছেন, তারই সমর্থন এখানে পাই। পূর্বধৃত ষষ্ঠ সূত্রটি এখানে পুনঃস্মর্তব্য। এই দুই উদাহরণ তারই জোরালো সমর্থন। চলিত ভাষা যে বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী কঠিন হতে পারে এবং গুরু ভারবহনে সমর্থ, রাজশেখর এই দুই উদাহরণে তা প্রমাণ করেছেন। ষষ্ঠ উদাহরণ তাঁর শেষের দিকে লেখা গল্পের নমুনা, চলিত ভাষার ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্যের প্রমাণস্থল। এই গদ্যরীতি প্যাঁচালো বা ঘোরালো নয়, পদান্বয়ে জটিলতা নেই, আঞ্চলিক উপভাষার

ইতরতা নেই; আছে বাকসংযম, শব্দপ্রয়োগে সতর্কতা ও সচেতনতা। এরই মধ্য দিয়ে কৌতুক উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ উদাহরণ— তিনটি গল্প থেকে আহৃত। তিনটি ক্ষেত্রেই কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার কৌশল ও প্রকৃতি এক নয়। এখানেই রাজশেখর বসুর শিল্পনৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিধান ও পরিভাষা সংকলনে রাজশেখরের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই বলেছি। বিজ্ঞানী শাব্দিক রাজশেখর শব্দ নির্মাণ ও প্রয়োগে, বানানের সামঞ্জস্যসাধনে শব্দের অর্থনির্দেশে ও সংক্ষেপার্থ শব্দ (পরিভাষা) সৃষ্টিতে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে।

প্রাচীন কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপাল ও তাঁর পুত্র মহীপালের সভাকবি পণ্ডিত রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটক এবং বালরামায়ণ ও বালমহাভারত (রামায়ণ ও মহাভারতের নবরূপ) নাটক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতের বদলে প্রাকৃত ভাষায় কাব্য নাটক রচনা করেন। কাব্যরসবিচার-বিষয়ে কাব্যমীমাংসা নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি সাহিত্যিক জীবনে বিনয় অর্থাৎ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমশৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। একালের বিজ্ঞানী রাজশেখর বসু সাহিত্যিক জীবনে সাধুভাষার বদলে মার্জিত চলিত ভাষাকে মান দিয়েছিলেন, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও সুবুদ্ধি আশ্রয় করেছিলেন, বিনয় ও সংযম থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। রাজশেখর বসু আধুনিক বাংলা গদ্যের এমন একজন শিল্পী যিনি নিয়ত আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মসংশোধনে নিরত ছিলেন, যাঁর লেখা ও জীবনের মূল মন্ত্র সংযত শৃঙ্খলাশ্রী। তাঁর সাহিত্যসাধনা আমাদের সাহিত্যকর্মের নানা অসংযম ও বিশৃঙ্খলা পরিহার করতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

২৮ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ত্রৈমাসিক পরিচয় (১৯৩১) পত্রিকার সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম স্বতন্ত্র কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) গদ্যশিল্পীরূপে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তার মূল্য সম্পর্কে আমরা আজো অবহিত নই। তাঁর গদ্যরচনা দুটি গ্রন্থে সংকলিত : 'স্বগত' (১৯৩৮ | ২য় সংস্করণ ১৯৫৭), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। বস্তুত আমাদের চেনাকালে যাঁরা গদ্য সম্পর্কে শিল্পসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন ও ক্লান্তিহীন পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধারূপে সুধীন্দ্রনাথের নাম অবশ্যউল্লেখ্য।

নিজস্ব গদ্য সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ প্রথমেই স্মরণযোগ্য :

"আমার পূর্বতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল ; এবং সেজন্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। অর্থাৎ 'স্বগত'-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্য সত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ ; এবং আপন ভুল ভ্রান্তির উচ্ছেদ সে তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় বলে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে ; এবং ফরাসী সমালোচকদের মতে রীতি আর রচয়িতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্বোপলব্ধির বিবাদ। তার পর শিল্পী যে-শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠাই তার উপজীব্য ; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্য নামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি।" ['পুনশ্চ', ১৮ জুন ১৯৫৬, স্বগত, ২য় সং]

সুধীন্দ্রীয় গদ্যরীতির প্রকৃতি এখানে আভাসিত। এই নির্মোহ আত্মবীক্ষা-মূলক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে তিনি যে অর্থবহ মন্তব্য করেছেন, তা গোড়াতেই উদ্ধারযোগ্য :

"অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণবিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের দোষে অর্থের নিপাতন ইত্যাদির সংশোধন 'স্বগত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নেহাৎ নগণ্য নয় ; এবং কোথাও কোথাও অদল-বদল আরও ব্যাপক। কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মধিক্কারেও

কাটেনি; এবং তির্যক রীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের ভার সয় না, পরিবর্তনের ইঙ্গিতে সে অভিপ্রায়ের বোঝা ছত্রাকারে ছড়িয়ে, চলার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে আমার উৎকট গতি জ্ঞানত কোনও বিদেশীর পদানুসরণ থেকে উৎপন্ন নয়; এবং শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরাজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারি নি, যদিচ আমার কয়েকটা কবিতা অনুরূপ রূপান্তর অল্পাধিক মেনেছে। সুতরাং আমার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় ভাব ও ভাষা যমজ; এবং আমার কাব্য কদাচিৎ সার্বজনীন আবেগের প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, আমার প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বরূপে দ্বন্দ্ববিমুখ ধারণা, আর্যসত্যের প্রতি নির্বোধ পক্ষপাত, এমন কি কবিদের বিষয়ে দুর্মর ভাববিলাস—এ সমস্তের উদ্ভব স্বদেশী কৈবল্যের অনির্বচনীয় নিবিরোধে।"

আপন গদ্যভাষার চারিত্র্য-বিচারে সুধীন্দ্রনাথের নির্মোহ দৃষ্টি আমাদের স্বভাবতই চমকিত করে। এখান থেকেই আমরা সুধীন্দ্র-গদ্যের উপাদান সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। তাঁর চিন্তাপ্রণালী ও গদ্যভাষা একান্তভাবেই বঙ্গীয়—এটা জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। ইচ্ছে করলেই তাঁর প্রবন্ধের বাক্যগুলিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায় না, তাও বলেছেন; উপরন্তু আপনি ভাষারীতিকে সংস্কৃতবহুল গৌডীরীতি আখ্যা দিয়েছেন। আপন গদ্যে রূপ অপেক্ষা রীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। এ রীতিকে বলেছেন তির্যক রীতি। 'জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাসের' কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ কবুল করেছেন।

এই প্রবন্ধে আরো একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন সুধীন্দ্রনাথ:

"যে ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল।" এই সত্যের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছেন এবং একেই তাঁর অন্বিষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন। প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁর পক্ষপাত এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

সুধীন্দ্রীয় গদ্য সম্পর্কে আর একটি দিক বিচার্য। সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চেয়েছিলেন। অবশ্যই সুধীন্দ্রনাথ তার পথিকৃৎ নন। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সাধু গদ্যের কৃত্রিম শুদ্ধি থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, ও

প্রমথ চৌধুরী গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচর্চার প্রয়াস করেছিলেন, যদিচ তা সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ীভূত হয় নি। সজ্ঞান প্রয়াস করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ এই পথেই তাঁর চলবার সংকেত পেলেন। 'সংবর্ত' (১৯৫৩) কাব্যের ভূমিকায় তারই সবিনয় স্বীকৃতি: "বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।"

সাহিত্য ও ব্যক্তিজীবনের শেষে উপনীত হয়ে নিজস্ব পদ্যরীতি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ কবুল করেছিলেন, "গত কয়েক বছর ধরে আমার প্রাক্কালীন পদ্য আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে। উক্তি ও উপলব্ধির অনৈক্য, চিত্রকল্পের পরিবর্তে কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার, ভাষার সুবিধাবাদী বিকার, ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাব্যের যত উপসর্গ সব কটাই আমার পুরাতন লেখায় বর্তমান।" ('পুনশ্চ' প্রবন্ধ, ১৮ জুন ১৯৫৬, স্বগত, ২য় সং)

সুধীন্দ্রীয় গদ্য ও কবিতার বিশিষ্টরূপ সম্পর্কে বাঙালি পাঠক এযাবৎ সচেতন নয় বলেই সুধীন্দ্র-গদ্যরীতির শিল্পমূল্য সম্পর্কে আমরা আজো উদাসীন। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বাধা অপনীত হলেই সুধীন্দ্র-গদ্যের শিল্পরূপ ও ঐতিহ্যানু-স্মৃতি আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি।

সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাহিত্যতীর্থ গদ্য-পদ্যের সঙ্গমস্থল'। এলিঅট গদ্য-পদ্যের যে ঐক্যবোধ লক্ষ্য করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাকে বাংলাসাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন।

এলিঅট একদা বলেছিলেন, কবিরা স্বভাবত গদ্যের সুলেখক। তাঁর মতে, গদ্যরচনায় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে শিল্পচর্চা প্রকারভেদের মুখাপেক্ষী নয়। কবি যখন গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরলবাহন হিসেবে তিনি গদ্যকে গ্রহণ করেন না, তার মধ্যে কাব্যশোভন লাবণ্যের আবিষ্করণে যত্নশীল হন। এবং তা থেকেই প্রমাণ হয় যে গদ্য পদ্য আসলে একই উৎসজাত, গদ্যচর্চাও শিল্পচর্চা। এর প্রথম সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করি শেক্সপীঅরের সনেটে। গদ্য পদ্য পরস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং একে অন্যের পরিপুষ্টি সাধন করে, শেক্সপীঅরের শিল্পস্বভাবে তা ধরা পড়লো। তাঁর সনেটগুচ্ছ তার প্রমাণ।

আজো ভারতীয় সমাজজীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম যেমন দৃঢ়ভিত্তিক, আমাদের সাহিত্যসমাজে গদ্য-পদ্যের বর্ণাশ্রম তেমনি দুরপনেয় হয়ে আছে। কয়েকটি সুলভ ভ্রান্তি আজো আমাদের পরিচালিত করে, যেমন,—কবিতা বলতে সমিল কবিতার অনন্য সমাদর, শব্দ ব্যবহারের ও বিন্যাসপদ্ধতির প্রতি বিমুখতা, মাত্রাবিন্যাসই গদ্যপদ্যের পার্থক্য-সীমা বলে বিশ্বাস, গদ্য ও পদ্যের স্বতোবিরুদ্ধতায় আস্থা—এসবই ভ্রান্ত ধারণা।

এই সব ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যে-সব শিল্পী লড়াই করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রে ওয়েবষ্টার, কলিন্স, পোপ, বার্নস, শেকসপীঅর, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, বাইরন, টেনিসন, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, এমিলি ডিকিনসন, এলিঅট। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সুধীন্দ্রনাথ। এঁরা সবাই কথ্যরীতিকে কাব্যে যোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন এবং কম-বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। ওঅর্ডসওঅর্থ ও ব্রাউনিঙের ব্যর্থতা থেকেই আমরা হুইটম্যান, ডিকিনসন ও এলিঅটের সাফল্যে উপনীত হই; ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতি ও আত্ম-পরাগতিতে, ক্ষণিকা ও পলাতকার শিল্পসম্ভাবনা ও পরবর্তী পরাগতিতে, লিপিকা, পরিশেষ ও পুনশ্চ-র সাফল্যে উপনীত হই; অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভঙ্গিম বাক্‌স্পন্দী রীতিতে পৌঁছই, আর সেখান থেকেই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচর্চায় উপনীত হই। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৩৩। 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে সংকলিত) প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সন্ধান করেছেন ও দুয়ের অদ্বৈত শিল্পরূপে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এলিঅট কাব্যে কথ্যরীতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, কবিতায় গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন রক্ষা করেছেন, এবং আমাদের মানতেই হয় কথ্যরীতি তাঁর কবিতার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, এবং তা উন্নীত চৈতন্যেরই ভাষা। এলিঅটের কবিতার ভাষা আটপৌরে কথ্যভাষা নয়, তা কথ্যরীতির ভাষা এবং গদ্য-পদ্যের যোজক। কবিতা কবির আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবি-প্রসিদ্ধির কুসুমশয়ন ছেড়ে গদ্যেই কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অভিষ্ট উৎসকে। এলিঅটের নিয়ন্ত্রিত কবিতায় কথ্যরীতির শিল্পরূপ লক্ষণীয়—

After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors

And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides by vanities. [Gerontion, T S. Eliot.

এই কবিতাংশে গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন যে সুরক্ষিত আছে, তার পরিচয় 'cunning passages, contrived corridors' শব্দাবলীর অভিঘাত। (দ্রষ্টব্য—শ্রীদেবতোষ বসুর প্রবন্ধ 'গদ্য-পদ্যের ঐতিহ্য ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সাহিত্যের খবর, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৯)। এলিঅটের এই শিল্পসাফল্য গদ্য-পদ্যের বিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনে সক্ষম হয়েছে।

'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থভুক্ত ছন্দোমুক্তি ও ও রবীন্দ্রনাথ ও 'অদ্বৈতের অত্যাচার' প্রবন্ধে এতৎপ্রসঙ্গে যে-সব মূল্যবান মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সুধীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তা থেকেই তাঁর নিজস্ব ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারিনি, বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্যতীর্থ নামে সুপরিচিত।" ('ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৩৩)

"গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্ব স্ব মূলধন একত্র করে যে-যৌথ কারবার পাতে, তা'ই জন-সমাজে পায় কাব্য-আখ্যা।" (তদেব)

"আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনে পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমন কি আমরা এতদূর পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে তাতে যে-গদ্য ব্যবহৃত, তা একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কাবতার প্রসঙ্গ যতহ সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে, এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাহ মুক্তছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।" (তদেব)

এলিঅটের 'দি মিউজিক অভ্ পোয়েট্রি' প্রবন্ধে (পৃ ৩১) এই বক্তব্যই সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

"শব্দের অভিধাকে উড়িয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের তাগিদে; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে, প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক। অবশ্য তথাকথিত

সাহিত্যে এ-নিয়মের বহু ব্যতিক্রম সুলভ; এবং আমাদের অনেক লেখাই রূপসৃষ্টি নয় রূপবর্ণনা। অর্থাৎ সে-ধরণের রচনা নিজের জোরে আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ক্ষান্ত করে না, তাতে আমরা পাই শুধু এমন কোনও আত্মনিষ্ঠ বস্তুর ঠিকানা, যার সংস্পর্শে জাগে আমাদের চিকীর্ষা; এবং সে-রকম সাহিত্যকে, তথা অন্যান্য শিল্পকে, ললিতকলার পর্যায়ে ফেলা যায় না, সে সমস্ত কারুকর্মের অন্তর্গত। কারণ কারুকর্মের উপকারিতা যদিও নিঃসন্দেহ, তবু তাতে সৌন্দর্যের নিজস্ব নেই; এবং তার প্রেরণা সেই জাতীয়, যার তাড়নায় মৌমাছি অমন চমৎকার চাক বানায়। অগত্যা তার সঙ্গে তুলনীয় আরসি, যার কোনও স্বকীয় মূল্য নেই, প্রতিফলিতের মূল্যেই যা মূল্যবান, এবং অ্যালেকজাণ্ডর-এর বিবেচনায় এই প্রতিবিম্বপরায়ণতা গদ্যের সনাতন লক্ষণ। কাব্যেব ধর্ম শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্বোধন; এবং তাই শিল্পমাত্রেই যখন উৎকর্ষে পৌঁছায়, তখন তাতে দেখা দেয় কাব্যের অনুকরণ; তখনও হয়তো তার অর্থ থাকে, কিন্তু সে-অর্থ সার্থকতার নামান্তর।" ('অদ্বৈতের অত্যাচার' ১৯৩৪)।

এই সব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত থেকেই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচিন্তার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বুঝেছিলেন গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নিতান্তই প্রথানুমোদিত, জনপ্রিয় ভ্রান্ত ধারণা। কবির সমন্বয়ধর্মী মনের কাছে গদ্য-পদ্যের বর্ণাশ্রম ধর্ম অসাব বলে ঠেকে। তাই গদ্যের শব্দ, অন্বয়, বিন্যাসপদ্ধতি বা চরিত্রলক্ষণ বলতে যা বোঝায় তা সুধীন্দ্রনাথ অনববত গ্রহণ কবেছেন তাঁর কবিতায়। আবার পদ্যের সযত্নলালিত অনুষঙ্গ ও আবেদনও তাঁব গদ্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এলিঅটের বক্তব্য সুধীন্দ্রনাথেব সমর্থন পেয়েছে, ফলে তাঁর কবিতায় বা গদ্যে একটি রূপকারী বিবেকের চেহারাই ফুটে ওঠে।

ঈশ্বর গুপ্তে যার আভাস, বঙ্কিমে ব্যর্থতা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা, পলাতকা, লিপিকায় তার ভীরু পদপাত এবং পুনশ্চ কাব্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গদ্যপদ্যের অদ্বৈতোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ-এ স্পষ্টতর হ'ল, কিন্তু লিপিকায় তার সূচনা, পলাতকা ও পরিশেষ কাব্যে তার যোগ্য ভূমিকা। এটিও সুধীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ তার প্রমাণ।

গদ্য পদ্যের আত্মীয়সম্পর্ক শিল্পীমন্য দায়িত্বের মুখাপেক্ষী এবং গদ্যপদ্যের নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই যে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ—একথার প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্র-রচনায়। কিন্তু সজ্ঞান পরিণাম প্রত্যাশায় সুধীন্দ্রনাথই সেই অদ্বৈত

সাধনাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসিদ্ধি অবশ্যস্মর্তব্য।

সুধীন্দ্রনাথ কখনো গদ্যকবিতা লেখেন নি, তথাপি তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতায় গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ যে সম্ভবপর তার ইশারা পাই। জনপ্রিয় ধারণায় তাঁর ছিল বৈমুখ্য। ভাবগত ছেদ এবং বাগ্‌যন্ত্র নির্দেশিত ছেদ যে যথাক্রমে গদ্য ও পদ্যের মৌল বিচ্ছেদ লক্ষণ, ব্যাকরণের এই অনুশাসনে তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। কবিতায় আটপৌরে শব্দ অবাধে ব্যবহার করেছেন, কথ্যরীতি কবিতার অনিষ্ট বলে মেনেছেন, অথচ অন্ত্যমিল, ছন্দের কঠিন বন্ধন, চিত্র-কল্পরচনার শিল্পীমন্য তাগিদ প্রভৃতি কবিতার যাবতীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেছেন, এবং তা মেনেও স্বরচিত কবিতায় গদ্যের স্বভাবধর্ম সংরক্ষণ করেছেন, কখনো মনে করেন নি গদ্যের চরিত্রলক্ষণ সংহতিচর্চার বিপক্ষ, এবং কখনো গদ্যকবিতার স্বৈরাচারের হাতে আত্মসমর্পণ করেন নি।

তাঁর কবিতার সামান্য উদাহরণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন—

কখনো ওঠে পাতাল ভেদ করে অসম্ভূত অমা।
বায়ুর বেগ সহসা যায় মরে দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

এখানে কথ্য বাগ্‌ধারা, মৌখিক আলাপের শব্দের সঙ্গে দুরূহ আভিধানিক শব্দের আত্মীয়বন্ধন নিবিড় হয়ে উঠেছে। 'মরে যাওয়া' বা 'ক্ষমা দেওয়া' সহজেই 'অসম্ভূত অমা' ও 'দ্রাঘিমা' শব্দের পাশাপাশি বসেছে। অথচ কবিতায় ধ্রুপদী সংহতি বা ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কবিতার যাবতীয় প্রসিদ্ধি, নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেও এখানে গদ্যের স্বভাবধর্মকে তিনি রক্ষা করেছেন।

গদ্য পদ্যের নির্বিরোধের এই উজ্জ্বল কাব্য-উদাহরণ থেকে আমরা সুধীন্দ্রনাথের গদ্যক্ষেত্রে অনায়াসে উপনীত হই। কারণ তাঁর গদ্যরচনা কবিতার বিরোধী নয়। তাঁর গদ্য আধুনিক অর্থে কাব্যধর্মী। সংস্কারানুগ অর্থে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যধর্মী নয়, তাঁর প্রবন্ধ বক্তব্যের উপস্থাপনামাত্র নয়, বরং একটি শিল্পসমর্থ প্রতিবেশসৃষ্টি। গদ্যের প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ—মনন ও যুক্তিনিষ্ঠা তিনি কখনো বর্জন করেন নি, তত্রাচ তাঁর গদ্য তাঁর কাব্যের মতোই বিশিষ্ট অনুশীলন, সচেতন শিল্পচর্চা।

একটি উদাহরণেই তা প্রমাণিত হয়।

[১] "স্বপ্নাদ্য প্রতীকের মতোই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্বসমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য; এবং সাধ থাকলেও, সাধ্যের অভাববশত আমি সে-রকমের

রচনায় অপারগ বটে, কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাছে ছুট্‌তে হয় না। এদেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই। তবে মহাকবিরা জানেন যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়ে স্বকীয় বিশ্ববীক্ষার সর্বনাশ সাধে; এবং সাহিত্যে শুধু বিষয়-বিষয়ীর সঙ্কেত নয়, রসসামগ্রীর মায়ামুকুরে দর্শক আবার বহুরূপী।" (মুখবন্ধ, কুলায় ও কালপুরুষ)

সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে কথ্যরীতিকে আশ্রয় করেছিলেন, তার ফলে তাঁর রচনায় আটপৌরে শব্দ, ক্রিয়াপদ ও ইডিয়মের প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়: 'ঝাঁ ঝাঁ রোদ', 'চোখকানের ঝগড়া মেটাই', 'সর্বনাশ সাধে', 'শেকসপীয়রেব কাছে ছুট্‌তে হয় না'। গুরু তৎসম শব্দের পাশে এগুলি নিপুণভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্যের বিস্ময়কর উদাহবণ 'দ্বন্দ্বসমাস' শব্দটি। পরিচিত বৈয়াকরণিক আবেষ্টনী থেকে সরে এসে এই শব্দটি রসসৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছে। এই শব্দটি কবিতাতেও ব্যবহার করে সুধীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যেব নিবিড় আত্মীয়তাই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন—

> অবশ্য বুঝেছি আজ এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী,
> কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
> সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত
> এবং সে নিত্যবিপরীত
> দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
> বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে।

কাব্যাস্বাদনেব সমস্ত পূর্বার্জিত সংস্কার বর্জনের পরই আমরা এই কবিতাংশের রসাস্বাদন কবতে পারি। গদ্যশব্দের ব্যবহার, অকাব্যিক গদ্যোচিত বিন্যাসপদ্ধতি এই কবিতাংশের উপভোগে পদে পদে বাধা দেয়, যেমন বাধা দেয় উপরোক্ত গদ্যাংশে সবলতার নিতান্ত অনটন।

আসল কথা সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যে শব্দ ব্যবহারে সংস্কারমুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, শব্দব্যবহারে তাঁর ছিল আত্যন্তিক মনোযোগ। আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দের প্রতি তাঁর ছিল মোহ। 'অদ্বৈতের অত্যাচার' প্রবন্ধের পূর্বধৃত অংশে সুধীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন তা পুনঃস্মরণযোগ্য—"আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের তাগিদে;

এবং সেখানে যেমন প্রত্যেকটি শব্দ এক-একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে, প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক।" উদ্ধৃত গদ্যাংশের এই বাক্যটি এ-ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—"কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্স্পীয়রের কাছে ছুটতে হয় না, এ দেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই।" এখানে 'শেকসপীয়র' শব্দটি বিদ্যাভিমানের পরিচায়ক নয়, একটি অনুষঙ্গময় ধ্বনি, স্বায়ত্ত শিল্পরীতির অনিবার্য উপাদান। এলিঅটের মতোই সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, অন্বয়ের আশ্রয় ও অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনা ব্যতীত শব্দে সঙ্গীতের আবেদন কখনোই পৌঁছায় না। 'শেকসপীয়র' শব্দটি অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনায় সঙ্গীতের আবেদনসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখানে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাকে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের উপায় না করে শিল্পসৃষ্টির তাগিদেই ব্যবহার করেছেন, কবিতার মতো গদ্যকেও একটি স্পষ্ট শিল্পরূপ দেবার জন্যই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

এবার সুধীন্দ্রীয় গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ সূত্রাকারে নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

[ক] প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, দুরূহ অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রতি মোহ সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের গদ্য কথ্যরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তার ফলে বেগবান।

[খ] গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে যত্নবান বলে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যও কাব্যধর্মী। কাব্যের যে ধ্রুপদী সংহতি ও ভাবগাম্ভীর্য রক্ষায় তাঁর প্রযত্ন, তাঁর গদ্যেও তা বর্তেছে। যে অমুক্ত শিল্পবিবেক সুধীন্দ্রনাথকে কবিতায় শব্দব্যবহারে মৌলিকতাপন্থী করে তুলেছে তা গদ্যরচনাতেও উপস্থিত। পূর্বধৃত 'দ্বন্দ্বসমাস' শব্দের ব্যবহার তার প্রমাণ। শব্দব্যবহারে তাঁর আত্যন্তিক মনোযোগ বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। সুধীন্দ্র-কবিতার কথ্যভঙ্গী, আবেগশূন্যতা ও গুরুভার শব্দব্যবহারপ্রবণতা গদ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।

[গ] সুধীন্দ্র-গদ্যে তির্যকরীতির প্রাধান্য। 'জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলায় অভ্যাস' এই রীতির প্রাণ। তা গাঢ়বন্ধ, পরিমিত, শব্দসচেতন, ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসযুক্ত। তাঁর কাছে গদ্যচর্চা কবিতার মতোই শিল্পচর্চা। এই অসরল তির্যক রীতি তার পরিচায়ক। পাউণ্ড-এলিঅট-অডেনের মতো সুধীন্দ্রনাথও গদ্যের সারল্যকে গ্রহণ করেন নি, আত্মস্থ করেছিলেন গদ্যের পরিমিতিকে। এই পরিমিতি তাঁর তির্যকরীতির মূল উপাদান।

[ঘ] সুধীন্দ্র-গদ্যে সংস্কারবর্জন বিশেষ লক্ষণীয়। তথাকথিত গুরুচণ্ডাল দোষ তিনি উপেক্ষা করেছেন, ব্যাকরণের অনুশীলনকে যেমন কবিতায় তেমন গদ্যরচনায় অগ্রাহ্য করেছেন। সংস্কৃত, দেশি, বিদেশি শব্দের বর্ণ সাংকর্য সুধীন্দ্র-গদ্যে অবিরল। এর ফলে বাক্য হয়েছে বর্ণবিচিত্র ও ধ্বনিসমৃদ্ধ।

[ঙ] সুধীন্দ্রনাথের বাক্যগঠন অতিশয় ঋজু, আঁটসাট, সংহত, বাহুল্য-বর্জিত। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-গদ্য, প্রমথ চৌধুরীর মিতভাষণ এক্ষেত্রে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। তাঁর কাশীতে সংস্কৃতচর্চা এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বল্পতম শব্দে অধিকতম বক্তব্য পরিবেশনের আগ্রহে তিনি ধ্রুপদী সংহতির দিকে ঝুঁকেছিলেন।

[চ] সুধীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে কদাচ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন না বলে তাঁর সমগ্র গদ্যরচনা এক অর্থে ভাষান্তরণ। ফলে বহু নোতুন শব্দ তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছে যা বাঙালি পাঠকের কাছে ইতিপূর্বে অপরিচিত ছিল। ইংরেজি ভাষাকে তিনি পরিচিত, কিন্তু অনাত্মীয় ভাষা বলে মনে করতেন। সংস্কৃত ভাষা তাঁর কাছে আত্মীয়, প্রাকৃত বাংলাও আত্মীয়। তাই তিনি বারবার কথ্যভাষা ও সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ধ্রুপদী সংহতির দিকে ঝোঁক এবং শব্দ ও পরিভাষা গঠনে নিয়ততৎপরতা ছিল বলে সুধীন্দ্র-গদ্য স্বভাবতই দুর্বোধ্য কিন্তু কখনোই অবোধ্য নয়।

কথ্যরীতি-আশ্রয়ী ও গদ্য-পদ্যে নির্বিরোধ-প্রয়াসী সুধীন্দ্র-গদ্যের কিছু পরিচয় আগেই পেয়েছি। এখন আরো কিছু উদাহরণ থেকে বাকি বৈশিষ্ট্য-গুলির পরিচয় গ্রহণ করি।

প্রথমেই তাঁর গদ্যরীতির নিজস্বতা—তির্যক রীতির পরিচয়—গ্রহণ করি।

[২] তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমার পুবতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এবং সে-জন্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। [পুনশ্চ, স্বগত]

এই বাক্যের বাঁধুনি আঁটসাট, বাহুল্যবর্জিত। ক্রিয়াপদের বিলুপ্তি ও পদবিন্যাসকারু একে দিয়েছে গতিবেগ। তার সঙ্গে আছে বক্তব্যের তির্যক প্রকাশ-'আমার পূর্বতন গদ্য ত্রুটিমুক্ত'—এটাই বলতে চেয়েছেন 'আমার পূর্বতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল' বাক্যাংশে। এই কনডেন্সড্ বাক্যের প্রসাদগুণ সরলতায় নয়, পরিমিতিবোধে।

[৩] সেই জন্যে আমি প্রায় নিশ্চিত যে স্পেংলার-এর যথার্থ বক্তব্য

একবার বুঝলে, আমরা কখনও ভুলে তাঁর নাম নেব না; এবং ইতিমধ্যে আমরা যদি ভাবি যে তাঁর লেখায় কালের যে-চক্রান্ত ব্যক্ত, তার প্রশ্রয়ে কালনেমির লঙ্কাভাগ সম্ভব, তাহলে জানব আমাদের কপালে আরও দুর্দশা আছে। কেননা স্পেংলার-এর তত্ত্বে যা যায়, তা একেবারে যায়; এবং যা থাকে, তার মৃত্যু যেমন অমোঘ, তার অবচ্ছেদ তেমনই দুস্তর।

অর্থাৎ বনগাঁয়ের শিয়ালরাজারাই স্পেংলার-এর মূল প্রতিপাদ্যে আরাম পাবেন; এবং পশ্চিমের অস্ত আর প্রাচ্যের উদয় যে এক নয়, তার প্রমাণ খুঁজতে ভারতীয় ভাবলোকের অন্তরঙ্গ পরিচয় অনাবশ্যক। ['উদয়াস্ত', কুলায় ও কালপুরুষ]

এই অংশের তির্যকরীতি স্বপ্রতিষ্ঠ। ক্রিয়াপদের সংকোচন ও বিলুপ্তি, সূত্রাকারে নিবদ্ধ বক্তব্যের মিতাক্ষর-রূপ, 'এবং' সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে দুটি বাক্যের এক বাক্যে গ্রন্থন সহজেই চোখে পড়ে। 'অর্থাৎ' শব্দযোগে বাক্যের সূচনা এখানে, ও অন্যত্র, অনায়াসলক্ষণীয়। এই গদ্যাংশের অপর বৈশিষ্ট্য লোকভাষাভঙ্গির প্রতি অনুরাগ। বাংলা প্রবাদ ও ইডিয়মের প্রতি লেখকের ঝোঁক প্রমাণ করে কথ্যরীতির প্রতি আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য তাঁর উক্তি: 'যে-ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল' ('পুনশ্চ', স্বগত)। 'কালনেমির লঙ্কাভাগ', 'বনগাঁয়ের শিয়ালরাজা' প্রভৃতির প্রয়োগ এর প্রমাণ।

[৪] অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ উপকরণের ব্যবস্থাপনই মানুষী সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা; এবং সেইজন্যে আমি স্বভাবকবিদের ভক্ত নই, আমাকে লোভায় মালার্মের আদর্শ, যাতে পঙ্কজই প্রতিবিম্বিত বটে, কিন্তু সে-মানস শতদলের মূল যেহেতু প্রণবের পুনর্বাদে, তাই তার শ্রবণসুভগ নাম প্রাকৃত পুষ্পাঞ্জলির মতো আশুক্লান্ত নয়। [কুলায় ও কালপুরুষ, মুখবন্ধ, ১০ মার্চ ১৯৫৭]

'অর্থাৎ' শব্দযোগে বাক্যের সূচনা, 'এবং'-যোগে এক বাক্যে দুটি বাক্যের গ্রন্থনা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি; এখানে আরো লক্ষণীয়—'এবং', 'কিন্তু', 'তাই'—তিনটি অব্যয়যোগে একটিমাত্র দীর্ঘ বাক্য সংগঠন, আসলে চারটি বাক্যের সমাহার। ক্রিয়াপদের কথ্যরূপের অকুণ্ঠ ব্যবহার—'আমাকে লোভায়'। সুধীন্দ্র-গদ্যের এটি বিশিষ্ট লক্ষণ। গুরু তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রাকৃত শব্দ লেখক অনায়াসনৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। এই গদ্যাংশে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ ও গুরুভার শব্দের প্রাধান্য, অথচ তা প্রাকৃত কথ্যরীতি-

অনুসারী। প্রয়োগনৈপুণ্যে 'শ্রবণসুভগ', 'প্রণবের পুনর্বাদ', 'আত্তক্লান্ত' প্রভৃতি গুরু শব্দ বেমানান হয় নি।

[৫] অর্থাৎ সভ্যতার অধুনাতনী অবস্থায় বাক্য বস্তুর প্রতিযোগী : সমাজজীবনে উভয়ে মৌরসী পাট্টা চায় ও পায় ; এবং উভয়ে ধ্যান তথা অপরাপর মানসিক প্রক্রিয়ার উপলক্ষ যোগায়। ['অদ্বৈতের অত্যাচার', কুলায় ও কালপুরুষ]

'অর্থাৎ'-যোগে বাক্যের সূচনা, 'এবং'-যোগে দুটি বাক্যের গ্রন্থন পূর্বের উদাহরণগুলির মতোই লক্ষণীয়। বাংলা ইডিয়ম ('মৌরসী পাট্টা') ও তদ্ভব ক্রিয়াপদ (চায়, পায়, যোগায়) গুরু সংস্কৃত শব্দবন্ধের (অধুনাতনী অবস্থা, প্রতিযোগী, মানসিক প্রক্রিয়া) পাশে প্রয়োগনৈপুণ্যে থাপ খেয়ে গেছে। দেশি-তৎসম, প্রাকৃত-সংস্কৃত, লঘু-গুরু ক্রিয়াপদ, শব্দ ও ইডিয়মের নিপুণ মিশ্রণ বাক্যে এনেছে গতিবেগ ও বৈচিত্র্য।

শব্দ ও বাক্যাংশ নির্মাণে ও অভিনব প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসাধারণ। যেমন,—"ট্যুটনী মন" (কুলায় ও কালপুরুষ, পৃঃ ১০৭), "দুগ্ধপোষ্য শব্দ" ও "প্রাপ্তবয়স্ক শব্দ" (স্বগত | ২য় সং | পৃ ৩১), "অগ্রণী-শোভন", "রূপকারী বিবেক", "সংস্কারসাধ্য দোষ", "বিধিবদ্ধ মৌলিকতা", "প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা", "রবীন্দ্রনাথের লোকপ্রসিদ্ধ তিরস্কার" (স্বগত, পৃ ২০১), "কায়মনোবাক্যের অবৈকল্য-ব্যতিরেক" (স্বগত, পৃ ২০২), "সমালোচনা বন্দনার সপত্নী" ও "আমার কাব্যজিজ্ঞাসা আপাতত দেহাত্মবাদী" (স্বগত, পৃ ১৪), "ঘনিষ্ঠতাজাত বিতৃষ্ণা" (পৃ ৮১, কুলায় ও কালপুরুষ), "শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী" (পৃ ৮৫, কুলায় ও কালপুরুষ)।

আপন গদ্যরচনা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের উক্তি স্মর্তব্য : "শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরাজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারি নি" ('পুনশ্চ', স্বগত)। কদাচ ইংরাজী শব্দ তিনি প্রবন্ধে ব্যবহার করতেন না বলে তাঁর সমস্ত গদ্যরচনা এক অর্থে ভাষান্তরণ। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে বহু পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করতে হয়েছে। সংস্কৃতবিদ্যা এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছে। বাংলা গদ্যভাষার প্রকৃতি লঙ্ঘন না করে

তিনি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজ-সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতির নানা অপরিহার্য পরিভাষার ভাষান্তরণ করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ যে-সব পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ ও ব্যবহার করেছেন এখানে তার একটি তালিকা দিচ্ছি।

নৈরাত্ম্য সিদ্ধি—negative capability ; প্রাতিস্বিক—individual ; বিপ্রলাপিত—confused , নৈরাত্ম্য কাব্য—objective poetry ; প্রতিভাস—illusion ; অনুকম্পা—sympathy ; বহিরাশ্রয়—objective ; অন্তরাশ্রয়—subjective ;

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— character (Herbert Read : 'Form in Modern Poetry')

ব্যক্তিস্বরূপ— personality („ „)

এছাড়াও পাই—অন্বিষ্ট, অভিধা প্রমা, অবৈকল্য, কলাবৈকল্য, মৌল, উপান্ত, নিপট, ব্যতিহার্য, নিষ্কর্ষ, লিপিচাতুর্য, সন্নিকর্ষ, তাৎকাল্য, অনীহা, রূপকারী বিবেক, অনুকম্পায়ী, অনিকাম, আশুক্রান্ত, বৈমুখ্য, প্রাণপ্ররোহ, বিষমানুপাতিক প্রতিভূকল্প।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য তাঁর উক্তি : "সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের তাগিদে ; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকারগুণে আনন্দদায়ক।" ('অদ্বৈতের অত্যাচার', কুলায় ও কালপুরুষ)।

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে সুধীন্দ্র-গদ্যরীতির নমুনা অলব্ধ, তার পূর্বাভাস পর্যন্ত অ-দৃষ্ট, এ কারণে তা অবোধ্য বলে নিন্দিত। কিন্তু বাংলা গদ্যের স্রোতোধারা থেকে তা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাংলার অনুগামী। তা আত্মমগ্ন ব্যক্তিস্বভাবের পরাকাষ্ঠা নয়, সৎশিল্পীর নির্লিপ্ত স্বগতোক্তির পরিবাহক। সুধীন্দ্রনাথ এমন একজন মননশীল গদ্যলেখক যাঁর নিরন্তর প্রয়াসে ভাষার নব নব সম্ভাবনা দেখা দেয়। আত্মসন্তোষের অগভীর তৃপ্তি তাঁকে বেঁধে রাখে না, পরন্তু নিজস্ব পাঠকমণ্ডলী তৈরীর দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পিত। তাঁর গদ্যভাষা উত্তরসূরীদের সামনে শিল্পের নবীন আদর্শের সরণি উন্মুক্ত করে দেয়।

নির্ঘণ্ট

বিষয় সূচী

লেখক-সূচী

গ্রন্থ-সূচী